বিসর্পিল

প্রেমেন্দ্র মিত্র • বুদ্ধদেব বসু • অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা ১২

প্রকাশক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

নূতন সংস্করণ : ভাদ্র, ১৩৬৩

মূল্য : তিন টাকা

মুদ্রক : শ্রীপ্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়
ক্যাশ প্রেস
৩০, কর্নওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

এক

এই যে, সিতিকণ্ঠবাবু আসছেন।

দরজার ওপারে কা'র ছায়া পড়তে সমিতির সেক্রেটারি-মশাই অস্ফুটগদ্গদ কণ্ঠে ঘোষণা করে' উঠলেন : এক মুহূর্তে সভার উপর নেমে এলো ঘনীভূত স্তব্ধতা।

সবাইর সঙ্গে-সঙ্গে রথীরো চোখ গিয়ে পড়লো দরজার উপর, এই—এই সিতিকণ্ঠ! বিস্ময়ে নির্নিমেষ দুই চোখ মেলে, প্রায় রুদ্ধনিশ্বাসে, রথী সেই আবির্ভূত আগন্তুকের দিকে চেয়ে রইলো।

সিতিকণ্ঠ—বয়েস প্রায় তিরিশের কোঠার মাঝামাঝি এসে পড়েছে, গৌর, দীর্ঘাঙ্গ, এতো দীর্ঘতা বাঙালীর পক্ষে প্রায় অসাধারণ, পেলব, লতায়িত চেহারা, মাথায় ঘন কোঁকড়ানো চুলের ভার, ঘাড়ের কাছে অবিন্যস্ত হ'য়ে নেমে এসে সামান্য একটু বাব্‌রির সৃষ্টি করেছে; দাড়ি-গোঁফ নির্মূল কামানো, সমস্ত মুখে ধ্যানলীন বুদ্ধের সৌম্য সুগম্ভীর প্রশান্তি; দুই টানা, ঢলোঢলো চোখে বিহ্বল আলস্য—কি-এক স্বপ্নে যেন তারা বিভোর। রথীর এতোদিনকার প্রতীক্ষা যেন আজ পেলো মূর্তি, তার কল্পনা পেলো আয়তন।

বাঁ-হাতের উপর কোঁচার একটি প্রান্ত ছিলো তোলা, সেটা পায়ের উপর লুটিয়ে দিয়ে সিতিকণ্ঠ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। পরিচিতদের সহাস্য সম্বর্ধনা করে' ঢালা ফরাশের এক কোণে গিয়ে বস্‌লো। দেখতে এমন নিরীহ, কিন্তু হাতে তার কী দুর্ধর্ষ লেখনী। দেখে প্রথম বিশ্বাসই হয় না এই সিতিকণ্ঠ বাংলা সাহিত্যে নতুন তুফান তুলে দিয়েছে—বস্‌লে পর এমন গোলগাল, ভালোমানুষের মতো তার চেহারা। ভাবে-ভাষায় পোশাকে-ব্যবহারে এমন

একটি সহজ, সাদাসিধে শুভ্রতা; সমাজের যে-দুর্গতরা তার সাহিত্যের উপজীব্য তাদের প্রতি একটি গভীর সমবেদনার ভাব তার সমস্ত চেহারায় এনে দিয়েছে উদার কমনীয়তা। মনে-মনে রথী বারে-বারে এই নবযুগের সাহিত্যিককে নমস্কার করতে লাগলো।

'মর্মরিতা'-র সম্পাদক ছিলেন সভার সভাপতি: বিষয় ছিলো সিতিকণ্ঠের গল্প-পাঠ।

মামুলি উদ্বোধন-সঙ্গীত শেষ হ'লে সভার কাজ আরম্ভ হ'লো; সভার কাজ বলতে সিতিকণ্ঠ তার পকেট থেকে চটি একখানি এক্‌সারসাইজ্‌ খাতা বা'র করে' গলা খাঁকরে, চারদিকে স্বপ্নালস দৃষ্টি বুলিয়ে তার গল্প পড়তে লাগলো। স্তব্ধতায় সমস্ত ঘর যেন পাথর হ'য়ে গেছে।

সেই তার সমাজের তলানিদের নিয়ে গল্প: নির্যাতিত, অধঃপতিত মানুষের মাঝে দেখেছে সে সেই মহান্‌ সম্ভাবনার স্বপ্ন। ভাষায় কী স্বচ্ছন্দ সারল্য, ভঙ্গিতে কী উজ্জ্বল তীক্ষ্নতা! বর্ণনা তার এতো প্রত্যক্ষ ও প্রাণবান যে প্রতিটি চরিত্র তার পেয়েছে পূর্ণ পরিমিত, পূর্ণ সার্থকতা। নিরাড়ম্বর জীবনে এতো রহস্য, এতো সুষমা যার আবিষ্ক্রিয়া, তার কী অগাধ দূরদর্শিতা, কী বলীয়ান কল্পনা! বিভোর হ'য়ে রথী প্রতিটি শব্দ যেন গোগ্রাসে গিলতে লাগলো।

লেখার গূঢ় গুণগ্রহণের হয়তো তা'র যথেষ্ট ক্ষমতা নেই, কিন্তু সিতিকণ্ঠের মুখনিঃসৃত বাক্যের ধারায় রথীর সমস্ত শরীর ঝঙ্কার দিয়ে উঠছে। শুধু তার রচনার সৌষ্ঠবে নয়, স্নিগ্ধ, প্রশান্ত, পরিচ্ছন্ন মুখচ্ছায়ায় নয়, এমন-কি তার উচ্চারিত শব্দে পর্যন্ত তার চিত্তের সুষমা হচ্ছে বিচ্ছুরিত। মাত্র গলার স্বরে ব্যক্তির চরিত্রের আভিজাত্য যেন ধরা পড়ে, সিতিকণ্ঠ যে একজন উচ্চাঙ্গের আর্টিস্‌ট্‌ তা তত্ত্বজিজ্ঞাসুমাত্রেই সহজে আন্দাজ করতে পারবে তার এই

নিটোল, মসৃণ গলায়, তার আঙুলের এই ক্ষিপ্র লীলায়মানতায়, চোখের এই বিহ্বল, তন্ময় মাধুর্যে। কী গভীর প্রাণ দিয়ে সে সমস্ত জিনিসটা উপলব্ধি করেছে তা তা'র এই পড়া থেকেই বোঝা যাচ্ছিলো। লেখকের মুখ থেকে তার পড়া না শুন্‌লে বুঝি সবটা তার হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। এমন একটি সুযোগের জন্যে রথী কতোদিন থেকে না অপেক্ষা করে' আছে!

গল্প পড়া সাঙ্গ হ'লো, সুরু হ'লো এবার সমালোচনার পালা।

স্তুতিতে দিঙ্‌মণ্ডল মুখর হ'য়ে উঠলো; কোথা থেকে কে-একটা ছোকরা হঠাৎ বেসুর ধরলে। বল্‌লে,—এ-সব গল্প অত্যন্ত insincere, ভাবের খানিকটা ধোঁয়া ছাড়া আর কিছু নয়। মোটরে করে' বস্তি ঘুরে এলেই realism হ'লো না, লেখায় চাই দেশের মাটির সঙ্গে নাড়ীর যোগ, চাই মানুষের সঙ্গে সত্যিকারের দরদ—

চারদিক থেকে লক্‌লক্ করে' উঠলো শাণিত রসনা। কেউ বললে,—তবে আপনি কি এই কথা বলছেন যে সিতিকণ্ঠবাবু তাঁর কলম ছেড়ে দিয়ে তাঁর গল্পের চরিত্রের সঙ্গে দরদ দেখাতে গিয়ে সত্যি-সত্যি হাতে গাঁইতি নেবেন?

আবার কেউ টিপ্পনি কাটলো: ও-সব বাজে তর্ক কেন তুলছেন মশাই? দেখতে হ'বে লেখাটা সত্যিকারের গল্প হয়েছে কি না। সেদিক থেকে আপনার কিছু বলবার আছে?

হঠকারী ছোকরাটি চুপ করে' গেলো। চুপ করে' গেলো, কিন্তু রথী অতো সহজে যেন খুসি হ'তে পারছিলো না। তার ইচ্ছা করছিলো বিদ্রূপের কষা মেরে-মেরে তাকে ক্ষতবিক্ষত করে' দেয়, কিন্তু মুখ দিয়ে শব্দ বা'র করতে গিয়ে লজ্জায় তা করুণ, বিবর্ণ হ'য়ে উঠলো, তার সম্ভ্রমের পাত্রের সপক্ষে একটি কথাও সে বলতে পারলো না। হয়তো সেই অচেনা সমালোচকের ঔদ্ধত্যকে শাসন করতে গিয়ে সিতিকণ্ঠের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দেখানো হ'বে

না, শিবের গীত গাইতে গিয়ে শুধু ধান ভানাই সার হ'বে। তার থেকে চুপ করে' থাকাই ভালো—তার এই নিরুচ্চার প্রশস্তি অনেক বেশি গভীর, অনেক বেশি সত্য। কী আসে যায় তার বা আর-কারুর প্রশংসা বা নিন্দায়, সিতিকণ্ঠের প্রতিভা সূর্যের আলোর মতো উজ্জ্বল ও উৎসারিত।

'মর্মরিতা'র সম্পাদক সংক্ষেপে তাঁর ভাষণ শেষ করলেন, সংক্ষেপে বটে, কিন্তু প্রতিটি কথা তাঁর প্রশংসায় ঝিক্‌মিক্ করছে। গল্পটি সাদরে পকেটস্থ করে' সম্পাদক-মশাই সিতিকণ্ঠকে লক্ষ্য করে' একটি সারগর্ভ সঙ্কেত করলেন। সিতিকণ্ঠ স্মিতমুখে আলগোছে একটু ঘাড় হেলিয়ে চোখের বেতারে তার সম্মতি জানালো।

সিতিকণ্ঠের পাণ্ডুলিপিটা আর রথীর স্বচক্ষে দেখা হ'লো না

তা না হোক্, সভা ভাঙতেই, রাস্তায় পড়ে' রথী ভিড় ঠেলে একেবারে সিতিকণ্ঠের পায়ের কাছে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়লো। বিগলিত, খানিকটা ভীত কণ্ঠে সে বলে' ফেল্‌লে,—আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এসেছিলাম—

তার ভক্তির এই অমিতোচ্ছ্বাসে সিতিকণ্ঠ খানিকটা প্রথম বিমূঢ় হ'য়ে পড়েছিলো। আপাদমস্তক তাকে পর্যবেক্ষণ করে' সে একটু কুণ্ঠিত হ'য়েই বল্‌লে,—আপনার নাম—

লজ্জায় মিইয়ে গিয়ে, নিচের ঠোঁটটা একটু চেটে রথী বল্‌লে,—রথীন্দ্রকুমার নন্দী।

—ও হ্যাঁ, আপনার দুয়েকটা কবিতা পড়েছি বটে, খাসা কবিতা।

রথী আম্‌তা-আম্‌তা করে' বল্‌লে,—না, কবিতা আমি লিখি না, দুয়েকটা গল্প—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, গল্প, সিতিকণ্ঠ নিজেকে তাড়াতাড়ি সংশোধন করে' নিলো: 'শঙ্খনাদ'-এ বেরিয়েছিলো, না? আপনার স্টাইলটি ভারি চমৎকার।

পরম আপ্যায়িত হ'বার ভান করে' রথী সিতিকণ্ঠের সঙ্গে সামনের দিকে দু' পা এগিয়ে এলো ; বল্‌লে,—'শঙ্খনাদ'-এর মতো কাগজে আমাদের মতো নতুন লেখকের লেখা ছাপবে কেন? বেরিয়েছিলো একটা 'বঙ্গশক্তি'তে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই হ'বে। কোথায় দেখেছি ঠিক মনে করতে পারছি না। কোঁচাটি তেমনি বাঁ হাতের উপর তুলে দিয়ে সিতিকণ্ঠ স্বচ্ছন্দ হ'য়ে বল্‌লে,—কিন্তু আপনার স্টাইলের সুরটি আমার ঠিক মনে আছে।

বলে' সে এবার পরিপূর্ণ চোখে রথীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে।

সুন্দর, একহারা চেহারার উপর ভারি পরিচ্ছন্ন ছেলেটি। বয়েস বাইশ-তেইশের বেশি হ'বে না। তাদের বংশ যে উঁচু তা বোঝা যাচ্ছে তার চেহারার দৃপ্তিতে, আর তারা যে বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন তা নির্ণীত হচ্ছে তার পোশাকের পারিপাট্যে, আপাতশোভনতায়। ডান হাতের অনামিকায় ঝক্‌ঝক্ করছে একটা আঙ্‌টি, গরদের পাঞ্জাবির বুক-পকেটটা মানি-ব্যাগের ভারে অনেকখানি ঝুলে পড়েছে। ডবল-ঘরে মিনে-করা সোনার বোতাম ঃ রাস্তার ধুলো ঝাঁট দিয়ে চলেছে এমনি লম্বা-লুটোনো তার কোঁচা। অথচ সৌজন্যে, সম্ভ্রমশীলতায় ছেলেটি একেবারে ঘরের ছেলে ঃ বংশ-মর্যাদার অনুপাতে তার চরিত্রে-চেহারায় নেই এতোটুকু অন্যায় আস্পর্ধা। নরম, নিরীহ, নমনীয় একটি ছেলে—সিতিকণ্ঠ হঠাৎ তার প্রতি স্নেহে উদ্বেল হ'য়ে উঠলো।

মোড়ের মুখেই একটা পানের দোকান, গল্প করতে-করতে রথীকে নিয়ে সিতিকণ্ঠ সেখানে এসে হাজির। পকেট থেকে তিনটি পয়সা বা'র করে' সিতিকণ্ঠ পানওলাকে সম্ভাষণ করলে ঃ এক বাণ্ডিল বিড়ি দাও দেখি মহাদেও, সাদা সুতো।

তাড়াতাড়ি, খানিকটা সন্ত্রস্ত হ'য়ে, অপরাধীর মতো মুখ করে' রথী বল্‌লে,—আমার কাছে সিগ্‌রেট ছিলো।

—ও! আচ্ছা। তা হ'লে আর বিড়ি লাগবে না হে। রথীর হাত থেকে শলাইসুদ্ধু গোল্ড্-ফ্লেক্-এর প্যাকেট্‌টি সিতিকণ্ঠ গ্রহণ করলে, একটি রথীকে দিয়ে আরেকটি সে প্যাকেটের উপর ঠুকতে লাগলো। বল্‌লে,—এবার সত্যি বলুন তো আমার গল্পটা কেমন লাগলো ?

মুখ কাঁচুমাচু করে' রথী বল্‌লে,—আমি কী আর বলবো!

—না, না, আপনি তো লেখেন, আপনার মতের নিশ্চয়ই একটা দাম আছে।

নিবিড়াভ চোখ তুলে রথী প্রায় গদ্গদ হ'য়ে বল্‌লে,—চমৎকার। আপনার লেখা আমার ভীষণ ভালো লাগে, ক্ষমা করবেন, কিছুর সঙ্গে তুলনা দিতে পারি আমার সাধ্য নেই। আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করবো ভেবে কতোদিন থেকে সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছি।

সিতিকণ্ঠ স্পষ্ট বুঝতে পারলো এই স্তুতিবাচনের মধ্যে এতোটুকু ভেজাল নেই, খুসি হ'য়ে বল্‌লে—আসুন এই দোকানে। খেতে-খেতে গল্প করা যাবে।

পথের পাশেই একটা মিষ্টান্ন-ভাণ্ডার। লোহার চেয়ার টেনে পাশাপাশি দু'জনে বস্‌লো। দোকানিকে খাবারের অর্ডার দিয়ে সিতিকণ্ঠ জিগ্‌গেস করলেঃ আপনি কোথায় থাকেন ?

নিতান্ত কুণ্ঠিত হ'য়ে রথী বল্‌লে,—আমাকে আপনি বলা কেন ? আমি আপনার কতো ছোট।

—ছোট ? তোমার বয়েস কতো ?

—তেইশ বছর কয়েক মাস হ'বে।

সিতিকণ্ঠ ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটু হাসলোঃ আমার কতো বয়েস হ'বে আন্দাজ করতে পারো ?

খানিকক্ষণ তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রথী সসঙ্কোচে বল্‌লে,—ত্রিশ-বত্রিশ হ'বে হয়তো।

সিতিকণ্ঠ হঠাৎ প্রবলকণ্ঠে হেসে উঠলো, রথীর মুখ গেলো লজ্জায় চুপ্‌সে বিবর্ণ হ'য়ে। সিতিকণ্ঠ বললে,—দেখতে এমনই মনে হয়। সাহিত্যিক হ'লে কী হ'বে, ত্ব'বেলা মুগুর ঘুরাই, রোজ —রেগুলার। কেবল কলম পিষেই দিন কাটাই না। এই ভাদ্রে আমার সবে আটাশ পূর্ণ হ'লো।

রথী সপ্রশংস বিস্ময়ে একেবারে বিমূঢ় হ'য়ে গেলো। বল্‌লে,— এতো অল্প বয়েস, আর এরি মধ্যে কিনা এতোগুলি আপনি বই লিখে ফেলেছেন !

ততোক্ষণে খাবারের প্লেট ত্ব'টো এসে পড়েছে। তারি একটার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে' সিতিকণ্ঠ বল্‌লে,—খান পঁয়তাল্লিশ হ'বে। ত্ব'মাসে গড়পড়তা একখানা করে' বই লিখতে হয় যে। উপায় কী তা ছাড়া ? খেতে হ'বে তো ?

রথী বল্‌লে,—'মর্মরিতা'র সম্পাদক যে আপনার গল্পটি নিয়ে গেলেন, সেটা ওঁর কাগজে ছাপবেন নিশ্চয়ই। কতো দেবেন আপনাকে ?

—রেচেড্‌! আট টাকা, নিতান্ত হাতে-পায়ে ধরলে আর ত্ব' টাকা বেশি। য়্যাবোমিনেব্‌ল্‌! একটা রসগোল্লা সিতিকণ্ঠ আস্ত মুখে পুরে দিলো : কী করা যাবে বলো ? কতো পাপে তোমাদের এই বাংলা দেশে এসে জন্মগ্রহণ করেছি ভাই, অন্য দেশে হ'লে— এ কী, তুমি কিছু খাচ্ছ না যে !

—মিষ্টি আমি ভালোবাসি না।

—তা কী হয় ? সিতিকণ্ঠ বাঁ-হাতে তার পিঠে মৃত্ব-মৃত্ব ত্ব'টো চাপড় দিয়ে হাসিমুখে বল্‌লে,—আমি একা-একা খাবো আর তুমি চুপটি করে' বসে' থাকবে—অসম্ভব। নাও, আরম্ভ করে' দাও।

পীড়াপীড়িতে অগত্যা রথীকে প্লেটে হাত ঠেকাতে হ'লো। ব্যথিত মলিন মুখে জিগ্‌গেস করলে : এতো অল্প পেয়ে চালান কী করে' ?

—সে-কথা আর বোলো না ভাই। তাই অনবরত লিখতে হয়, রাশি-রাশি লিখতে হয়। এতোটুকু বিশ্রাম করবার পর্যন্ত সময় নেই। প্রকাণ্ড সংসার—সবাই আমার দিকে হাঁ করে' চেয়ে আছে। সে-সব কথা বলে' তোমাকে দুঃখ দিতে চাই না।

সহানুভূতির আভায় রথীর দুই চোখ স্নিগ্ধ, নম্র হ'য়ে এলো: আপনি এখানে কোথায় আছেন?

—দর্জিপাড়ার একটা মেস্এ।

—মেস্এ?

—হ্যাঁ, সাহিত্য করে' তো বাড়ি-ভাড়া করে' সবাইকে নিয়ে কলকাতার মতো জায়গায় থাকতে পারি না। খরচে তলিয়ে যাবো যে একেবারে। তাই সবাইকে জঙ্গীপুরে দেশের বাড়িতে বাহাল-তবিয়তে রেখে আমি এখানে একা সংগ্রাম করে' যাচ্ছি। সাহিত্যিক হওয়া যে কী সুখের তা বলে' আর কাজ নেই, শুধু মুখের দু' চারটে সুখ্যাত্ শুনেই আমরা জল। সিতিকণ্ঠ প্রকাণ্ড একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো: ভাবি, এই আমাদের চরম পুরস্কার। পরকে ক্ষণকালের জন্যেও যদি আনন্দ দিতে পারি, তবেই আমাদের পরম সার্থকতা—থাকি না কেন আমরা যতো দুঃখে, যতো গ্লানির আবর্জনায়। আমরা, সাহিত্যিকরা, সত্যিই এতো দুর্বল, রথী, যে কারু মুখে একটু সহানুভূতির কথা শুনলেই আমরা চিরকালের জন্যে তার বন্ধু হ'য়ে যাই। এতে কি আর আমরা কম ঠকি ভেবেছ? সিতিকণ্ঠ ঠোঁট কুঁচকে একটু হাসলো: তা, জীবনে তো আমরা কেবল ঠকতেই এসেছি।

রথীর মুখে অনেকক্ষণ কোনো কথা এলো না। বেদনায় তার গলার স্বর যেন স্তিমিত হ'য়ে এসেছে: আপনার ঠিকানাটা যদি দয়া করে' বলেন—

—আমার ঠিকানা! সে অতি জঘন্য জায়গা। সেখানে তুমি যাবে কী? বরং, সিতিকণ্ঠ ঢক্‌ঢকিয়ে খানিকটা জল খেয়ে নিলো:

তোমার ঠিকানাটা বলো, আমিই না-হয় মাঝে মাঝে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করবো।

আপ্যায়িত হ'বার প্রাবল্যে রথী যেন একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে গেলো। বললে,—আপনি যাবেন আমার ওখানে? আমার এতো সৌভাগ্য হ'বে?

আঙুল দিয়ে প্লেট থেকে সিরে তুলে চাট্‌তে-চাট্‌তে সিতিকণ্ঠ বললে, দু' দশখানা উপন্যাস লিখেছি বলে' তো আর আমার ল্যাজ গজায়নি ভাই, যে গাছের মগ্‌ ডালে বসে' থাকবো। সাহিত্যিক হ'য়ে যদি সাহিত্যিকের সঙ্গে সমান জায়গায় এসে না মিশি—

—বেশ, আমার ঠিকানা দিচ্ছি, আপনারটাও তা হ'লে বলুন।

ঠিকানা-বিনিময়ের পালা শেষ হ'তে-না-হ'তেই দোকানি এসে সবিনয়ে জিগ্‌গেস করলে: আর কিছু দেবো?

সিতিকণ্ঠ তার চোখ ঢুলিয়ে, একটু-বা সকাতরে, রথীর দিকে তাকালো।

রথী বললে,—নিন্‌ না, আরো কিছু নিন্‌ না যা চাই।

সিতিকণ্ঠ পাঞ্জাবির ডান-হাতটা বাঁ হাতে গুটোতে-গুটোতে বললে,—যদি বলো তো রাত্রের খাওয়াটা এখেনেই সেরে যাই। মেস্‌-এর সে কী বিচ্ছিরি খাওয়া, ভাবতেও বমি আসে—কতো রাত আমি ঠায় না-খেয়েই কাটিয়ে দিই। কী বলো, খাওয়াচ্ছ যখন, পেট পুরেই এক রাত খেয়ে নি, হয়তো কালকেই আবার উপোস করতে হ'বে। কী না জানি বলে, Ars longa, কী না-জানি কথাটা—সিতিকণ্ঠ গলা ছেড়ে হেসে উঠলো।

রথী বল্‌লে,—নিশ্চয়। আরো দিক্‌ না দু'টো মিহিদানা। কই হে—

খেতে-খেতে সিতিকণ্ঠ বল্‌লে,—কেবল নিজের কথাই পাঁচ কাহন বলে' যাচ্ছি, তোমার খবর কিছুই নেয়া হচ্ছে না। হ্যাঁ, এখানে তুমি কী করো?

লজ্জায়, এক নিমেষে রথীর মুখ-চোখের চেহারা যেন কাহিল হ'য়ে গেলো। গ্লাশের জলে হাত ধুতে-ধুতে বললে,—বিশেষ কিছুই নয়।

—না, না, আমাকে বলো। আমাকে বলতে তোমার বাধা কী? খালি সাহিত্যই করছ, না আর-কিছুর ওপর চোখ আছে?

রুমালে হাত-মুখ মুছে নিয়ে রথী অল্প একটু হেসে বল্‌লে,—দু' বছর ধরে' ক্রমাগত বি-এ দিচ্ছি। বাড়ি থেকে বলছে আরো একবার চেষ্টা করে' দেখতে। কিন্তু আমার দ্বারা কিছু হ'বে না।

—তবে যেখানে তুমি আছ, কৌতূহলে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে' সিতিকণ্ঠ জিগ্‌গেস করলে: সেটা তোমার বাড়ি নয়?

—না, বাড়ি আমার পাবনা-জেলায়। এখানে আমি দোতলায় একটা ফ্ল্যাট্ ভাড়া নিয়ে আছি। বড়ো-বড়ো দু' খানা ঘর, বাথরুম, বারান্দা—যেমন আলো, তেমনি হাওয়া—সেদিক দিয়ে কিন্তু খুব সুবিধে।

—বাঃ, কতো ভাড়া দাও?

—বেশি নয়, পঁয়ত্রিশ টাকা, লাইট নিয়ে।

সিতিকণ্ঠ শুকনো একটা ঢোঁক গিলে জিগ্‌গেস করলে: তবে মাঝে-মাঝে তোমার বাড়ি থেকে প্রায় শ' খানেক টাকা আনতে হয় বলো?

—কখনো-কখনো তারো চেয়ে বেশি আসে।

—তা তো ঠিকই। ঘাড় দুলিয়ে সিতিকণ্ঠ সম্মতির একটা দীর্ঘ সঙ্কেত করলে; কল্‌কাতার মতো জায়গায় ভদ্র ভাবে থাকতে গেলে লাগবেই তো,—ও একটা বেশি কথা কী। কম করে' একশো টাকায় চালানোও কী কঠিন আজকাল!

—কিন্তু, রথী বিষণ্ণ গলায় বল্‌লে,—বি-এ আর না পড়লে দিদিমা কিছুতেই আমাকে কল্‌কাতায় রাখতে চান্ না। কল্‌কাতা ছাড়া বাঙলাদেশের আর কোথায় ভদ্রলোক বাঁচতে পারে বলুন?

লেডিকেনিতে আলগোছে একটা আমূল কামড় বসিয়ে সিতিকণ্ঠ বল্‌লে,—একশোবার সত্যি।

—তাই আমাকে বি-এ পড়ার ভান করে' আরো এক বছর কল্‌কাতায় থাকতে হচ্ছে।

তা তো ঠিকই। বাকিটা মুখের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে সিতিকণ্ঠ বল্‌লে,—এখন তোমার তবে কী করবার ইচ্ছে?

রথী গাঢ় গলায় বল্‌লে,—সাহিত্য। আমি এর মধ্যে একটা উপন্যাসও লিখে ফেলেছি।

—বাঃ, চমৎকার। সিতিকণ্ঠ হঠাৎ উৎসাহে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলোঃ এই তো চাই। লিটারেচারের কাছে কিসের তোমার ঐ গুচ্ছের কেতাবি লেখাপড়া? রাবিশ, রট্‌। বাঙলা সাহিত্যে যাঁরা বিশ্ববিশ্রুত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কে তোমার ঐ কলেজের চৌকাঠ মাড়াতে গেছেন শুনি? ধরো রবীন্দ্রনাথ, ধরো শরৎচন্দ্র। টেনেটুনে ম্যাট্রিকটা আমিও কোনো রকমে পাস করেছিলাম, তারপর সাহিত্যের ডাক এসে পড়তেই সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে সটান্ ভেসে পড়লাম। সরস্বতী কি কেবল তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ে, আমাদের লেখনীর মুখে কি তার আসন পাততে পারবো না? আমরা পরের চর্বিত চর্বণ করবো কি হে, আমরা করবো সৃষ্টি। আমরা কেন পড়তে যাবো, লোকে আমাদেরটা পড়বে। ভালোই করেছ ও-সব জঞ্জালে জলাঞ্জলি দিয়ে, চাই অবিচল নিষ্ঠা, আপ্রাণ সাধনা। জীবনে সাহিত্যের জন্যে কম দুঃখ সয়েছি ভাই? কিন্তু কখনো প্রতিজ্ঞা ছাড়িনি। নইলে কম্-সে-কম্ একটা বি-সি-এস্ হ'য়ে কি আর এক দিন মোটর হাঁকাতে পারতাম না? সে-পথই আমাদের নয়। আমরা স্রষ্টা, আমরা অবিনশ্বর।

সিতিকণ্ঠের তেজোদীপ্ত মুখের দিকে রথী নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইলো—মুখে যেন তার চিত্তের আভা হয়েছে প্রতিফলিত। প্রশস্ত কপালে যেন তার দুঃখ-সহনের সবল নিষ্ঠুরতা, দুই চোখ

যেন কল্পনার কুহেলিকায় আবিষ্ট হ'য়ে এসেছে। গ্লাশের জলে হাত ধুয়ে সিতিকণ্ঠই ফের বলতে লাগলো ঃ জীবনে কম দুর্গতি, কম প্রলোভন এসেছে? কিন্তু কখনো, কোনোদিন একচুল ভ্রষ্ট হই নি। উনুনে কতোদিন হাঁড়ি চড়ে নি, ঝড়ে কতোবার ঘর-দোর উড়ে গেছে, পরিবারে কতো অশান্তি, কতো বাধা-বিপদ্, তবু একদিন হাত থেকে কলম ছাড়ি নি ভাই। নইলে, অমন অবস্থায় পড়ে' সাধারণ মানুষ যা করে' হোক্ বাঁধা-ধরা একটা চাকরি যোগাড় করে' নেয় যেমন-তেমন। বীট্‌মল্ আগরওয়ালারা তাদের ফার্মে আমাকে দু'শো টাকার একটা চাকরি দিতে কতো সাধাসাধি, কতো ঝোলাঝুলি করেছে। কিন্তু কোনোদিন এক ইঞ্চি টলিনি, টাকার জন্যে আমার সাহিত্য, আমার idea-কে তো অপমান করতে পারি না। শেষকালে টাকা রোজগার করতে গিয়ে আমার প্রতিভা, আমার হেরিটেজ্ হারিয়ে বস্‌বো? প্রাণের চেয়ে প্রতিভা আমাদের বড়ো। সেই না কী বলে' গেছে ডি. এল. রায়, 'চাহি না অর্থ, চাহি না মান।'—আমাদের তেমনি অটল সাহিত্যনিষ্ঠা। কোনোদিন একটা টিউশ্যনি পর্যন্ত করি নি। সাহিত্য, সাহিত্যই আমার লোড্-স্টার, বাঙলায় তোমরা যাকে বলো ধ্রুবতারা।

রথী গলে' গিয়ে বল্‌লে,—নিশ্চয়। একেই তো বলে সাধনা।

—বলে কি না? তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সিতিকণ্ঠ বল্‌লে,—সেই দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাসের পৃষ্ঠা উলটে তোমাকে অকারণে দুঃখ দিতে চাই না। কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলে' রাখি ভাই, তুমি এ-রাস্তায় নতুন এসেছ, কখনো হাল ছেড়ো না, অনবরত, অনর্গল লিখে যাবে। আর কোনোদিকে লক্ষ্য নয়, ঐ-সব কলেজি পড়ায় কাঁচকলাও তোমার লাভ নেই, শুধু শক্তির অপচয়—আমাদের সাহিত্যিকদের হাতে সময় অতো অঢেল নয়—

রথী মুখের একটা দৃঢ় ভঙ্গি করে' বললে,—না, ও আমি ছেড়ে দিয়েছি একেবারে। এখন সাহিত্যই আমার অবলম্বন,—আপনার সাহায্য, আপনার উপদেশ পেলে—

সস্নেহে তার পিঠ চাপ্ড়ে দিয়ে সিতিকণ্ঠে বললে,—একশোবার। আমাদের যে ভাই হোলি-ফ্র্যাটার্নিটি। তা, তোমার উপন্যাস কতো বড়ো হ'বে?

আনন্দে সহসা প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে রথী বললে,—আপনি পড়বেন আমার বই? একটু দেখে দেবেন?

সিতিকণ্ঠ বললে,—দেখে দেবো মানে? চালিয়ে দেবো অনায়াসে।

—আমার বই? যদি ভালো না হয়?

—ভালো হ'বে না মানে? আমি যে-বই রেকোমেণ্ড করে' দেবো, সে-বই ভালো না হ'য়ে পারে? সিতিকণ্ঠ গলায় অনাবশ্যক জোর দিলে: আমি বলে' দিলে কোনো পাব্লিশারের সাধ্য আছে সে-বই refuse কর্বে? ন্যায্য দাম পর্যন্ত আদায় করে' ছাড়বো।

সকুণ্ঠ, সকৃতজ্ঞ গলায় রথী বললে,—না, পয়সার জন্যে আমার বিশেষ লোভ নেই, দয়া করে' কেউ যদি ছাপে—

—ছাপে মানে, একশোবার ছাপ্বে। আমার কথা ঠেলতে পারে এতোটা মুরোদ কোনো পাব্লিশারের এখন পর্যন্ত হয় নি। আমার বই বেচেই তারা মানুষ।

—তবে ম্যানাস্ক্রিপ্টা আপনার কাছে নিয়ে যাবো?

স্যাণ্ডেলের স্ট্র্যাপের মধ্যে পা গলাতে-গলাতে সিতিকণ্ঠ বললে,—যে-কোনোদিন।

মানি-ব্যাগ থেকে রথী একখানা দশ টাকার নোট বা'র করলো: ও কী, আপনার খাওয়া হ'য়ে গেলো? পেট ভরেছে তো?

হেসে মুখখানা স্নিগ্ধ করে' সিতিকণ্ঠ বললে,—Enough. আজ

এই থাক্। তাতে কী, খাওয়া তো আর একদিনেই পালিয়ে যাচ্ছে না।

সে-রাত্রে ফ্ল্যাট্‌এ ফিরে এসে অনেকক্ষণ ধ'রে রথী আনন্দের উত্তেজনায় ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলো। আজ তার জীবনে নতুন সুপ্রভাত ; যেন দূর-দুর্গম দুস্তর তীর্থপথে সে গুরুর সন্ধান পেয়েছে, অরণ্যে যে দেখিয়ে দেবে পথ, অন্ধকারে জ্বালবে যে প্রাণের বহ্নিচ্ছটা। চোখে শুধু তাকে একটিবার দেখেই সে কৃতার্থ হ'তে চেয়েছিলো, কিন্তু দেখা ছেড়ে একেবারে এই আলাপ, এই নিবিড় ঘনিষ্ঠতা। কী চমৎকার মানুষ! এতো বড়ো একজন লেখক হ'য়ে কোথাও তার এককণা অহঙ্কার নেই, কী অনায়াসে, চিত্তের কী উদার অজস্রতায় এক নিমেষে তিনি একজন অখ্যাত, অকিঞ্চিৎকর লোকের এতো আত্মীয়, এতো অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠতে পারলেন। কী দরকার পড়েছিলো তাঁর রথীকে দিতে এই সস্নেহ সান্নিধ্য, হৃদ্যতার এই উত্তাপ? যে-শিল্পের সাধনায় তিনি নিযুক্ত তার লাবণ্য তাঁর চরিত্রে হয়েছে পরিব্যাপ্ত, তাই তাঁর ভাষায় ও ব্যবহারে এমন অকুণ্ঠ, অমায়িক স্বাচ্ছন্দ্য। নিঃসঙ্কোচ, নিরহঙ্কার —একেবারে যেন মাটির মানুষ। সহানুভূতিতে কতো উদার— সামান্য, নগণ্য এক অপরিচিত লোকের সঙ্গে পাশাপাশি বসে' খাবার খেতে পর্যন্ত তাঁর আপত্তি নেই, তাঁর মর্যাদাহানি হয় না। খ্যাতির উত্তুঙ্গতম চূড়ায় যিনি অধিষ্ঠিত, কী সহজে তিনি কাঁধে হাত রেখে সমান জায়গায় বন্ধুর মতো গা ঘেঁষে এসে দাঁড়ান! সাহিত্যের প্রতি তাঁর অসীম প্রীতি বলে'ই রথীর মতো লেখকাণুকেও তিনি অস্বীকার করতে পারলেন না। দিলেন তাকে সাহচর্য, এই উদ্দাম, উন্মত্ত অনুপ্রেরণা।

মনে-মনে এই মানুষটির কথা যতোই সে নাড়াচাড়া করছে, ততোই যেন সে বিস্ময়ের পার খুঁজে পাচ্ছে না। কী সরল, নিঃস্পৃহ, আত্মভোলা লোকটি! তার পাশে লোহার চেয়ারে

বসে’ দস্তুরমতো আঙুল দিয়ে খাবার ভেঙে-ভেঙে হাঁ করে’-করে’ তিনি অনর্গল খেলেন—সেই সিতিকণ্ঠ গাঙ্গুলি, বাংলাদেশের সেই অদ্বিতীয় কথাশিল্পী, এ-কথা এখন সজ্ঞানে বিশ্বাস করতেই তার আশ্চর্য লাগছে। এমন আত্মভোলা যে সিগ্রেটের প্যাকেট্টা পর্যন্ত ফিরিয়ে দিতে ভুলে গেছেন। মাধুরীর কাছে সে কতো গল্প করতে পারবে। এমন একজন দেশবরেণ্য লেখক—যাঁর লেখার প্রতি স্বয়ং মাধুরী পর্যন্ত আসক্ত, যাঁর লেখা নিয়ে দু’জনে কতো তর্ক, কতো গবেষণা করেছে, সেই লেখকের সে বন্ধু—এই পরিচয়ে রথীর কতো মর্যাদা বেড়ে যাবে না-জানি। মাধুরী তো পেয়েছে শুধু তাঁর পরোক্ষ পরিচয়, রথী একদিনে একেবারে তাঁর অন্তরের অন্তঃপুরে এসে ঢুকেছে।

রথী অনেক রাত জেগে সিতিকণ্ঠের একখানা বহুপঠিত উপন্যাস আরেকবার শেষ করলো। মনে ধরিয়ে নিলো অনুপ্রাণনার আগুন, তারপর তার সদ্যসমাপ্ত উপন্যাসের সংস্কার করতে বসে’ বাকি রাতটুকু সে একফোঁটাও ঘুমুবার সময় পেলো না।

দুই

খবরের কাগজের প্যাকেটে পাণ্ডুলিপি মুড়ে, চাদরের তলায় লুকিয়ে রথী একদিন ঠিকানা চিনে সিতিকণ্ঠের মেস্‌এ এসে হাজির। পুরোনো, ভাঙা, ইঁটের পাঁজর-বা'র-করা নোংরা একটা বাড়ি—নিচেটায় টিনের ট্রাঙ্কের একটা কারখানা, ও-পাশে গা ঘেঁষে আবার একটা ধোপাদের বস্তি। অপরিচ্ছন্ন গলিটার আবিল আবহাওয়ায় রথীর প্রায় দম বন্ধ হ'বার যোগাড়।

কাঠের নড়বড়ে সিঁড়িতে বহুকষ্টে শরীরের ভারকেন্দ্র বজায় রেখে রথী উপরে উঠে গেলো। ডাইনে ঘুরেই সিতিকণ্ঠের ঘর, মেঝেতে একটা মাদুর বিছিয়ে খালি গায়ে উবু হ'য়ে সিতিকণ্ঠ একমনে কী লিখে চলেছে। চৌকাঠের এ-পারে রথী খানিকক্ষণ স্তব্ধ, স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কৃচ্ছ্র সাধনারো কোথাও নিশ্চয়ই একটা সীমা আছে, কিন্তু এ কী, সিতিকণ্ঠ এ কোথায়, কী কুৎসিত পরিবেশের মধ্যে বসে' তার কল্পনাকে দিচ্ছে পরিসর, তার স্বপ্নকে দিচ্ছে মূর্তি! গরমে সিতিকণ্ঠের গা থেকে টপ টপ করে' ঝরে' পড়ছে ঘাম, তার গলার পৈতেটা থেকে জুতোর একটা ফিতে পর্যন্ত বেশি পরিচ্ছন্ন। মেঝের উপর টাল করে' পড়ে' আছে ময়লা কাপড়ের কাঁড়ি, জুতো-জামা, খাতা-পত্র। ঘর তার একলার নয় নিশ্চয়ই, ও-পাশে আর কা'রা তিনজন সজোরে অমৃতবাজারের ইংরিজি মুখস্ত করছে। পাশে একটা তক্তপোশ, পোড়া বিড়ির আগুনে বিছানার চিট্‌চিটে চাদরটা তার শতছিদ্র। চারিদিক দেখে রথীর মন কেমন মুষড়ে পড়লো, চোখ এলো ছলছলিয়ে। অন্যায়, অন্যায়, সিতিকণ্ঠবাবুর এতো কষ্ট, এতো অসুবিধা সইবার কোনো অধিকার নেই। তিনি শুধু নিজের নন্‌, তিনি সমগ্র

বাংলা-দেশের। এই ভাবে, এই গ্লানিকর, হীন পারিপার্শ্বিকতায় তাঁর এই আত্মাবমাননা অসহ্য।

রথী ডাকলো: সিতিকণ্ঠবাবু।

সিতিকণ্ঠ সন্ত্রস্ত হ'য়ে তাড়াতাড়ি কোঁচার খুঁটটা গায়ে জড়িয়ে বলে' উঠলো: ও! তুমি? আরে এসো, এসো, এতোক্ষণ তোমার কথাই ভাবছিলাম বোসো ভাই, উৎফুল্ল হ'য়ে সিতিকণ্ঠ উঠে দাঁড়ালো: তারপর, কেমন আছো?

রথী তক্তপোশের এক ধারে কুণ্ঠিত হ'য়ে বস্‌লো। বললে,—লিখছিলেন বুঝি? এসে বিরক্ত করলাম নিশ্চয়ই।

—আর বিরক্ত! হাসিতে দুই চক্ষু উদ্বেল করে' সিতিকণ্ঠ বললে,—এতো অল্পে বিরক্ত হ'লে আমাদের চলে না। সারাক্ষণ যে কানের কাছে এরা পোলিটিক্যাল কামান দাগছে তাতে পর্যন্ত আমার ধৈর্যচ্যুতি নেই। দাও, দাও, একটা সিগ্‌রেট দাও দেখি, সারাক্ষণ বিড়ি টেনে-টেনে গলায় ফেরিন্‌জাইটিস্‌ হ'য়ে গেলো।

আর্দ্র কণ্ঠে রথী বললে,—এইখানে এই গোলমালের মধ্যে আপনি কী করে' লেখেন?

ঘাড়ের একটা গর্বিত ভঙ্গি করে' সিতিকণ্ঠ বললে,—একেই বলে সাধনা। দারিদ্র্য নিয়ে লিখছি, দারিদ্র্য না নিজে অনুভব করলে চলবে কেন? এই মেস্‌টা আমার গল্পের কতো খোরাক যোগায় তার কিছু খেয়াল করতে পারো?

রথী কুণ্ঠিত হ'য়ে জিগ্‌গেস করলে: খুব সস্তা বুঝি?

—তা সস্তা বটে, কিন্তু সস্তার জন্যে এই মেস্‌ আমি বাছি নি, রথী। তুমি ভুল ভেবেছ সিতিকণ্ঠ সিগ্‌রেটে টান দিয়ে মাথাটা পরিষ্কার করে' নিলো: আমি ইচ্ছে করে'ই এখানে ঘর নিয়েছি। এর এই কুৎসিত আবহাওয়াটাই আমার উপন্যাসের ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড হিসেবে ব্যবহার করি যে। মোটরে চড়ে' বস্তি ঘুরে এলে তো

আর তার কিছু জানা হ'লো না, সেইদিনই তো তা শুন্‌লে, দেশের মাটির সঙ্গে একটা প্রত্যক্ষ সংযোগ রাখতে হ'বে তো!

সেদিনের সভায় জামা-কাপড়ের আড়ালে রথী সিতিকণ্ঠের এই হৃতশ্রী, কঙ্কালসার চেহারাটা দেখতে পায় নি, আজ যেন তার বুকের ভিতরটা পুঞ্জিত দীর্ঘশ্বাসে হঠাৎ হাহাকার করে' উঠলো। সমস্ত বাড়িটার সঙ্গে বাসিন্দাটির কোথায় যেন একটা অতিকরুণ মিল আছে, বহিরবয়বে দুইই এসে পোঁচেছে জীর্ণতার অন্তিম সীমানায়ঃ চোয়ালের হাড় দু'টো আছে মুখিয়ে, বুকের পাঁজর ক'খানা করছে জিরজির। চোখের কোল ঘেঁষে ঘন করে' পড়েছে কালির পোঁচ, গায়ের চামড়ার উপর আঠার মতো লেপটে আছে মলিন বিশুষ্কতা। পরনের কাপড়টার মধ্যে পর্যন্ত একটা শ্রী নেই। দেখে মনে করা অসম্ভব এ-শরীরে ব্যায়ামের একরতি কান্তি আছেঃ বয়সের থেকে তাঁকে যেন কেমন দেখাচ্ছে বুড়োটে। সমস্ত শরীর কেমন-যেন একটা অসহায় অবসাদের ভারে রয়েছে স্তিমিত, নিঝুম। সেদিনের সভায় তাঁর এই অপরিসীম ক্লান্তি ও কালিমার এককণাও তার নজরে পড়ে নি, আজ তার সমস্ত মন ম্লান, এতোটুকু হ'য়ে গেলো।

বেদনায় বিবর্ণ গলায় সে বল্‌লে,—কিন্তু এখানে থেকে আপনার শরীর যে দিন-কে-দিন মাটি হ'য়ে যাচ্ছে। আমাদের ওখানে চলুন।

শেষের কথাটা শুনে সিতিকণ্ঠ হঠাৎ একটা সূক্ষ্ম কায়দা করে' কথার মোড় ফেরালোঃ তা যা বলেছ। শরীরটাই এখানে ভালো থাকছে না। যা বিচ্ছিরি রান্না, কতোদিন থেকে পেটে কেমন একটা ব্যথা হ'য়ে আছে। সিতিকণ্ঠ কর্ণমূল পর্যন্ত একটি হাসি প্রসারিত করে' ধরলোঃ বা, আমি যে কেবল নিজের সুখ-দুঃখের কথাই বলতে বস্‌লাম। তারক! তারক! সিতিকণ্ঠ দরজার দিকে এগিয়ে এলো।

রথী জিগ্‌গেস করলে : কা'কে ডাকছেন ?

—শালা চাকরকে। তোমার জন্যে এক পেয়ালা চা নিয়ে আসুক।

—না, না, চা আমি খেয়ে এসেছি।

—তুমি খেয়ে এসেছ, কিন্তু আমার তো এখনো হয় নি কিনা। বলে' সিতিকণ্ঠ দবজা দিয়ে ফের গলা বাড়ালো : ওরে হতভাগা তারক, একবার ইদিক পানে আয় দিকি শিগ্‌গির।

গামছায় বুক-পিঠ রগ্‌ড়ে ঘাম মুছতে-মুছতে তারক আসতেই সিতিকণ্ঠ রথীর মুখের উপর প্রশ্ন করলে : তুমি চায়ের সঙ্গে কিছু খাবে নাকি ? কিছু গরম সিঙাড়া, জিলিপি ?

রথী ম্লান হেসে বল্‌লে—না, আমার দরকার নেই। আপনি যদি খান—বলে' সে হঠাৎ তা'র মানি-ব্যাগে হাত দিলো।

বাধিত, তৃপ্ত মুখে সিতিকণ্ঠ বল্‌লে,—খালি-পেটে চা আমার একদম সহ্য হয় না কিনা—

—না, না, তাতে কী! অমিই দিচ্ছি। রথী একটা টাকা বা'র করলে।

—একেবারে একটা টাকাই ? সিতিকণ্ঠ পরম নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে টাকাটা আলগোছে তুলে নিলো; হাসিমুখে বল্‌লে,—একেই বলে ভাগ্যের রসিকতা। আমি হ'লাম তোমার host, আর খাওয়াচ্ছ কিনা তুমিই। তারকের দিকে ইশারা করে' বল্‌লে—শোন্! বলে' তাকে তক্ষুনি ডেকে নিয়ে গেলো সামনের বারান্দায়।

রথী স্পষ্ট শুন্‌তে পেলো সিতিকণ্ঠ শেষের দিকে তাকে ফিস্‌-ফিসিয়ে বলছে : আর শোন্, এক প্যাকেট গোল্‌ড-ফ্লেক্ নিয়ে আসবি, দু' দোনা পান, গুণ্ডি আন্‌তে ভুলিস্ নি যেন—

তারককে দোকানে পাঠিয়ে সিতিকণ্ঠ এবার তার পেরেকে-টাঙানো জায়গায়-জায়গায় ট্রাঙ্কের লাল মর্চে-ধরা ময়লা পাঞ্জাবিটা

গায়ে দিলো। তক্তপোশে বসে' গলাটা একবার খাঁখ্‌রে, দু'বার ঢোঁক গিলে জিগ্‌গেস করলে : তুমি কতো না-জানি বাড়ি-ভাড়া দাও বলেছিলে ?

ইঙ্গিতটা যেন রথীকে আমূল নাড়া দিয়ে উঠলো। উৎসাহে উজ্জ্বল চক্ষু মেলে সে বল্‌লে,—সে জন্যে আপনার কিছু ভাবতে হ'বে না। আপনি চলুন না আমার ওখানে। দু'টো ঘরের মধ্যে একটা ঘর তো আমার এমনি ফাঁকাই পড়ে' থাকে। দিব্যি ফিট্‌ফাট্, নিরিবিলি ঘর। এখানে এই মেছো-হাটার মধ্যে বসে' কেউ কোনো কাজ করতে পারে ?

মুখের কথা লুফে নিয়ে সিতিকণ্ঠ প্রায় ঢলে' পড়ে' বল্‌লে,—যা বলেছ। তা'ও, আর কিছু করা নয়, সাহিত্য-সৃষ্টি।

—না, আপনি আমার ওখানে চলুন। আপনার কোনো অসুবিধে হ'বে না।

উদাসীন, নিস্পৃহ মুখভাব করে' সিতিকণ্ঠ বললে,—না, অসুবিধে কী! দু'জন সাহিত্যক-বন্ধু একত্র এক জায়গায় থাকবো সেটা তো দু'জনের পক্ষেই ভালো।

—আমার পক্ষে তো প্রায় স্বর্গ বলা যেতে পারে। রথী আনন্দে চঞ্চল হ'য়ে উঠলো : আপনি সঙ্গে থাকলে আমার কতো লাভ হয়, কতো আমি আপনার কাছ থেকে শিখ্‌তে পারি।

—হ্যাঁ, সিতিকণ্ঠ গলাটা খাদে নামিয়ে আনলো : সাহিত্যের পক্ষে companionship একটা খুব বড়ো জিনিস।

—তারপর আপনি সঙ্গে থাকলে, রথী আনন্দে যেন একেবারে দিশেহারা হ'য়ে উঠেছে : আমার কতো বড়ো একটা বিজ্ঞাপন হয় বলুন দিকি। আপনার সঙ্গে-সঙ্গে থাকলে কতো সহজেই আমি সাহিত্যসমাজে একটা ready introduction পেয়ে যাবো।

—হ্যাঁ, সিতিকণ্ঠ যেন গভীরতরো চিন্তায় ডুবে গেলো : কতো লোক আমার সঙ্গে নিত্য দু'বেলা দেখা করতে আসছে, আমার কী

ভীষণ heavy mail—সব তো এখন থেকে তোমার ঠিকানাতেই আসা-যাওয়া করবে,—কী বলো ? তা তোমার একটা জাঁকালো-রকম publicity হ'বে বৈকি।

হ্যাঁ, আপনি চলুন।

—মৃদু-মৃদু হাসির সঙ্গে মৃদু-মৃদু ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে সিতিকণ্ঠ বললে,—দাঁড়াও, ভেবে দেখি।

—কিছুই ভাববার নেই, সিতিকণ্ঠবাবু।

—বা, সিতিকণ্ঠ হঠাৎ যেন তার মুখের উপর ধমকে উঠলো : তুমি আমাকে তোমার বন্ধু বলে' স্বচ্ছন্দে ঘর ছেড়ে দিচ্ছ, আর আমি কিনা তোমার কাছে এখনো বাবু—এতোখানি পর !

কুণ্ঠায় মলিন হ'য়ে ভীরু, অস্ফুট গলায় রথী বললে,—না, কিছুই আপনার ভাববার নেই, সিতিকণ্ঠ-দা। চমৎকার ঘর—বড়ো ঘরখানাই আপনাকে ছেড়ে দেবো, দক্ষিণটা একেবারে খোলা, হু-হু করছে হাওয়া। চাকর, ঠাকুর—কোথাও এক তিল অসুবিধে নেই। লাগোয়া বাথরুম, ছাদ—

—আর এখানে তো ছাদে উঠবার একটা সিঁড়িও নেই। একতলায় উঠোনের ওপর একটা চৌবাচ্চা, তাতে যতো রাজ্যের লোক এসে চান করে' যাচ্ছে। তেল মেখে এক যুগ দাঁড়িয়ে থাকলে তবে যদি জায়গা পাওয়া যায়। সিতিকণ্ঠ সজোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বা'র করে' দিলো : দুঃখের কি আর শেষ আছে ভাই ?

—বেশ তো, আপনি একদিন নিজের চোখে দেখেই আসবেন না-হয়। বিনয়ে মাটির সঙ্গে প্রায় মিশে গিয়ে রথী বললে,—গরিব, নগণ্য সাহিত্যিকের বাড়ি একদিন পায়ের ধুলো না-হয় দিলেনই !

সস্নেহে তা'র পিঠটা একটু ঠুকে দিয়ে সিতিকণ্ঠ বললে,—কী যে বলো ! বন্ধুর বাড়িতে যাবো, তার আবার অতো কী কথা।

—সত্যি, আপনার এতোটুকু অসুবিধে হ'তে দেবো না। আমি একলা মানুষ, অতো জায়গায় আমি যেন হাঁপিয়ে উঠি, সিতিকণ্ঠ-দা। আপনি নির্বিবাদে, নিশ্চিন্ত হ'য়ে সেখানে লিখতে পারবেন। বড়ো রাস্তা থেকে দূরে, একটা নিরিবিলি গলির মধ্যে, এতোটুকু কোথায় গোলমাল নেই। সত্যি, আপনি চলুন, খুব ভালো হ'বে।

—না, তুমি যখন বলছ, তখন অসুবিধে হ'বে কেন? তবে কিনা—এই যে তারক এসে গেছে। সিতিকণ্ঠ উঠে দাঁড়ালো: একেবারে থালায় করে' সাজিয়ে এনেছে যে। ব্যাটা দেখছি খুব বাহাদুর।

বাঁ-হাতে একথালা পর্বতপ্রমাণ খাবার, ডানহাতে এনামেলের একটা কেট্‌লি—তারক ঘরে ঢুকলো। বেলা দশটা বাজে, খাবারের এই বহর দেখে রথীর তো চক্ষুস্থির। তার এই দৃষ্টির মর্মানুসরণ করতে সিতিকণ্ঠের মুহূর্তমাত্র দেরি হ'লো না। অকস্মাৎ সে চাকরের মুখের উপর বিকট কণ্ঠে একটা গর্জন করে' উঠলো: ব্যাটা উজবুক কোথাকার, একেবারে বাজারসুদ্ধু সওদা করে' এনেছিস্ যে। এতো তোর কে খাবে? এঁ্যা, সঙ্গে আবার পান, বাক্স ভরে' সিগ্‌রেট। হাতে গোটা টাকা পেয়েছিস বলে' যে একেবারে খয়রাত শুরু করে' দিয়েছিস। টাকা অমনি তোর গাছে ফলে? বলার সঙ্গে-সঙ্গে তক্তপোশের উপর সিতিকণ্ঠ একটা খবরের কাগজ পেতে দিলো: নে, রাখ্। ত্যাখো দিকি একবার কাণ্ড। এতো এখন কে খায় বলো তো?

থালা আর কেট্‌লি নামিয়ে রেখে তারক অপরাধীর মতো মুখ করে' বললে,—তা আমি কী করবো বাবু। মোড়ের পানওয়ালার কাছে গোলডফেলেক্ নেই, তাই কাঞ্চি নিয়ে এসেছি।

—আমার মাথা কিনে ফেলেছ আর-কি। সিতিকণ্ঠ দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো।

রথী নরম হ'য়ে বললে,—সিগ্রেট্টা তো ঠিকই এনেছে—ও তো আর ফেলা যাবে না।

—হ্যাঁ, সিতিকণ্ঠ হঠাৎ নির্ভুল স্বর বদলে নিলো: ব্যাটার বুদ্ধি আছে ইদিকে। জলখাবারের পর বাবুদের যে একটু ধোঁয়া চাই সে-বিষয়ে ব্যাটা খুব সজাগ। সিঙাড়া একটা আস্ত মুখে পুরে দিয়ে সজল গলায় বললে,—নাও, আরম্ভ করে' দাও।

তারক ট্যাঁক থেকে ফিরতি পয়সা বা'র করে' সিতিকণ্ঠের হাতে দিলে। সিতিকণ্ঠ হুকুম করলে: তক্তপোশের তলা থেকে বাটিগুলো বা'র কর জলদি। ঐ কুঁজোয় জল আছে, ধুয়ে দে চটপট। তুমি আরম্ভ করো, রথী।

তক্তপোশের তলা থেকে কলাই-করা টিনের কতোগুলি ছোটছোট মগ বেরুলো। উঠলো ফিকে লালচে চায়ে ভরতি হ'য়ে। সিতিকণ্ঠ হাঁক দিলে: চা খাবে নাকি হে অখিল? ওহে মনোরঞ্জন! ওহে ব্যোমকেশ! চা—the cup that cheers and not—আহাহা, কী যেন কথাটা—আহাহা—

অখিল ও তার সাঙ্গোপাঙ্গেরা নিচে স্নান করতে যাবার উদ্যোগ করছিলো, তাদের আপিসের বেলা হ'য়ে যাচ্ছে। চায়ের ডাক শুনে এলো হন্তদন্ত হ'য়ে।

একটা বাটি তুলে নিয়ে অখিল বললে,—খালি তরল পদার্থই খানিকটা পান করাবে নাকি?

—পাগল! ছোঁ মেরে দুটো সিঙাড়া তুলে নিয়ে মনোরঞ্জন বললে,—চুন বাদ দিয়ে পান খাওয়া আমাদের পোষাবে না।

ব্যোমকেশ একথাবা জিলিপি নিতে যাচ্ছিলো, অখিল তা'র হাতটা চেপে ধরে' বললে—খবরদার বোম্কেশ, মিষ্টিগুলো শুধু সিতিকণ্ঠের জন্যে। ও হচ্ছে গিয়ে, যাকে বলে, সত্যিকারের মহাদেব, খাঁটি সিদ্ধপুরুষ—

চোখ পাকিয়ে নেপথ্য থেকে সিতিকণ্ঠ তাকে একটা গূঢ় ইশারা

করলে। বললে,—তুমি যে কিছু খাচ্ছ না রথী। নাও, ধরো—তা কী হয়? আমাদেরই কি খুব একটা কিছু খিদে পেয়েছে?

সিতিকণ্ঠের অনুরোধেই যা-হোক রথী একটা সিঙাড়া মুখে তুললো। কিন্তু তাঁর পার্শ্বচরদের এই বীভৎস নির্লজ্জতায় মন উঠলো গুমোট করে'। এদের সঙ্গেই তিনি দিন কাটান, তিনি—সিতিকণ্ঠ গাঙ্গুলি—যাঁর প্রতি এই তাদের সম্মানের নমুনা। করে খেলো রসিকতা—যেন তারা তাঁর সব সমান, পাশাপাশি থাকে বলে'ই যেন তারা তাঁকে কতো চিনে ফেলেছে। মানুষকে বাঁচবার জন্যে খেতে হয়, তাই এই খাওয়ার দিক থেকে সমান বলে' যেন তাঁর সঙ্গে তাদের আর কোনো দিকে তফাত নেই। তাদের ব্যবহারে এই উদ্ধত অবহেলার ভাবটা রথীকে সর্বাঙ্গে যেন দংশন করতে লাগলো। জনতার মধ্যে নেমে এসে তিনি তাঁর আভিজাত্য খোয়াতে বসেছেন। তাঁর উদারতার সুবিধে পেয়ে সবাই তাঁকে অনায়াসে এই বন্ধুপ্রীতির ছদ্মবেশে অপমান করতে পারছে।

রথী বিমর্ষ হ'য়ে বললে,—আপনার না পেটে কি-একটা ব্যথা বলছিলেন, এতোগুলি বাজারের জিনিস খাওয়া কি আপনার ঠিক হ'বে?

খাদ্যাংশগুলি সবলে গলাধঃকরণ করে' অখিল বললে,—পেটে ব্যথা আমাদের এই মেস-এর রান্না খেয়ে মশাই, বাজারের খাবার খেয়ে নয়।

—হ্যাঁ বাবা, ব্যোমকেশ চিবোতে-চিবোতে অথচ জিভ দিয়ে মুখবিবরের খাদ্যাংশগুলি সযত্নে সামলে রেখে বললে,—মাঝে-মাঝে এমন এক-আধ থালা পেলে পেঠের ব্যথা কোন্‌দিন ছেড়ে যেতো।

তারক ধারে-কাছেই ছিলো, ফের একটা ডাক পড়তেই এঁটো বাসনগুলো নিয়ে যেতে সে ঘরে ঢুকলো। ফিরতি পয়সাটা তখন থেকে সিতিকণ্ঠের পকেটেই মজুত ছিলো, এখন, তারকের সামনে,

যেন খানিকটা রথীকে শুনিয়ে সে স্বগত হিসেব করতে লাগলো: সিঙাড়া সাড়ে পাঁচআনা, জিলিপি তিন আনা, আর পানে-সিগ্‌রেটে চোদ্দ পয়সা—মোট বারো আনা হয়েছে। ফিরেছে চার আনা, কেমন? এই বলে' হঠাৎ সে পকেট থেকে একটা সিকি বা'র করে' হাতের প্রসারিত উদারতায় তারকের দিকে ছুঁড়ে দিলো: নে, অনেক খেটেছিস, চার আনা বক্‌শিশ নে গে।

খুসিতে বিহ্বল তারক একটি টুঁ শব্দ পর্যন্ত করলো না খাবারের থালা নিয়ে সিকিটা ট্যাঁকে গুঁজতে-গুঁজতে সে বেরিয়ে গেলো।

ঘরে এখন রথী আর সিতিকণ্ঠ। অখিলরা চান করতে নিচে নেমে গেছে।

কথায় একটা ক্ষিপ্রতার টান এনে সিতিকণ্ঠ বললে,—সমস্ত দুপুর খেটে আমাকে আজ এই গল্পটা যে করে'ই হোক শেষ করতে হ'বে। বিকেলে টাকা নিয়ে আসবে বলেছে—টাকার ক'দিন কী যে টানাটানি যাচ্ছে রথী,—গল্পটা লিখে না ফেললেই নয়।

—হ্যাঁ, আমি এখন উঠবো, রথী তবু একটু গাঁইগুঁই করতে লাগলো: আপনার সঙ্গে আরেকটু কথা ছিলো।

—সেই তোমার ওখানে গিয়ে একসঙ্গে থাকবার কথা তো? সে তো আমি একরকম যাবোই বলে' দিলাম। তবে কিনা—

—সে তো যাবেনই, একশোবার। রথী চাদরের তলা থেকে কাগজের প্যাকেটটা এবার বা'র করলে: আমার সেই উপন্যাসখানা নিয়ে এসেছি।

—নিয়ে এসেছ? দাও, দাও, এতোক্ষণ বলতে হয় সে-কথা? সিতিকণ্ঠ দুই ক্ষিপ্র, লোলুপ হাতে মোড়কটা খুলে ফেললো—চোখে জ্বলছে যেন এক প্রখর, হিংস্র পিপাসা: বা, চমৎকার একেবারে একটা গোটা, আস্ত উপন্যাস! আর কী ভাবনা? কী সুন্দর হাতের লেখা ভাই তোমার! অনেক ধরে'-ধরে' লিখেছ মনে

হচ্ছে। চোদ্দ-পনেরো ফর্মা হ'য়ে যাবে—ফেলে-ছড়িয়ে। ছ' টাকার বই। প্রকাণ্ড বই। আর তোমাকে পায় কে!

সর্বাঙ্গে অসহ্য শিহরণ নিয়ে রথী বললে,—নাম-নেই, নতুন লেখককে কতো টাকা দিতে পারে মনে করেন?

—তার জন্যে তোমার কিছু ভাবনা নেই! আমি যখন এর মধ্যে আছি, তখন নিশ্চয়ই একটা ভদ্র দাম পাওয়া যাবে। তুমি এক কাজ করো দিকি। সিতিকণ্ঠ উঠে দাঁড়ালো।

কি কাজ বুঝবার জন্যে অপেক্ষা না করে' রথী গদ্গদ হ'য়ে বললে,—টাকার জন্যে আমি বিশেষ ব্যস্ত নই, সিতিকণ্ঠ-দা। বইটা কোনো পাব্‌লিশার যদি নেয়, তা হ'লেই আমি খুসি। বইটা কেউ নেবে বলে' আপনার ভরসা হয়?

—নেবে না মানে? আমি বললে আবার নেবে না! সিতিকণ্ঠ তার মুখভঙ্গিতে স্পর্ধিত দীপ্তি এনে বললে,—আমাকে চটায় এমন বুকের পাটা ক'টা পাব্‌লিশারের আছে শুনি বাংলা-দেশে? হ্যাঁ, গলা সে হঠাৎ আবার নরম করে' আনলো: নতুন যখন কেউ লেখে, তখন টাকার কথা কেউ বড়ো-একটা ভাবে না, বই ছাপা হ'বে এই তখন মনে হয় পরম পুরস্কার। পলাতক স্বপ্ন সব অক্ষরের আকারে অবিনশ্বর হ'য়ে থাকবে—এই পরিতৃপ্তির কাছে সামান্য একটা অর্থের মূল্য কী তখন তুচ্ছ মনে হয়! আমার প্রথম উপন্যাস, উঃ, সে তোমাকে কী বলবো রথী, এক পাব্‌লিশারের কাছে বিনি-দামে তার স্বত্ব বিক্রি করে' দিয়ে এলাম। বই ছাপা হ'বে, সেই তখন ভীষণ সুখ—পৃথিবীতে এর চেয়ে যে আর-কিছু সুখ বা প্রয়োজন আছে সে-কথা সেদিন আমি না-খেতে পেয়ে মরে' গেলেও বিশ্বাস করতে পারতাম না। ঠকে' গেলাম, ক্লিন্ ঠকে' গেলাম—সেই বইর আজ তিন-তিনটে এডিশান! সিতিকণ্ঠ একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়লে: তা, আমাকে কেউ তখন দেখিয়ে দেবার ছিলো না বলে'ই না-হয় ঠকেছিলাম, কিন্তু তাই বলে', তাই বলে' তোমাকে

তো ঠকতে দিতে পারি না। ভাগ্যক্রমে আমাকে তুমি পেয়ে গেছ। নতুন লোক, তুমি ওদের খপ্পরে গিয়ে পড়লে আর রক্ষে ছিলো না। সিতিকণ্ঠ তার এক্‌সারসাইজ খাতা থেকে সাদা একটা পৃষ্ঠা ছিঁড়ে আনলো: আমি আজই বিকেলে এই বই নিয়ে বেরুবো, আজই এর একটা ব্যবস্থা করে' ফেলবো দেখো।

রথী অভিভূত, কুণ্ঠিত হ'য়ে বললে,—তার আগে আপনি একবার পড়ে' দেখুন, বইটা সত্যিই ছাপবার যোগ্য হয়েছে কি না।

—পড়ে' দেখবো বৈ কি, একেবারে ছাপা হ'লেই পড়ে' দেখবো। সিতিকণ্ঠ চাপা গলায় হেসে উঠলো: বাংলা-দেশে উপন্যাস কোনোদিন ছাপার অযোগ্য হয় এ তুমি কোথাও দেখেছ? কেউ উপন্যাস লিখেছে অথচ তা ছাপা হচ্ছে না—এমন অসম্ভব, আশ্চর্য কথা শুনেছ কখনো? সিতিকণ্ঠ ধীরে আঙুল চালিয়ে পৃষ্ঠাগুলি উলটে যেতে লাগলো, হঠাৎ একটা পৃষ্ঠায় চোখের দৃষ্টি তার থমকে দাঁড়ালো: তুমি যে একেবারে টাইটেলপেজ, উৎসর্গ-পত্র সব সাজিয়ে এনেছ দেখছি। একেবারে কমপ্লিট্, নিখুঁত। সিতিকণ্ঠর সেই দৃষ্টি একটু-একটু করে' কৌতূহলে আবিল, ঘোলাটে হ'য়ে উঠলো: যাকে উৎসর্গ করেছ, এই মাধুরী দেবীটি কে?

লজ্জায় রথী একেবারে বিমর্ষ হ'য়ে পড়লো: মধুর অবসাদে সমস্ত শরীর এলো নিস্তেজ হ'য়ে।

—বলো না, আমাকে বলতে তোমার বাধা কী? আমি তো তোমার পর নই। বেশ নামটি—মাধুরী। তুমি এখনো বিয়ে করো নি নিশ্চয়ই, আর, বউকে কোন্ হতভাগাই বা বই ডেডিকেট করে? বলো না, আমি তো আর কাউকে বলতে যাবো না ঢাক পিটিয়ে?

লজ্জায় ভেঙে-চুরে, ম্লান, ম্রিয়মাণ গলায় রথী বললে,—আছে।

—বুঝেছি হে বুঝেছি। এই যে খুলে কিছু বললে না, তাতেই অনেকখানি বলা হ'য়ে গেলো। সিতিকণ্ঠর গলা সহানুভূতিতে

গাঢ় হ'য়ে এলো: হ্যাঁ, এই তো বয়েস, আমাদের জীবনেও সেই বয়স একবার এসেছিলো। প্রেম ছাড়া সাহিত্য প্রেরণা পাবে কোথা থেকে? কিন্তু ঐ ডেডিকেশান পর্যন্তই। তোমার মাধুরী দেবীকে চিনি না, কিন্তু আমার সে-সব দিনের কথা, থাক, সিতিকণ্ঠ বুক-ভাঙা, বিপুল একটা নিশ্বাস ফেললো: তোমার এই সুখের সময় সেই সব দুঃখের কথা মনে করিয়ে দিয়ে লাভ কী। তোমার এই ইনি এখনো—কী বলে—বুঝলে না—এখনো আছেন তো?

চোখ নামিয়ে, দুর্বল ঠোঁটে একটু হেসে, অস্পষ্ট গলায় রথী বললে,—আছেন।

—যাক, বাঁচা গেলো। বইর নাম দিয়েছ 'ভাঙা আয়না,' তাই ভারি অস্বস্তি হচ্ছিলো। আয়না যতোদিন অটুট থাকে, ততোদিন মনের সুখে মুখ দেখে নাও। তারপর বিয়েই করো, বা বিরহই করো—সবাই তারা ভাঙা আয়নার সামিল। যাক্, সাদা কাগজের টুকরোটা রথীর দিকে এগিয়ে দিয়ে সিতিকণ্ঠ বললে,—লেখ।

শূন্য চোখে তার মুখের দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে থেকে রথী জিগগেস করলে: কী লিখবো?

সিতিকণ্ঠ তক্তপোশের উপর গ্যাঁট হ'য়ে বসলো; স্বচ্ছন্দ, দরাজ গলায় বললে,—তোমাকে তো কোনো পাব্লিশার চেনে না, তাই আমাকে যে তুমি এই বই ছাপতে একটা অথরিটি দিচ্ছ তা লিখে না দিলে চলবে কেন? লোকে তোমার বই আমার থেকে তবে কোন্ সাহসে নিতে যাবে?

—হ্যাঁ, রথী বুক-পকেট থেকে তার নীলের উপর সিপিয়ার ঢেউ-তোলা ঝক্‌ঝকে ফাউন্টেন-পেনটি বা'র করলে; বললে,—কী লিখতে হ'বে?

—লেখ। সিতিকণ্ঠও সঙ্গে-সঙ্গে কাগজের উপর ঝুঁকে পড়লো: Business is business. হ্যাঁ, লেখ: আমার 'ভাঙা

আয়না'-নামক বাংলা উপন্যাসের গ্রন্থস্বত্ব শ্রীযুক্ত সিতিকণ্ঠ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে দান করিলাম।

রথী একমুহূর্ত হয়তো-বা দ্বিধা করলো, এবং সেই দুর্বল, দোদুল্যমান মুহূর্তে সিতিকণ্ঠর মুখে বিজ্ঞ ও বিদ্রূপে ঈষৎ ধারালো একটি সঙ্কেত উঠলো কুটিল হ'য়ে। লজ্জায় রথী মুষড়ে পড়লো, সিতিকণ্ঠ বললে,—ও-রকম ভাবে লিখে না দিলে তারা আমার থেকে বই নেবে কেন? আর তোমাকে যখন কেউ চেনে না, তখন আমাকে বইর উপর লোকদেখানো একটা বিস্তৃত অধিকার না দিয়েই বা উপায় কী! ও-শুধু কাজ হাঁসিল করার একটা ফন্দি, নইলে আমি কোনো উপন্যাসের কপি-রাইট বেচে দেবো নাকি ভেবেছ? বেচবো ফার্স্ট্ এডিশান, মোটা টাকাটা এক হপ্তার মধ্যেই তোমার হাতে এসে যাবে।

নিরুচ্চার ধন্যবাদের আভা রথীর সমস্ত মুখে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে পড়লো। নিটোল, পরিচ্ছন্ন অক্ষরে সিতিকণ্ঠের অভিপ্রায় সে পালন করলে। গলার স্বরে উপচে পড়ছে তার গভীর কৃতজ্ঞতা: আমার জন্যে এতো আপনাকে কষ্ট করতে হ'বে—আপনার এতো কাজের মধ্যে—

—কষ্ট! তুমি বলো কী, রথী? সিতিকণ্ঠ নিরাসক্ত হাতে কাগজের টুকরোটা ভাঁজ করে' পকেটে রাখলো: একজন নতুন সাহিত্যিককে জায়গা করে' দেবো সে তো আমার কর্তব্য, সেই তো আমার কাজ। আমি নিজে সাহিত্যিক হ'য়ে জানি না নতুন লেখকদের সইতে হয় কতো লাঞ্ছনা, কতো তাচ্ছিল্য? আমরা যদি আমাদের দুঃখ না বুঝি, তবে তুমি, হ্যাঁ, বলো, তুমি তবে এতো লোক থাকতে আমার কাছেই বা আসবে কেন? আমার কী! সিতিকণ্ঠ গলা ছেড়ে হেসে উঠলো: টাকা পেলে আমাকে না-হয় একদিন পেট পুরে খাইয়ে দিয়ো। ভরা পেটে ঢেঁকুর তুলতে পারলেই আমি খুসি।

কলমের মুখে রথী ক্লিপ পরাতে যাচ্ছিলো, হঠাৎ তার হাত থেকে কলমটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে সিতিকণ্ঠ বললে,—দেখি, দেখি তোমার পেনটা। চমৎকার তো! খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে কলমটার আদ্যোপান্ত সে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো, বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের নোখের উপর নিবের কয়েকটা আঁচড় টানতে-টানতে বললে,—তাই! তাই তোমার হাতের লেখা এতো পরিষ্কার—একেবারে ছবির মতো। তাই তুমি এতো তাড়াতাড়ি অনর্গল লিখে যেতে পারো। সত্যি, ফাউন্টেন-পেন না হ'লে লেখা একটা বিড়ম্বনা। এমনি-কলম দিয়ে লেখার চেয়ে ঘানি ঘুরিয়েও বেশি সুখ।

আর্দ্র, বিষণ্ণ গলায় রথী জিগগেস করলে : আপনার পেন নেই?

—আছে একটা, সেটাকে অনায়াসে একটা কোদাল বলতে পারো। নিবটা একটা কুমীরের মতো হাঁ করে' আছে। তা দিয়ে তুরপুনের কাজ হ'তে পারে, তা দিয়ে মাটি কোপানোও হয়তো সম্ভব, কিন্তু তা দিয়ে ভদ্র ভাষায় লেখা চলে না। গুঁতিয়ে-গুঁতিয়ে লেখার চাইতে তা দিয়ে একেক সময়ে নিজেকে স্ট্যাব করতে ইচ্ছে হয়। যুদ্ধ করতে এসেছি, অথচ হাতে নেই অস্ত্র, চীনেদের মতো সম্বল শুধু একটা খন্তা। হাসতে গিয়ে সিতিকণ্ঠ তার মুখ মলিন, বিমর্ষ করে' তুললো : বিকেলের মধ্যে গল্প তৈরি করে' দেবার কথা, অথচ কলমের কথা ভাবতে গেলে রীতিমতো আমার কান্না পাচ্ছে, রথী। তোমার এটার কতো দাম পড়েছে?

ঠিক তাঁকে অপমান করা হ'বে কিনা স্পষ্ট বুঝতে না পেরে অত্যন্ত কুণ্ঠিত, কাতর গলায় রথী বললে,—আপনি এটা নেবেন?

—তা কি করে' হয়? তুমি তবে কি দিয়ে লিখবে?

—আমি তো ভারি লিখি। রথী সঙ্কোচে কুঁকড়ে গেলো : তার জন্যে আপনি ভাববেন না। আমার আরো একটা আছে।

চোখ কপালে তুলে সিতিকণ্ঠ বললে,—দু' দু'টো কলম!

—হ্যাঁ, আপনি ওটা নিন। রথী উঠে দাঁড়ালো : আজকে আমাদের বন্ধুতার মেমেণ্টো হিসেবে ওটা আপনাকে আমি না-হয় দিলামই, সিতিকণ্ঠ-দা। আমি তবে এখন যাই। আপনার অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করে' দিয়ে গেলাম—এতোক্ষণে গল্প আপনার কতোদূর এগিয়ে যেতো।

পেনটা বুক-পকেটে যেন প্রায় নিজেরো অজ্ঞাতসারে চালান দিয়ে সিতিকণ্ঠও উঠে দাঁড়ালো। মুখে খুসির সামান্য এক বিন্দু আভাসও সে ফুটতে দিলো না। তেমনি নির্লিপ্ত, প্রশান্ত গলায় বললে,—চললে এখুনি? দাঁড়াও, একটা সিগ্রেট ধরিয়ে নাও। সেই কাঁচির প্যাকেটটা থেকে একটি সিগ্রেট বা'র করে' সিতিকণ্ঠ তার হাতে দিলো।

সিগ্রেটের ডগাটা নোখের উপর ঠুকতে-ঠুকতে রথী বললে,—তা হ'লে কবে যাচ্ছেন আমার বাসায়?

—এমনি বেড়াতে? সিতিকণ্ঠ স্মিতমুখে বললে,—যে কোনোদিন।

—বেড়াতে কী বলছেন? আমার বাসায় থাকতে।

সিতিকণ্ঠের মুখের হাসি আরো গভীর হ'য়ে উঠলো : তুমি আমাকে ছাড়বে না দেখছি! দাঁড়াও, দু'টো দিন ভেবে দেখি।

—এতে ভেবে দেখবার কিছু নেই। আমি একদিন জোর করে' আপনাকে তুলে নিয়ে যাবো। আর কোনো ওজর শুনবো না। রথী দরজার দিকে এগিয়ে গেলো : আচ্ছা, আমি এখন আসি। সকালটা আজ চমৎকার কাট্‌লো, যদিও আপনার অনেক সময় নষ্ট করে' দিলাম।

সিঁড়ি দিয়ে ত'ার জুতোর শব্দ নিচে মিলিয়ে গেলে সিতিকণ্ঠ নিশ্চিন্ত গলায় ডাকলে : তারক! তারক!

তারক এসে হাজির!

সিতিকণ্ঠ বললে,—তোর কাছে আমি সেদিন আট আনা পয়সা ধার করেছিলাম না, তার চার আনা কিন্তু শোধ হ'য়ে গেলো।

তারক হতভম্বের মতো বললে,—কখন ?

—ঐ যে তখন তোকে একটা জ্বলজ্যান্ত সিকি ছুঁড়ে দিলাম।

—ও তো বাবু বকশিশ !

—বকশিশ ? ব্যাটা, চার আনা তোর বকশিশ ? সিতিকণ্ঠ দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো : দু'পা হেঁটে খাবার কিনে এনে দিয়েছেন, চার আনা তাই বকশিশ ? আহ্লাদ যে তোর ধরে না দেখছি। যা, আর চার আনা মোটে পাবি। আরেক সময় সুবিধে করে' দিয়ে দেবো 'খন। যা, পালা এখন, বেরো।

সিতিকণ্ঠ নতুন কলম নিয়ে লেখায় হাত দিলো।

তিন

রথী তার ঘর-দোর নিয়ে মত্ত হ'য়ে উঠলো—ধুলো-বালি মেখে একদিনেই সে সব গোছগাছ করে' ফেললে। নিজে উঠে এলো সে ভিতরের ছোট ঘরটায়; রাস্তার দিকের খোলা, বড়ো ঘরখানা রাখলো সে সিতিকণ্ঠের জন্যে। অনাবশ্যক আসবাবের বোঝা তার ছোট ঘরে উঠলো জমা হ'য়ে; তা উঠুক, সিতিকণ্ঠের জন্যে থাক অনেকখানি জায়গা, অনেকখানি অবকাশ। ছোট ঘরে ফ্যানের পয়েণ্ট নেই, তাতে বিশেষ কিছু তার এসে যাবে না। সে এমন আর-কী লেখে যার জন্যে তার আবার আরেক প্রস্ত টেব্‌ল-চেয়ার লাগবে—ও-ত্নটো আপাততো সিতিকণ্ঠের জন্যেই থাক। ও-ঘরে খাটটা সরাতে হ'বে না আরো কিছু, মেঝের উপর ঢালা বিছানায় সে দিব্যি শুতে পারবে। এখানে এসে সিতিকণ্ঠের কোনো অস্থবিধে না হয়, তাঁর লেখায় না পড়ে একতিল বাধা, রথীকে তীব্র চোখে এখন থেকে সব সময় সতর্ক হ'য়ে থাকতে হ'বে। শেষকালে এ-অভিযোগ যেন তিনি না করতে পারেন যে এখানে এসে তাঁর লেখার পরিমাণ এসেছে কমে', বা তাঁর কোয়ালিটি আসছে খেলো হ'য়ে। বা, ভালো ঘুম হচ্ছে না, বা পেটের সেই ব্যাথাটা ফের মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। তাঁকে সে যে-বিশ্রী, বিমর্ষ আবহাওয়ায় দেখে এসেছে তার চেয়ে তাঁর স্থষ্টির পরিপার্শ্বটা সে পরিচ্ছন্নতরো করে' তুলবে—যতোদূর তা'র সাধ্য।

—না, না, ইজিচেয়ারটা সরাতে হ'বে না, অর্জুন। রথী ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো: এটাও এ-ঘরে ওঁরই জন্যে থাকবে। কখনো গা-হাত-পা ছড়িয়ে জিরোতে হ'লে তিনি কী করবেন?

অর্জুন তার চার বছরের পুরানো চাকর। সে অসন্তুষ্ট হ'য়ে

বললে,—সবই যদি ওনার জন্যে এ-ঘরে থাকে, তবে আপনার জন্যে থাকবে কী ?

রথী শিশুর মতো অনর্গল হেসে উঠলো। গাঢ় গলায় বললে,—কতো বড়ো মহামান্য অতিথি আমার ঘরে আসছেন তুই তার কী জানবি, বোকা ? সামান্য এক পৃষ্ঠা বর্ণ-পরিচয়ও তো কোনোদিন পড়লি না। নে, ট্রাঙ্ক-ফ্রাঙ্কগুলি সব সরিয়ে রাখ আমার ঘরে। বাড়িওলাকে বলে' এ-ঘরটার একবার কলি ফিরিয়ে নিলে মন্দ হয় না। কী বল্ ?

অর্জুন বল্‌লে,—শুধু এ-ঘরটায় ?

—তুই তার কী বুঝবি হাঁদারাম ? এককালে, তখন তুই আর আমি কেউই হয়তো বেঁচে থাকবো না, দেখিস এই বাড়িটার কী ভীষণ দাম বেড়ে যায়। এই বাড়িতে সিতিকণ্ঠ গাঙ্গুলি একদিন বসবাস করেছিলেন, এই তখন হ'বে একটা সমস্ত দেশের সম্পত্তি। তুই গর্ধব, এর বুঝবি কী ? বাড়িওলাকে আমিই বলে' দেবো—যা লাগবে নিজেরই ট্যাঁক থেকে না-হয় যাবে। তাই বলে' এই চুন-বালি-খসা ছ্যাতা-ধরা ঘরে তো তার জায়গা হ'তে পারে না !

অর্জুন খানিকক্ষণ হাঁ করে রইলো, তবু, সবটা না বুঝে সে ছাড়বে নাঃ তখন আমি আর আপনি মরে' যাবো, আর আপনার ঐ—কী বল্‌লেন ছিরিখণ্ড না সীতাকুণ্ডু মশাই বেঁচে থাকবেন ?

জ্ঞানীর মতো, অল্প একটু হেসে রথী বল্‌লে,—তাঁর কি কোনো-দিন মরণ আছে রে ?

—বলেন কী ? অর্জুন ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠলোঃ কোনো সাধুবাবা বুঝি ?

যা-যা, তোকে কিছু বুঝতে হ'বে না। তোকে যা বলি, তাই এখন কর্ দিকি বাপু। রথী হুকুম করতে লাগলোঃ বাল্‌তি করে' জল আর ফিনাইলের বোতলটা নিয়ে আয় শিগ্‌গির, ঘরটা ধুয়ে

ফ্যাল্ আগে। পরে যেমন বলবো জিনিসগুলি সাজিয়ে দিবি। আমি তারপরে বাজারে বেরুবো—টেব্‌লক্লথ, ফুলদানি—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাউকে বলে' রোজ সকালে ফুল যোগাবার বন্দোবস্ত করতে পারবি তো? আচ্ছা, সে হ'বে 'খন, তুই আগে তোর এদিককার কাজ শেষ কর্ দিকি।

ছ'তিন দিন ধরে' মনের মতো ফিট্‌ফাট্, গোছগাছ করে' রথী আবার গেলো সিতিকণ্ঠকে অনুরোধ করতে।

—চলুন, আর আপত্তি শুনছি না আমি। ঘর-দোর আমি সব গুছিয়ে রেখেছি আপনার জন্যে।

—আমার জন্যে আবার ঘর-দোর গুছিয়ে রাখা! সিতিকণ্ঠ উদাসীন, প্রশান্ত মুখে হেসে উঠলো: আমাদের কি ঘর আছে না দুয়ার আছে? আমরা আছি ঝোড়ো আকাশের নিচে।

—না, আপনি চলুন। রথীর কণ্ঠস্বরে মিনতি ঝরতে লাগ্‌লো: সেখানে যাতে আপনার কোনো অসুবিধে না হয় আমি প্রাণপণে তার চেষ্টা করবো, সিতিকণ্ঠ-দা।

কণ্ঠস্বরের স্নিগ্ধতায় সিতিকণ্ঠ রথীর সন্নিহিত হ'য়ে এলো: আমার না-হয় কিছু হ'বে না, কিন্তু তোমার যে বিস্তর অসুবিধে হ'বে, রথী।

—আমার? প্রবল প্রতিবাদের ভঙ্গিতে রথী উঠলো উদ্দীপ্ত হ'য়ে: আপনি পাগল হয়েছেন, সিতিকণ্ঠ-দা? আপনি আমার ওখানে থাকবেন, আর আমার হবে অ সু বি ধে? কী যে বলেন।

সমবেদনার কুয়াশায় সিতিকণ্ঠের দুই চোখ ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠলো, করুণ করে' বল্‌লে,—আমার জন্যে মিছিমিছি তোমার কতোগুলি খরচ হ'বে বই তো নয়। তাতে তোমার লাভ কী?

—খরচ হ'বে, খরচ হ'বে কিসে? রথী ঝিলিক দিয়ে উঠলো: বাড়ি-ভাড়াটা তো আমি আগেও দিতাম, এখনো দেবো। খরচ কোথায়?

—আর অপাঙ্গে একবার রথীর মুখের দিকে চেয়ে সিতিকণ্ঠ বল্‌লে,—খাওয়ার খরচটা তো দু'জনেই ভাগাভাগি করে' চালিয়ে দেবো। আমারই বরং লাভ হ'লো, কী বলো রথী? সিট্-রেণ্ট লাগবে না, যা কেবল ঐ খাওয়ার খরচটাই দিতে হ'বে। তাই না?

রথী খানিক আম্‌তা-আম্‌তা করে'ও সিতিকণ্ঠর প্রত্যাশিত উত্তরে এসে পৌঁছুলো না; ক্লান্তমুখে বল্‌লে,—তা দু'জনে খেতে গেলে খরচ আমাদের কিছু কমই পড়বে। তা ছাড়া ঠাকুর-চাকরের মাইনে আগে যা দিতাম এখনো তাই দেবো। আমার খরচ বাড়বে কিসে?

—না, সব দিক দিয়ে এ একরকম ভালোই হ'লো দেখছি। সিতিকণ্ঠ একটা হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙলো: কারুরই খরচের কোনো বাড়া-কমা নেই, মাঝখান থেকে আমিই পেয়ে যাবো ভালো একটা ঘর।

—আর আমিই যেন কিছু পাবো না! আপনি চলুন।

ঠোঁটের একটা কোণ কুঁচ্‌কে সিতিকণ্ঠ বল্‌লে,—এক জায়গা থেকে শেকড় গুটিয়ে যাওয়া কি এতোই সহজ, রথী?

—কেন, কঠিনটা কোন্ জায়গায়? আপনার কোথায় কী জিনিস-পত্র আছে বলুন, আমি নিজেই সব বেঁধে ফেলছি। রথী সর্বাঙ্গে চঞ্চল হ'য়ে উঠলো: তারপর আন্‌ছি একটা গাড়ি ডেকে। কী এমন একেবারে একটা পাহাড় ডিঙোতে হ'বে!

—সবই হ'লো, বাড়িও ঠিক গাড়িও তৈরি, কিন্তু মুখের কথা বল্‌লেই কি আর যাওয়া যায়?

—কেনই বা যে যাবে না আমি তো তা বুঝতে পাচ্ছি না, সিতিকণ্ঠ-দা। আপনি খুলে বলুন, রথী পীড়াপীড়ি করতে লাগলো: আমার কাছে আপনার সঙ্কোচ কিসের?

—বুঝতে যখন পাচ্ছই না, তখন সঙ্কোচ করে' আর লাভ কী? সিতিকণ্ঠের মুখে হাসির কতোগুলি দুর্বল, ভীরু রেখা ফুটে উঠলো:

এখান থেকে যে যাবো, এখানকার সব পাওনা-পত্র চুকিয়ে যেতে হ'বে না? এক্ষুনি তা কী করে হয়? হাতে আমার একটা আধলাও নেই।

—ও! এই কথা? এরি জন্যে আপনি ভেবে সারা হচ্ছেন? আমি ভাবছিলাম কী-একটা ভয়ঙ্কর কথা হ'বে না-জানি। তা, রথী তার বুক-পকেটে হাত দিলো: কতো আপনার লাগবে?

—এই, সব মিলিয়ে গোটা তিরিশ হ'লেই আপাততো চলে মনে হচ্ছে। কিছু আবার ছোটখাটো ধারধুর আছে কিনা।

নোটের ভাঁজ থেকে একেক করে' তিনখানি তার হাতে দিয়ে রথী বল্‌লে,—আপনি এর জন্যে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করবেন না, সিতিকণ্ঠ-দা, যখন আপনার সুবিধে হ'বে, দিয়ে দেবেন।

—তা না-হয় দেবো, সিতিকণ্ঠ গদ্‌গদ গলায় বললে,—কিন্তু ভাবছি তুমি আজ আমার কতো বড়ো উপকার কর্‌লে, রথী। উঃ, একেই বলে বন্ধু, শুধু টাকা দিয়ে কি এর শোধ হয় কখনো? তা, দিন কয়েক পরে দিলে তোমার চলবে তো?

—না, না, তার জন্যে আমার বিশেষ তাড়া নেই। আপনি তৈরি হ'ন, আমি একটা গাড়ি নিয়ে আসছি।

—হ্যাঁ, চাকরটা এখন হয়তো বাবুদের জল-খাবারের তদারক করছে—তার হাত জোড়া। তা, গাড়ি তুমি ঐ মোড়ের মাথায়ই পেয়ে যাবে। তোমার অনেক কষ্ট হ'লো আর-কি। মমতায় সিতিকণ্ঠ একেবারে গলে' গেলো।

—একটা গাড়ি ধরে' আনবো, তাই কষ্ট! রথী দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো।

সিতিকণ্ঠের পিঠের উপর ঠোকর মেরে অখিল একেবারে ঢলে' পড়লো: এক কথায় তিরিশ-তিরিশটা টাকা রোজগার! কা'র মুখ দেখে আজ উঠেছিলে, চাঁদ! আর ছোঁড়াটা কিনা অমনি পকেট ফাঁক করে' দিলে!

—দেবে না মানে? সিতিকণ্ঠ চোখ নামিয়ে বল্‌লে,—ভক্ত অমনি হ'লেই হ'লো আর-কি। গুরুদক্ষিণা দিতে হ'বে না?

—তবে আর ক'খানা বেশি করে' চেয়ে নিলি না কেন? অখিল যেন কাতরাতে লাগলোঃ সন্ধের দিকে জাঁকালো-রকম একটা মাইফেল্—

—বেশি চাইতে গেলে ঘাব্‌ড়ে যেতো যে। একেবারে একটা পেরেক ঠুকতে গেলে কি চলে? ইস্ক্রুপের প্যাঁচে-প্যাঁচে আস্তে-আস্তে ঢুকতে হয়। সিতিকণ্ঠ দাঁতের ফাঁক দিয়ে হেসে উঠলো।

অখিল জিগ্‌গেস করলেঃ তা হ'লে পাওনা-দেনা মিটিয়ে একদম চলে' যাচ্ছিস্, সিতি?

—দাঁড়া, আগে দেখি, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। দিন দুই হাওয়া বদল করে' আসি না, নিদেন পক্ষে খাওয়ার মুখটা তো কিছু দিন ফিরবে। সিতিকণ্ঠ তার তালা-ভাঙা স্যুটকেস্‌টা গুছোতে বস্‌লোঃ পাওনা কতো আর হ'বে এই সাত দিনে?

—কতো আর? ঈর্ষায় অখিলের মুখের চেহারা যেন বিশীর্ণ হ'য়ে উঠলোঃ বড়ো জোর টাকা ছয়েক। আর বাকিটা একেবারে পকেটস্থ?

—তোদের তো কেবল পরের পকেটের দিকেই নজর। সিতিকণ্ঠ ঝাঁজিয়ে উঠলোঃ আমার লাভটাই কেবল দেখছিস্ আর আমার কল্যাণে ওর যে কতো বড়ো একটা পাবলিসিটি হ'বে এখন থেকে, তার একটা কোনো দাম নেই? এতো বড়ো একটা লেখক পুষে সাহিত্যসমাজে ওর একটা যা-তা বিজ্ঞাপন হ'বে নাকি ভেবেছিস? সে-বিজ্ঞাপনের জন্যে আমি চার্জ করবো না? ওকে কে চেনে, কী ওর মুরোদ? আমার কাঁধ ধরে' ও উঠবে, আর আমি কন্ধকাটার মতো দাঁড়িয়ে থাকবো?

ও-পাশে বসে' মনোরঞ্জন একটা কাঁসার বাটি করে' তার বৈকালিক চিঁড়ে-দই খাচ্ছিলো, হাত চাট্‌তে-চাট্‌তে সে বল্‌লে,—তা হ'লে ঐ টাকাটা আর শোধ দিচ্ছিস্‌ না কোনোকালে ?

—তা আমি বলেছি ?

—ছি, তা তুই কখনো বল্‌তে পারিস্‌ ?

—না-দিলেই বা তোদের কী ক্ষতিবৃদ্ধি হচ্ছে ? সিতিকণ্ঠ এবার বসলো দড়ি দিয়ে বিছানা বাঁধতে : আগের দিনে রাজসভা থেকে দেশের বড়ো-বড়ো লেখকদের বৃত্তি দেয়া হ'তো—এ তো ভক্তের অকিঞ্চিৎকর পাদ্যার্ঘ্য মাত্র। টাকা ফিরিয়ে দিয়ে তার গুণগ্রাহিতাকে অপমান করবার আমার অধিকার নেই।

—হ্যাঁ, অখিল টিপ্পনি কাটলো : তারপর ঐ টাকার জন্যে মামলা করবার যখন কোনো রাস্তা নেই।

—চুপ, সিতিকণ্ঠ সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠলো : সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজ হচ্ছে।

হাঁপাতে-হাঁপাতে রথী এসে হাজির।

—চলুন, গাড়ি-ফাড়ি ভীষণ হাঙ্গাম, একটা ট্যাক্সিই নিয়ে এলাম—সেই একেবারে চিত্রার কাছাকাছি গিয়ে। ব্যাটা দিব্যি ফ্ল্যাগ্‌ ডাউন করে' বসে' আছে। চলুন,—এই আপনার জিনিস ? মোটে এই দু'টো ?

গভীর একটা নিশ্বাস ফেলে সিতিকণ্ঠ বল্‌লে,—গরিব লেখক, কোথায় আর কী জিনিস পাবো বলো ?

—না, আমি তা বলছি না। ট্যাক্সিতে নিতে তা হ'লে আর অসুবিধে নেই। রথী নিজেই দু' হাতে মাল দু'টো তুলে নিলো : আসুন।

ট্যাক্সিতে উঠেই সিতিকণ্ঠ মুখের উপর ঘন করে' মুখোস টেনে দিলো। সমস্ত মুখে সেই নিরাসক্ত বৈরাগ্যের আভা, দুই চোখে বিহ্বল উদার প্রশান্তি, বসবার শিথিল ভঙ্গিতে কবিজনসুলভ সুন্দর

আলস্য। এমন লোকের সঙ্গে এক গাড়িতে পাশাপাশি বসে'— গাড়ির ছুলুনিতে মাঝে-মাঝে গা ঠেকে যাচ্ছে—চলেছে কিনা রথী, কোথাকার এক তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর লেখকাণু। এ-কথা সাদা চোখে কে বিশ্বাস করবে?

সিতিকণ্ঠই প্রথম কথা পাড়লো: তোমার 'ভাঙা আয়না' অনিলা-প্রেস্‌কে দিয়ে এলাম।

রথী অণু-পরমাণুতে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো: তারা ছাপবে বল্‌লে?

—বই প্রেসে চলে গেছে already। কাল-পর্শু'ই প্রুফ এসে যাবে দেখো।

হতভম্বের মতো রথী বল্‌লে,—প্রুফ তো আমি দেখতে পারি না।

—তোমার হ'য়ে সে আমিই দেখে দেবো না-হয়।

—আপনি, আপনি আমার জন্যে আবার এতো কষ্ট করবেন?

—কষ্ট? এ তো আনন্দের সঙ্গে করবো, রথী। তুমি জানো না প্রুফ দেখতে আমার কতো ভালো লাগে। বাংলা-ভাষায় আজকাল যতো বই তুমি দেখবে তার মধ্যে আমার বইই নির্ভুল, একেবারে নিষ্কলঙ্ক বলতে পারো। ইলেক, কমা, মাঝের এ-কার, পাশের এ-কার, পাশে মাত্রা-ওলা আর মাত্রা-ছাড়া মূর্ধণ্য ণ—কোথাও তুমি খুঁত পাবে না। প্রুফ দেখে-দেখে চোখ ছুটো ঝানু হ'য়ে গেছে। কম-সে-কম খান বাষট্টি বই তো লিখে ফেলেছি যা-হোক্‌,—তা-ও এই বয়সে। সেদিন তুমি না আমার কতো বয়স বলছিলে? বলে' সিতিকণ্ঠ উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো।

গলাটা বার কয়েক চুল্‌কে রথী জিগ্‌গেস করলে: ওরা টাকার কথা কিছু বল্‌লে?

সিতিকণ্ঠ যেন চম্‌কে উঠলো: কা'রা?

—ঐ কী না বল্‌লেন,—অনিলা-প্রেস্‌ না কী—যারা আমার বই ছাপছে ?

মুখ ভার করে’, রথী যেন কি-এক অশোভন আবদার করছে তারই প্রতিবাদের ভঙ্গিতে, সিতিকণ্ঠ বল্‌লে,—না, নগদ টাকা আগাম দিয়ে বই নিতে ওরা রাজি নয়। বই ছাপা হ’বার পর খরচ-খরচা উঠে গেলে তবে একটা পার্সেন্টেজ্‌ দেবে বলেছে। তাই বা মন্দ কী! একদম আন্‌কোরা এক ইয়ং লেখককে কে-ই বা এতোটা সুবিধে দেয় বলো ? কতো লেখক বই বগলে করে’ ফ্যা-ফ্যা করে’ ঘুরছে, কোনো পাবলিশারই মুখ তুলে চাইছে না—সকলের দরজায়ই ‘নো ভেকেন্সি’ টাঙানো। চাকরির বাজারের মতো লেখকের বাজারো ভারি মন্দা, রথী। নৈরাশ্যে সিতিকণ্ঠের মুখ যেন ক্লিষ্ট, করুণ হ’য়ে উঠলো, সৌহার্দ্যের নিবিড়তায় আরো সন্নিহিত হ’য়ে বসে’ সে গাঢ় গলায় বল্‌লে,—তুমি নতুন লেখক, এখন থেকেই টাকার খাঁই হ’লে—

—না, না, রথী ব্যস্ত হ’য়ে বল্‌লে,—টাকার উপর আমার বিশেষ লোভ নেই। আমার প্রথম বই ছাপা হ’লেই আমি খুসি।

—হ্যাঁ, তোমার চাই এখন একটা পাশ্‌পোর্ট, সাহিত্যসমাজে তোমার একটা লেব্‌ল্‌। তারপর টাকা—টাকাই কি সাহিত্যের চরম পুরস্কার ভেবেছ নাকি ?

—না, না, তা আমি কোনোদিন বলেছি ? রথী লজ্জায় ও সঙ্কোচে একেবারে ঘেমে উঠলো : আপনি সেদিন বলেছিলেন কিনা উপন্যাস হ’লেই কিছু পাওয়া যাবে—

—পাওয়া যাবেই তো, দু’দিন আগে আর পরে। আমি যখন এর মধ্যে আছি, তখন সেই দিক থেকে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। সিতিকণ্ঠ হঠাৎ তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গলা নামিয়ে গভীর অন্তরঙ্গতার সুরে বল্‌লে,—এখন যা হোক্‌ করে’ তোমার প্রথম বই বা’র করা নিয়েই কথা। এ-বই তুমি তোমার

কী বলে—প্রেয়সীকে ডেডিকেট্‌ করেছ, বই ছাপা হ'লে তা তুমি একদিন নিজ হাতে গিয়ে তাকে উপহার দিয়ে আসবে—সেই লগ্নটিকে কেন্দ্র করে' ভবিষ্যতে কতো স্বপ্ন, কতো আশা—তুচ্ছ ক'টা টাকার দরাদরি করে' সেই লগ্ন তুমি পিছিয়ে রাখতে চাও ?

রথী নির্বাক, নিরুচ্চার আনন্দে শরীরের সমস্ত অণুতে-পরমাণুতে ঝঙ্কৃত হ'তে লাগলো।

—এই যে, ডাইনের ঐ গলিটায় আমার বাসা।

এতোটা সিতিকণ্ঠও আশা করতে পারে নি। সে যেন এক লাফে সৌভাগ্যের চূড়ায় এসে উত্তীর্ণ হয়েছে। ঘরময় স্তূপীভূত আরাম—এখানে খাট, ওখানে টেব্‌ল, বুক-কেস্‌ আর আল্‌না, সোফা আর আলমারি—হাত বাড়ালেই টুকিটাকি দরকারি যতো জিনিস। সিতিকণ্ঠ এ-ঘর ও-ঘর করে' খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সব দেখতে লাগলো। এ-পাশে, তার ঘর ছুঁয়ে লম্বা-চওড়ায় প্রকাণ্ড একটা বারান্দা, লাগোয়া একটা বাথরুম। রথী যে-ঘরে এখন উঠে গেছে তার তুলনায় সিতিকণ্ঠ বসেছে এসে সিংহাসনে। নিজের ঘরটা কিছুই সে এখনো গুছিয়ে উঠতে পারে নি। সিতিকণ্ঠকে জায়গা ছেড়ে দিতে গিয়ে নিজেই যেন সে সঙ্কীর্ণ, সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠেছে। চারদিক থেকে উপচে পড়ছে তার অন্তরের প্রচুরতা। সমারোহের ঘটায় নিজের ঐশ্বর্যকে প্রচার করবার স্পর্ধা নেই, শুধু সিতিকণ্ঠের প্রতি তার ভক্তিবিগলিত অনুরাগের আধিক্য। সর্বত্র তার মানসিক ভাবাকুলতার একটা রঙিন, মদির আবহাওয়া। তার দিকে চেয়ে সিতিকণ্ঠ এ-কথা কিছুতেই ভুলতে পারে না যে সে নতুন লিখছে, সে প্রথম পড়েছে প্রেমে। হ্যাঁ, কিছু ভয় নেই, বয়সটাকে সে খুব ভালো করে'ই চেনে।

সিতিকণ্ঠ একটুখানি থিতিয়ে বসতেই রথী বল্‌লে,—এখানে এসে লেখা আপনার খোলে, তা হ'লেই হয়।

সাবলীল গলায় সিতিকণ্ঠ তখুনি সুর মেলালো : চারদিকে

এই ফাঁকা, নীরব নির্জনতা, মনের সুখে কলম চালাতে পারবো। ও-সব মেসে-টেসে কি আমাদের পোষায়? সমস্তক্ষণ চলেছে একটা তর্কের ঘূর্ণি, থেকে-থেকে ভাব যায় ঘুলিয়ে, কথার খেই হারিয়ে ফেলি। একটা করছে আফিসের বড়ো-সাহেবের মুণ্ডপাত, একটা করছে ভারত-উদ্ধার,—তার মধ্যে চুপ ক'রে ব'সে কেউ দু'লাইন গল্প লিখতে পারে? Dungeon, Dungeon! একেই বলে অসত্য থেকে সত্যে চ'লে আসা, মৃত্যু থেকে অমৃতে! সিতিকণ্ঠ প্রবল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেঃ কিন্তু একটা কথা ভাবছি রথী, আমার এতো সুখ-সুবিধে করতে গিয়ে তোমার নিজের না শেষে কষ্ট হয়। হ'লে কিন্তু ভাই, আমাকে স্পষ্ট করে বলবে—আমার কাছে কিন্তু কিছু সংকোচ খাটবে না।

লজ্জায় গ'লে গিয়ে রথী বল্‌লে,—আপনি কী যে বলেন।

—বামনের হাতে চাঁদ পড়লে আকাশ যে কানা হ'য়ে যেতে পারে, রথী। চিরকাল দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে প্রাণপণে যুঝতে হয়েছে—এবার এই আরামের মধ্যে প'ড়ে না গা ঢেলে দিই—শেষকালে নিজেই না তোমার একটা বোঝা হ'য়ে উঠি, তোমাকেই আঁকড়ে থাকি চিরকাল। সারাজীবন ঠ'কে, ঘা খেয়ে-খেয়ে শেষকালে সত্যিকারের এক বন্ধুর দেখা পেয়ে আর না তোমাকে ছাড়তে চাই। সিতিকণ্ঠের প্রশান্ত, উদার দুই চক্ষু স্নেহে আর্দ্র হ'য়ে এলো।

—সে তো আমার সৌভাগ্য সিতিকণ্ঠ-দা, আমার অকিঞ্চিৎকর সাহিত্যপ্রীতির পরম পুরস্কার। কিন্তু, রথী ব্যস্ত হ'য়ে উঠলোঃ আপনার চা-টা পাঠিয়ে দিই।

অর্জুন নিয়ে এলো খাবারের প্লেট আর কাঁচের গ্লাশে ক'রে জল, পেছনে রথীর হাতে চায়ের বাটি।

অনুৎসাহিত হ'বার মতো আয়োজনের কোনো ত্রুটিই রথী রাখেনি। সিতিকণ্ঠ বল্‌লে,—তোমারটা কই?

—আমার হ'বে 'খন। আপনি আগে নিন্।

—তা কি হয়? ঘর আলাদা করে' দিয়েছ বলে' তো একেবারে পর করে' দাও নি। নিয়ে এসো, তোমার থালাটাও নিয়ে এসো।

—আমি বিকেলে অতো সব খাই না।

—আর আমি যেন খাই? সিতিকণ্ঠ মুখে জল নিয়ে কুল্‌কুচো করতে লাগলো।

চার

তারপর, হাইয়ের পর যেমন তুড়িটি, সিতিকণ্ঠের পিছনে চলেছে রথী। পেয়ালার যেমন হাতল, জুতোর যেমন সুখতলা। ঘরে-বাইরে, সভায়-সমিতিতে, হাটে-বাজারে রথী আছে সিতিকণ্ঠের সারথি হ'য়ে। কখনো এগিয়ে, কখনো পিছিয়ে। খাবারের দোকানে যেতে হ'লে রথী অগ্রগামী, সভায় যেতে হ'লে সিতিকণ্ঠ। নদীতে গাধাবোট চলতে দেখলে যেমন মনে করতে হয় জাহাজ তাকে টেনে নিয়ে চলেছে, তেমনি পেছনে রথীকে দেখলে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ভাবা যায় সামনে আছে সিতিকণ্ঠ। ধোঁয়া দেখে যেমন মনে করা যায় আগুন, তেমনি সিতিকণ্ঠকে দেখে সিদ্ধান্ত করা যায় এখুনি হ'বে রথীর অভ্যুদয়। থিয়োরেমের একটা করোলারির মতো রথী যেন সিতিকণ্ঠেরই একটা অনায়াস প্রতিপাদন। মিনিটের কাঁটার সঙ্গে সেকেণ্ডের কাঁটার মতো সে লেগেই আছে সিতিকণ্ঠের পিছনে।

সিতিকণ্ঠের হাত ধরে' সে চলে' এসেছে বৃহৎ লেখক-পরিবারের অন্তঃপুরে। নইলে কে তাকে নিয়ে আসতো এই দুর্গম পর্বতচূড়ায়? সাহিত্যিকদের যে-দেশটা তার মনের মানচিত্রে প্রায় উত্তরমেরুর কাছাকাছি ছিলো, সামান্য একটা ট্রামের টিকিট কেটে স্বচ্ছন্দে সে আজকাল তা বেড়িয়ে আসছে। যে-সব লেখকের মাত্র নামোচ্চারণে সে সর্বাঙ্গে শিহরিত হ'তো, দস্তুরমতো সে আজকাল তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা কয়, মাঝে-মাঝে পকেট থেকে তাদের সিগারেট বা'র করে' খাওয়ায়। তার আজকাল এতো প্রতিপত্তি। হাতীবাগানের বঙ্গেশ্বর কবিরাজ যে নতুন সাহিত্যবাসর খুলেছে তাতেও সে মাঝে-মাঝে গল্প পড়ে'

আসে। সমস্ত আড্ডায়, সমস্ত আখড়ায় রথীর আজকাল অবারিত দ্বার—যেখানেই গণেশ, সেখানেই মূষিকটি আছে ল্যাজ নাড়তে। তাকে সিতিকণ্ঠ দু'দিনেই জলচল করে' তুলেছে—তারপর ক'দিন বাদে তার 'ভাঙা আয়না' বেরিয়ে গেলে তো আর কথাই নেই।

তারপর তার উপর সিতিকণ্ঠ-দার সমস্ত কিছু তদারক করবার ভার। 'বনমালী এজেন্সি'তে প্রুফের তাড়া পোঁছে দিয়ে এসো, ছুটে চলেছে রথী : 'অরণ্যানী'-পত্রিকা এতোদিন ধরে' সিতিকণ্ঠের গল্পটা কেন চেপে রেখেছে, খোঁজ নিয়ে আসতে চলেছে রথী এ-সব কাজ নিখুঁত করে' নির্বাহ করতে রথী খুব ভালোবাসে—তাতে করে' সে-ও আস্তে-আস্তে সাহিত্যসমাজে পরিসর পাচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, সিতিকণ্ঠ-দার ফাউণ্টেনপেন্-এর নিব গেছে ভেঙে, তা-ও টেম্পার করে' আনবে রথী, ছাতার কাপড় বদ্‌লাতে হ'বে, রথীই চেনে সেই দোকান। এ-সব ছোটখাটো নোংরা কাজে সিতিকণ্ঠ-দার হাত দেয়া সাজে না, জুতো ছিঁড়ে গিয়ে থাকে, রথীই মুচি ডাকাবে, টুকিটাকি বাজার করতে হয়, রথীই আছে তাঁর হাতের কাছে। এই সব তুচ্ছ প্রয়োজনসাধনের ব্যাপারেই যদি তিনি মন দেবেন, তবে তিনি লিখবেন কখন?

সেদিন দুপুরে ছাতা বগলে নিয়ে সিতিকণ্ঠ বেরুবার উদ্যোগ করছিলো, রথী এলো হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে ; বল্‌লে,—ওকি, আপনি কোথায় বেরুচ্ছেন ?

সিতিকণ্ঠ জামার উপর র‍্যাপার গুছোতে-গুছোতে বল্‌লে,—একটু কাজ ছিলো ভাই।

—কী কাজ আমাকে বলুন।

—সে তুমি পারবে না।

—পারবো না মানে ? তার অক্ষমতার উপর এই আকস্মিক আক্রমণে রথী উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো : কোন্ কাজটা আপনার

না পেরেছি? আপনি বলুন, আপনি বেরুবেন কী দুপুর বেলা? বলুন কোথায় যেতে হ'বে—আমি সব সময়েই প্রস্তুত। এই সবের জন্যেই তো আপনার কথা শুনে সেদিন একটা all-section ট্রামের টিকিট কিনলাম।

—হ্যাঁ, সেই টিকিটখানা আমাকে একটুখানি দাও, আমি চট্ করে' একবার ঘুরে আসি।

—কেন, ছেলেমানুষের মতো তরল অভিমানে রথী মুখ ভার করলো: আমি গেলে আপনার কাজ হ'তো না মনে করেন?

—কিছু টাকা পাবার কথা আছে কিনা, সিতিকণ্ঠ প্রশান্ত গলায় ব্যাপারটাকে প্রাঞ্জল করে দিলো: আমি সশরীরে না গেলে পাব্লিশার হয়তো দিতেই চাইবে না।

—ঠিক দেবে। রথী জোর গলায় বল্‌লে,—আমি ঠিক আদায় করে' নিয়ে আসবো। বলুন, কে পাব্লিশার? কতো টাকা?

—কতো টাকা, সিতিকণ্ঠ গলাটাকে একবার চুলকে নিলো: কতো টাকা তাই যে এখনো পাকাপাকি কিছু কথা হয় নি। তোমাকে পাঠালে, বুঝলে না, হয়তো কিছু কম করবার চেষ্টা করবে, আমি স্বয়ং গিয়ে হাজির হ'লে যদি কিছু চক্ষুলজ্জা হয়। দু' পাঁচ টাকার জন্যে কম লাঠালাঠি করতে হয় ভাই? ও ব্যাটারা কি সাহিত্য বোঝে, বোঝে কেবল টাকা।

রথীকে অতএব সহজেই নিরস্ত করা হ'লো। এই টাকার লেন-দেনের মাঝে তাকে পাঠাতে সব সময়ই সিতিকণ্ঠের মর্মান্তিক ভয় করে।

সিতিকণ্ঠের ফিরে আসতে সেই সন্ধে।

রথী ছুটে এসে জিগ্‌গেস করলে: টাকা পেলেন?

নিষ্ঠুর বিরক্তিতে সমস্ত মুখ রেখাসঙ্কুল করে' সিতিকণ্ঠ বল্‌লে,—শালারা এক দিনে দেবে টাকা! তা হ'লেই হয়েছে। কতোদিন গিয়ে এমন সাধ্যসাধনা করতে হয় দেখ।

—দিলে না? রথী যেন একটা আর্তনাদ করে' উঠলো: কিছুই না?

—একটা সিকি পয়সাও না। খালি কথার মারপ্যাঁচ, খালি মুখমিষ্টি। টাকার বেলায়ই ব্যাটাদের টনক নড়ে। ছি ছি, এতোক্ষণ ধন্না দিয়ে পড়ে' রইলাম, সাধারণ একটা ভদ্রতাও তো মানুষের আছে! অথচ, সিতিকণ্ঠ দুঃখে মুখভাব নরম করে' আনলো: অথচ টাকাটা পেলে আমার আজ কী উপকার হ'তো বলো দিকি। তোমার সেই তিরিশটা টাকা আজো কিনা শোধ করতে পারলাম না।

—না, না, সেজন্যে আপনি ব্যস্ত হ'বেন না। লজ্জায় রথী নিষ্প্রভ হ'য়ে এলো: তাতে কী হয়েছে?

—তুমি ব্যস্ত হ'বে না বল্‌লেই তো আমি আর হাত-পা গুটিয়ে বসে' থাকতে পারি না। আমার তো একটা কর্তব্যজ্ঞান আছে। সিতিকণ্ঠের গলা সস্নেহ সমবেদনায় ভিজে উঠলো: এই যে এতো দিন ধরে' তোমার এখানে আছি, আজো পর্যন্ত একটি পয়সা তোমার হাতে ঠেকাতে পারলাম না। সিতিকণ্ঠ রথীর দিকে অপাঙ্গে একবার দৃষ্টিপাত করলে: তোমাকে কেবল ফতুর করে'ই চলেছি। না ভাই, লজ্জার একশেষ হচ্ছে, আমাকে তুমি ছুটি দাও, মিছিমিছি তোমাকে হয়রান করে' কোনো লাভ নেই।

রথী এগিয়ে এসে সিতিকণ্ঠের একখানি হাত চেপে ধরলো, বিষণ্ণ গলায় বল্‌লে,—টাকার কথা কী বলছেন সিতিকণ্ঠ-দা? আমি সাহিত্যিক হিসেবে ছোট বলে' কি মানুষ হিসেবেও এতো নেমে গেছি? টাকা আজ পাননি, না-হয় দু'দিন পরে পাবেন। তখন দিয়ে দিলেই চুকে যাবে। তার জন্যে এতো অপ্রস্তুত হবার কী হয়েছে? আমিও কি আপনার কাছে ভদ্রতা চাই, বন্ধুতা চাই না?

সিতিকণ্ঠ স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লো। রথীর হাতে উত্তপ্ত একটু

চাপ দিয়ে বল্‌লে,—হ্যাঁ মাইনে-করা চাকরি তো আর করি না যে মাসের পয়লা তারিখেই বরাদ্দ টাকা এসে পড়বে হাতে। লিখি বই, কখন কী আসবে না-আসবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। ছ' মাস আগে ঝপাস্ করে' ছ'খানা বইর জন্যে পাঁচশো টাকা পেয়ে গেলাম, ব্যস্, ছ' মাস এখন কলা চোষো। কী ঝকমারি সাহিত্যের এই পেশা। কিন্তু কী করবো বলো, ভগবান যাকে যে-কাজ দিয়েছেন।

রথী গাঢ় গলায় বল্‌লে,—তা তো ঠিকই।

—এদিকে আয়ের নামে অষ্টরম্ভা, খরচের বেলা রাজসূয় যজ্ঞ। বলো না ভাই বলো না, কতো পাপে সাহিত্যিক হ'য়ে জন্মেছি আমরা।

—এমন দিন চিরকাল থাকবে না, সিতিকণ্ঠ-দা' এই বাংলা-সাহিত্যই একদিন দেখবেন ধনে-জনে কেমন সমৃদ্ধিশালী হ'য়ে উঠবে।

—সেই আশায়ই তো বেঁচে আছি। কিন্তু ততোদিন কি আর আমরা বাঁচবো? আমরা তো পরের যুগের ভোগের জন্যে উপোস্ দিয়ে-দিয়ে শুকিয়ে মরলাম!

—সেই মার্টারডম্‌ই তো আমাদের গৌরব। আপনি বসুন সিতি-দা, রথী ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে হাত ছাড়িয়ে নিলো: দেখি অর্জুনটা চা-ফা কদ্দুর কী করলে?

অনেক কসরত করে' কথাটাকে সিতিকণ্ঠ একটা নৈর্ব্যক্তিক আলোচনায় নিয়ে আস্‌তে পেরেছে। এবার, রথী ঘর থেকে চায়ের আয়োজনে বেরিয়ে গেলে, সিতিকণ্ঠ তার স্যুটকেসটা খুলে ফেল্‌লো। চারিদিকে মিট্‌মিট্ করে' চাইতে-চাইতে পাঞ্জাবির পকেট থেকে বা'র করলে অনেকগুলি দুমড়ানো দশ টাকার নোট। ফের গুণবার সময় হ'লো না, তেমনি ড্যালা-পাকানো অবস্থায় নোট-গুলি রাশীকৃত জামা-কাপড়ের তলায় লুকিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি

ডালাটা বন্ধ করে' উঠে দাঁড়ালো। ক্ষণকালের জন্যে মুখে এসে ছিলো তার একটা সূক্ষ্ম, সতর্ক, তীক্ষ্ণ কুটিলতা, আবার উঠে দাঁড়াতেই সেই মুখে পরিব্যপ্ত হ'য়ে পড়লো ধ্যানগম্ভীর অপরিমেয় প্রশান্তি। বেদনাময় ঔদাস্যের আভা।

সিতিকণ্ঠের হাতে যখন একটা আধলাও নেই, তখন, কাজে-কাজেই—

—তোমার কাছে ব্লেড্ আছে, রথী? পানামা-ব্লেড্? দাও তো দু'খানা।

রথী ব্লেড্ এনে দিলো।

—দু' খানাতেই আমার এক হপ্তা চলে' যাবে ক্লীন। তোমাদের মতো আমি এতো বাবু নই যে রোজ শেইভ্ করবো।

তা, এক সপ্তাহ যায় বটে, কিন্তু তার পরেই আবার ডাক পড়েঃ একখানা ব্লেড্ দিতে পারো রথী? ভদ্রলোকের মুখ না সজারুর পিঠ, আয়নায় তাকিয়ে যে ঠাহর হয় না দেখি।

স্নান করবার সময় সিতিকণ্ঠের একখানা সাবান চাই,—তা সে সাবান রথীর ঘরে টেবিলের উপরেই আছে। সাবানটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে-করতে সিতিকণ্ঠ বলেঃ অতো দাম দিয়ে বিলিতি পিয়ার্স্ কিনতে যাও কেন? সস্তায় আজকাল কতো দিশি সাবান বেরিয়েছে। তোমার সবতাতেই বাড়াবাড়ি।

সেই সাবান দু'জনে দশ দিন ধরে'ও মেখে উঠতে পারে না। রথীকে আবার নতুন করে' কিনে আনতে হয়। সিতিকণ্ঠ বলেঃ ও বিলিতি সাবানে কেবল ফেনাই সার, গায়ে মাখতে সব সময়েই কেবল ভয় হয় কখন যায় ফুরিয়ে। একটু হাত গুটোতে শেখ, রথী।

এমনি করে' ধোপা।

সিতিকণ্ঠ বলে,—তুমি যে একটা বস্তা বানিয়ে ফেল্‌লে, রথী। আমার কিন্তু ভাই এই পাঁচখানা। বুঝলে হরিপদ, সাত দিনে

দিয়ে যাও, তবেই আমার হয়। একসঙ্গে এক কাঁড়ি কাপড় ধুয়ে বাবুগিরি করা আমার পোষাবে না।

এমনি করে' যাবতীয় খুঁটিনাটি থেকে সুরু করে' বড়ো-বড়ো সাংসারিক খরচের মধ্যে সিতিকণ্ঠ আলগোছে গা ছেড়ে দিয়েছে। রথীর দেশ্‌লাইর বাক্সটি যেমন অবলীলায় তার পকেটে ওঠে, তেমনি তার সোনার বোতামের সেট্‌টাও সিতিকণ্ঠর বুকে উঠেছে। সেই যে একদিন চেয়ে নিয়েছিলো আর নামিয়ে রাখবার কথা মনে হয় নি। আজকাল ঠাকুরের রান্নার পর্যন্ত সে খুঁত ধরে: 'এ যে বাবা, একটা মেসের রান্না বানিয়ে বস্‌লে, ঘি-তেলগুলি ঢালবার সময় কি ডেকচিতে বাটি পেতে রাখো নাকি ঠাকুর?' আর অর্জুন তো তার দু' চোখের বিষ, যেন আফিঙখোরের নেশার উপর মুখের কাছে ধরা এক প্লেট ঝাল-চচ্চড়ি।

রথীর ছিলো বই কিনবার বাতিক, বলা বাহুল্য, ইংরিজি বই। ইদানি টাকায় টান পড়লেও কষ্টে-সৃষ্টে দু' একখানা করে' বই সে কিনতোই।

—হ্যাঁ, সিতিকণ্ঠ ঘাড় নেড়ে বলে: এ একটা খুব ভালো হ্যাবিট্‌। আস্তে-আস্তে, দেখতে-না দেখতে একটা লাইব্রেরি ফেঁপে ওঠে। খাই না-খাই, প্রতি মাসে অন্তত একখানা করে' বই আমি কিন্‌তামই—তা দিয়ে প্রায় দু' তিন আলমারি ঠাসা যায়।

রথী উৎসুক হ'য়ে বলে: সে-সব গেলো কোথায়?

—সে-ট্র্যাজেডির কথা আর বোলো না ভাই। দেশের বাড়িতে বই সব গাঁদি করা ছিলো, আকাট মুখ্‌খু মেয়েমানুষের দল তাদের কী ভাবলে কে জানে, কেউ তা দিয়ে ছেলের দুধ গরম করতে বস্‌লো, কেউ বস্‌লো নোংরা ফেলতে। গিয়ে দেখি তো এই কাণ্ড —দু-দু'টো তাক আমার লোপাট হ'য়ে গেছে। সব দামি-দামি বই ভাই, যাকে বলে সব rare books। কপাল কোটা ছাড়া আর পথ নেই—এমন অদৃষ্টও কারুর হয়?

রথী জের টেনে চলে : বাকিগুলো ?

—আর ফেলে রাখি সেই জংলি পাড়াগাঁয়ে ? কাঁধে বয়ে' নিয়ে এলাম কল্‌কাতা। কিন্তু এখেনে এসেও সেই দশা—অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়।

—বেশ, এখানে আবার কী হ'লো ?

—এই এখনকার মতো সেবার দু'টি মাস ধরে' ভীষণ slack season পড়লো, একটি পয়সাও রোজগার নেই। খেয়ে থাকতে হ'বে তো, যে করে' হোক্ লোকসমাজে সাহিত্যিকের মর্যাদা রাখতে হ'বে তো—দিলাম সবগুলি এক পুরোনো বইর দোকানে বেচে। পেলাম তো হাতি-ঘোড়া। সে দুঃখের কথা আর বোলো না ভাই। টাকা অনেক হ'লো, কিন্তু সে-সব বই আর ফিরে পেলাম না। আজো দেখি আমার সে-সব বই অনেকের হাতে ঘুরছে। সেদিনো তো নীরেন দত্তর হাতে আমারই 'মাদার'-খানা দেখতে পেলাম। কভারের বাঁ দিকে একেবারে আমার নাম লেখা। আবার রাবার্ দিয়ে তা তোলা হয়েছে। বইটা চিনতে পেরেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে' উঠলো। এ কেমন হয় দেখে, তোমাকে বলবো, রথী ? যদি নিজের ছেলেকে পোষ্য দিয়ে পরে দেখতে পাও সে মোটর হাঁকিয়ে তোমার গায়ে কাদা ছিটিয়ে উড়ে চলেছে, তেমনি। খাসা বই 'মাদার্'। কী বলো ? বাংলাতে অনুবাদ হওয়া উচিত।

রথীর স্তিমিতাভ, নির্লিপ্ত মুখের দিকে চেয়ে সিতিকণ্ঠ ফের বলে : তুমি এ-সব বড়ো-বড়ো প্রবন্ধের বই কিনতে যাও কেন ? এ-সব লেখকদের কে কবে নাম শুনেছে ? এদের লেখা বুঝবোই বা কী ছাই—বিদ্যে জাহির করা ছাড়া এদের আর কিছু আছে নাকি ? তুমি লেখ গল্প-উপন্যাস, তুমি শুধু গল্প-উপন্যাসই কিনবে।

রথী বিনীত হ'য়ে বলে,—কিন্তু রাসেল আমার খুব ভালো লাগে।

—দুত্তোর! ও তোমার গল্পে লাগবে নাকি কোনোদিন? শুধু পয়সা নষ্ট। এমন বই কিনবে যা পড়ে' গল্পের তোমার সাহায্য হয়। Education সম্বন্ধে জেনে তোমার গল্পের কি এডুকেশন হ'বে?

রথী ব্যাপারটা তলিয়ে ততো বুঝতে পারে না, ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে' চেয়ে থাকে।

সিতিকণ্ঠ বলে: যেমন ধরো শেকভ পড়ছ, কি না বলে ওর নাম, ওপ্যেনহেম পড়ছ—পড়তে-পড়তে তোমার মনে হ'লো এমনি ধরনের একটা গল্প বা চরিত্র বাংলায় দিব্যি খাপ খাইয়ে নেয়া যায়—সেটা কি কম লাভ হ'লো? কত সুবিধে বলো দিকিন।

—বা, রথী বিব্রত হ'য়ে বলে: সেটা তো চুরি।

—পাগল! সিতিকণ্ঠ হাতের একটা ভঙ্গি করে' ওঠে: লোকে বল্‌লেই সেটা চুরি হ'বে? তেমন করে' লিখতে জানা চাই বই-কি। তাই বলে' কি তোমাকে লাইন মিলিয়ে তর্জমা করতে হ'বে নাকি? একেই তো বলে adaptation-এর ক্ষমতা। আমরা তো প্রতি মুহূর্তেই কতো কিছু adapt করে' চলেছি। সব আমাদের অমনি চুরি হ'য়ে গেলো? যাক্‌, নতুন বইটাকে নাড়াচাড়া করতে-করতে সিতিকণ্ঠ ঢোঁক গিলে বলে: যাক্‌, আমার জন্যে একখানা ভালো Short stories of 1930 যোগাড় করে' আনতে পারো?

—কেন পারবো না? কতো দাম?

—তা বলতে পারি না। তাতে কয়েকটা ভালো গল্প আছে দেখেছিলাম। তুমি নতুনই-বা কিনতে যাবে কেন? পুরানো দোকানেই মিলে যেতে পারে একটা। আমারই তো এক কাপি ছিলো। চলো আমার সঙ্গে সেই পুরানো বইয়ের দোকানে, হয়তো এখনো সেটা বিক্রি হয় নি। গল্পগুলি আবার ভারি উল্‌টে-পাল্‌টে দেখতে ইচ্ছে করছে।

সে দিন দুই বন্ধু সন্ধ্যার মুখে বেরিয়ে পড়লো পুরানো বইর দোকানের সন্ধানে। ক'দিন থেকে শীত পড়েছে দুরন্ত, মাফ্‌লারের উপর কোট চাপিয়ে তাতে আবার র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে সিতিকণ্ঠ খানিকটা যা-হোক শরীরের তাপ রক্ষা করছে। অনেক হাঁটাহাঁটি করে'ও সেই দোকান খুঁজে পাওয়া গেলো না; সিতিকণ্ঠ ঠোঁট উলটে বললে,—কখন পাততাড়ি গুটিয়ে সরে' পড়েছে কে জানে।

ফেরবার পথে দেখা গেলো ফুটপাথে অনেক-সব পুঁথি-পত্র বিছিয়ে একটা লোক বসে' আছে, সামনে জ্বলছে খোলা একটা গ্যাস্। কতোগুলি লোক সেই স্তূপের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে' দুই হাতে বই ঘাঁটছে। সিতিকণ্ঠ পদক্ষেপগুলি হ্রস্ব করে' আন্‌লো, রথীর কাঁধে একটা ঠোকর দিয়ে বললে,—এই একটা দোকান, রথী। এদের এখানে মাঝে-মাঝে খুব ভালো বই মিলে যায়, আর ভারি সস্তায়। ব্যাটাদের কাছে মুড়ি মিছরির সমান দাম—জে. এল. ব্যানার্জির নোটই বলো আর মোপাশাঁর গল্পই বলো—ওদের কাছে কোনো তফাত নেই—সবই দু'-দু' আনা। দেখছ না কী রকম ভিড়, চলো, একবার দেখে আসি।

ভিড়ের মধ্যে সিতিকণ্ঠও মিশে গেলো। মিশে যে গেলো, আর তার বেরুবার নাম নেই। ফুটপাথের উপর হাঁটু মুড়ে বসে' একমনে সে বই ঘাঁটছে—একবার এ-বই হাতে করে, আবার ও-বইর পৃষ্ঠা ওলটায়। কোনোটাই যে তার পছন্দ হচ্ছে না তা বোঝা যায় আবার আরেকটা বইর উপর তার আকস্মিক আক্রমণে। এমনি করে' আজ যেন সে সমস্ত বইর নাড়ি-নক্ষত্র মুখস্ত করে' যাবে।

ভিড়ের বাইরে থেকে রথী ডাক দিলো: চলে' আসুন সিতি-দা, এ-সব যতো বাজে বই, রেলোয়ে-টাইমটেব্‌ল আর যতো মোটরের ক্যাটালগ্।

সিতিকণ্ঠ চাপা গলায় বললে,—এ বাজে বইর মধ্যেই মাঝে-

মাঝে দুয়েকটা রত্ন মিলে যায়, রথী। সে কি না জানি লাইনটা—
Full many a gem of purest ray serene—

সিতিকণ্ঠর ওঠবার তবু নাম নেই। দোকান একটা তার পেলেই হ'লো—যে-কোনো একটা দোকান, টুকিটাকি মনিহারি জিনিসেরই হোক, বা হোক না কেন গেঞ্জি-রুমালের ওষুধ-পত্রের, মাসিক-পত্রিকার—মানে, যে-সব দোকানের সম্ভ্রান্ততা কম, যে-সব দোকান খদ্দেরদের ইচ্ছেমতো জিনিস ঘাঁটতে দেয়। না কিনুক তাতে ক্ষতি নেই, সিতিকণ্ঠ সমানে সেই সব জঞ্জাল হাঁটকে বেড়াবে। বা, তার কী দোষ, মনোমত জিনিস না পেলে সে কী করতে পারে? জিনিস ঘেঁটেছে বলে'ই কি তাকে কিনতে হ'বে নাকি?

রথী বিরক্ত হ'য়ে উঠলো। গলায় সামান্য ঝাঁজ মিশিয়ে বললে,—উঠে পড়ুন, সিতি-দা। বই যখন কিনবেন না, মিছিমিছি কেন আর—

—হ্যাঁ, কিচ্ছু নেই, কিচ্ছু নেই ব্যাটাদের কাছে। কতোগুলি আইনের ছেঁড়া কেতাব আর যতো সচিত্র ভূগোল বিবরণ। যা বলেছ, এ আবার কে কিনবে? সিতিকণ্ঠ ভালো করে' র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে উঠে পড়লো।

চলে' যাবার জন্যে সিতিকণ্ঠ সামনের দিকে পা বাড়িয়েছে মাত্র, দোকানীটা বলা-কওয়া-নেই অতিপ্রবল পরাক্রমে তার গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, কঠিন মুঠিতে তার একখানা হাত চেপে ধরে' অতি নির্মম, পরুষ গলায় বললে, বই নিয়ে পালাচ্ছ, আমার দাম?

সিতিকণ্ঠের মুখ পাঁশের মতো বিবর্ণ হ'য়ে এসেছে, ঠোঁট কাঁপছে থরথর করে'। এতো প্রবল শীতেও গায়ে দিয়েছে ঘাম, নিমেষে সে একেবারে এতোটুকু হ'য়ে গেলো। ক্ষীণ, শুকনো গলায় সে বললে,—বই, তোমার বই আবার কখন নিতে গেলাম! এ বলে কী?

দোকানীটাকে আর যেন নিশ্বাস ফেলবারো অবকাশ দেয়া হ'লো না—রথী সজোরে এক ঝট্‌কায় সিতিকণ্ঠকে ছিনিয়ে নিয়ে উঠলো এক ঘুসি উঁচিয়ে দোকানীর মুখের উপর। গর্জন করে' উঠলো ঃ শূয়োর, রাস্কেল, দেবো এক ঘুঁসিতে তোমার মুখ থেঁতলে। তোমার ঐ ছেঁড়া, পচা ডাস্টবিন থেকে কুড়োনো কতোগুলি বই, তা লোকে যাবে চুরি করে' নিয়ে পালাতে—এখুনি দেবো পুলিশে ধরিয়ে। যাকে-তাকে তুমি এমনি অপমান করতে সাহস পাও ? জানো, ইনি কে ?

দেখতে-দেখতে ভিড় জমে' উঠছিলো। দোকানীটা ফের সিতিকণ্ঠকে ধরবার জন্যে তেড়ে এলো, লুঙ্গির একটা প্রান্ত তুলে ধরে' জঘন্য মুখভঙ্গি করে' সে বললে,—দেখি না কে কা'কে পুলিশে দেয়।

গতিক বড়ো সুবিধের নয়। সিতিকণ্ঠ হঠাৎ তার সেই ভয়-গ্রস্ত, বিপাণ্ডুর মুখের উপর অপরূপ একটি হাসির তরঙ্গ তুললে। হালকা, মধুর গলায় বললে,—ছেড়ে দাও, ওকে ছেড়ে দাও, রথী। আমারই ভুল হয়েছে দেখছি। বই ঘাঁটতে-ঘাঁটতে কখন অন্য-মনস্কের মতো দু' খানা Nash আমার হাতে উঠে এসেছে। বলে'ই সে র‍্যাপারের তলা থেকে পত্রিকা দু'খানি বার করে' ধরলো। অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো গভীর সহৃদয়তার সঙ্গে সে দোকানীকে সম্বোধন করলে ঃ কতো দাম হে তোমার এ দু'টোর ?

দোকানী তখন কতক ঠাণ্ডা হয়েছে। প্রচণ্ড দাম হেঁকে বসলো ঃ একটাকা।

—দিয়ে দাও হে রথী, একটা টাকা ওকে ফেলে দাও। সিতিকণ্ঠ প্রশান্ত গলায় বল্‌লে,—গরিব মানুষ, সারা দিন দোকান নিয়ে বসে' আছে, বিক্রি-পাটা কিছু হয়তো তেমন হয় নি। এমনিতে দাম হ'তো হয়তো ছ' আনা—তা ভুল যখন একটা হ'য়েই গেছে—কী আর করা যাবে, এক টাকাই সই। একটা গল্প পড়তে-পড়তে

কেমন যে তখন তন্ময় হ'য়ে পড়লাম—কিছু আর খেয়ালই রইলো না।

লজ্জায় হেঁট হ'য়ে রথী মনিব্যাগ থেকে একটা টাকা বা'র করে' দিলো।

টাকাটা দোকানীর হাতে গুঁজে দিয়ে সিতিকণ্ঠ বল্‌লে,—হ'লো তো? তারপর দোকানী বিড়বিড়িয়ে গালাগাল দিতে-দিতে ফের তার দোকান নিয়ে বসলে সিতিকণ্ঠ বাঁ হাতের উপর কোঁচার প্রান্তটি তুলে দিয়ে রথীর পাশাপাশি হাঁটতে লাগলো ফুটপাথ ধরে'।

রথীর মুখে কথা নেই। হাঁটবার শক্তি যেন এসেছে নিস্তেজ হ'য়ে।

সিতিকণ্ঠ তার কাঁধের উপর আলগোছে একখানি হাত তুলে দিলো, স্নিগ্ধকণ্ঠে বল্‌লে,—কী করবে বলো রথী, ওরা অমনিই। ওদের সঙ্গে এঁটে ওঠা কি আমাদের কাজ? ওদের সঙ্গে লাগতে যাওয়াই আমাদের ভুল—ভদ্রলোককে অপমান করতে পারলেই ওদের আর কোনো কথা নেই। তা, সিতিকণ্ঠ তার কাঁধে মৃদু-মৃদু চাপড় দিতে লাগলো: তা, ওদের কথায় কি কিছু মনে করতে আছে ভাই? এমনি ঝগড়া-ঝাটি কতোই তো হয় মানুষের। দাঁড়াও, চলো, এই খাবারের দোকানে কিছু খেয়ে মেজাজটা ঠাণ্ডা করবে চলো।

পাঁচ

রথী চিরকেলে একা মানুষ, চাকর-ঠাকুরের উপর সংসার, তার স্বভাব তাই বড়ো অগোছালো, ঢিলে-ঢালা। জিনিস-পত্র যেখানে খুসি সে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখে, টাকা-পয়সা সে একধার থেকে খরচই করে' যায়, কিছু আর তার হিসেব রাখে না। চাকর বাজার থেকে যখন যা ফিরতি পয়সা এনে দেয়, একবার ভুলেও জিগ্‌গেস করে না কোন্ জিনিসটার কতো দর। কোনো জিনিসের ঝক্কি নিতেই তার ভারি অসুবিধে মনে হয়, সব সময় সে তাই গা ছেড়ে দিয়ে থাকতেই ভালোবাসে। ধোপাবাড়িতে কী কাপড় যাবে তা-ও তদারক করে অর্জুন, কোন্ বেলা কী রান্না হ'বে না হ'বে সে-বিষয়ে ঠাকুরই সর্বে-সর্বা। বিছানার চাদর বদ্‌লানো থেকে সুরু করে' জুতোয় কালি লাগানো পর্যন্ত সবই অর্জুনের হাতে—সে মনে করিয়ে দিলে তবে তার স্নান করবার সময় হয়, খিদে পায়, ময়লা জামাটা এইবার এতোদিনে ছাড়তে হ'বে বলে' অনুভব করে। তার ঘর-দুয়ার সমস্তই হচ্ছে অর্জুনের হেপাজতে, নিজে থেকে কিছু একটা করবার রথীর একেবারেই গা নেই। সংসারের ও-সব ছোটখাটো আনাচে-কানাচে নাক ঢোকাতে রথীর কেমন গা-ঘিনঘিন করে। এই সে আছে বেশ—তার স্বপ্ন আর সাহিত্য নিয়ে। দেশ থেকে দিদিমা পাঠাচ্ছেন টাকা, পরীক্ষাটাও দিতে হ'বে না—খাসা।

এমনি চলে' আসছিলো। কিন্তু অর্জুন যে কতো বড়ো চোর সেটা হাতে-নাতে প্রতিপন্ন না করে' দিয়ে সিতিকণ্ঠের যেন স্বস্তি নেই।

—তুমি জানো না রথী ও একটা ডাহা ডাকাত, তোমাকে যে ও তিল-তিল করে' শুষে নিচ্ছে। নইলে, কাল আমি স্বচক্ষে গিয়ে

দেখে এলাম আলুর দর পাঁচ পো ন-পয়সা। ও ব্যাটা আনলো কিনা সেই আলু চোদ্দ পয়সা করে'। পোনা মাছ বারো আনা, ও এসে বল্‌লো পাঁচ সিকে। তুমি মারা যাবে, ঠিক মারা যাবে, রথী। ও মেদিনীপুরী ভূতকে তুমি এক্ষুনি তাড়াও। ও বুকে ছুরি বসাতে পারে।

রথী স্নিগ্ধমুখে হেসে বল্‌লে: তা, চাকর-বাকররা একটু-আধটু চুরি করবেই, সিতি-দা।

—তাই বলে' এই পুকুর-চুরি? সিতিকণ্ঠ ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে: তাই বলে' চার আনার জিনিস ও এসে আট আনা বলবে? এ যে বাবা সেণ্ট-পার্‌সেণ্ট লাভ। বেশ, বুঝবে একদিন, আমার কী? নাই দিয়ে-দিয়ে তুমি যে ওকে একেবারে মাথায় তুলেছ, মাথাটা এখন তোমার আস্ত থাকলেই হয়। আমি ওকে প্রথম দিন এসেই চিনেছি—ব্যাটা পাকা সয়তান। আমার কী, তোমার ভালো তুমিই বুঝবে, হ্যাঁ, আমি কে, আমার কী মাথাব্যথা!

হ'লোও তাই—সিতিকণ্ঠ যা আঁচ করেছিলো।

রথী তার টাকা-পয়সার ব্যাগটা যেখানে-সেখানে ফেলে রাখতো —তোশকের নিচে, বইয়ের ফাঁকে, কখনো বা হাতের কাছে টাঙানো একটা ফোটোর আড়ালে। সে-সব পয়সার ভিড় থেকে মাঝে-মাঝে দু'-একটা করে' উধাও হ'তে সুরু করলো। আগে-আগে একাধটা সিকি বা দুয়ানি, ক্ষতিটা রথীর চোখেই পড়তো না, কেননা টাকা-পয়সা কড়ায়-ক্রান্তিতে গুণে রাখবার তার অভ্যেস নয়। তারপর যেতে লাগলো খুচরো সিকি-দুয়ানি নয়, একটা-দুটো করে' আস্ত, নিটোল টাকা। মনে-মনে হয়তো একটি আন্দাজি ধারণা যে সেল্‌ফের উপর কাগজটার নিচে ব্যাগে চার টাকা সাড়ে চোদ্দ আনা আছে, বেরুবার সময়ো সেই হিসেব করে'ই তা পকেটে তুলে রাখে, কিন্তু কিছু একটা খরচের সময় পয়সা দিতে গিয়ে দেখে তিন টাকা সাড়ে দশ আনা। একটা টাকা একটা সিকি সঙ্গে নিয়ে কোথায়

যে উড়ে গেলো চট্‌ করে' রথী কিছু তার হদিস্‌ পায় না—মনে করে, হয়তো কোনো সময় কিছু-একটাতে খরচ ক'রে ফেলেছে, তার খেয়াল নেই। কী যে খরচ করেছে তার একটা সে কিনারা করতে পারে না বটে, কিন্তু চার টাকা সাড়ে চোদ্দ আনাই যে ছিলো তার প্রমাণ কী?

কিন্তু যেদিন মনিব্যাগটার দ্বিতীয় ভাঁজে সে জ্বলজ্যান্ত তিনখানি দশ টাকার নোট গুঁজে রেখেছিলো, বাড়ি ভাড়া দিতে গিয়ে দেখে একখানি তার অদৃশ্য হ'য়ে গেছে।

মুখ-চোখ অন্ধকার করে' সে সিতিকণ্ঠের কাছে এসে ভেঙ্গে পড়লো: ব্যাগে আমার তিরিশটা টাকা ছিলো সিতি-দা, এখন দেখি দশটা টাকাই লোপাট।

—গেছে তো? সিতিকণ্ঠ মুখ ঝামটা দিয়ে উঠলো: তখনই বলেছিলাম একদিন গলায় ও ছুরি বসাবে! আমার কথা তো তখন কানে তোল নি, এখন ঠ্যালা বোঝ। চাকরকে বাপু-বাছা বলে' আরো দুধকলা খাওয়াও।

—কিন্তু কী হ'বে, সিতি-দা? বাড়ি ভাড়া আমি এখন কোত্থেকে দিই?

—কেন, তখন ঐ ব্যাটাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিতে পারো নি? আমি তখনই জানি ও ব্যাটা হাড়ে-হাড়ে বদ্‌মাস—তখন তো আর আমাকে বিশ্বাস করো নি। এবার ফল্‌লো তো আমার কথা? ধরা পড়লো তো ওর চুরি?

রথী ম্লানমুখে বল্‌লে,—কিন্তু অর্জুন কতোদিনকার চাকর, কোনোদিন তো এমন কাজ করে নি।

—তা হ'লে নোটটা পাখা গজিয়ে আকাশে দিব্যি উড়ে গেছে। সিতিকণ্ঠ প্রায় মুখ খিঁচিয়ে উঠলো: কোনোদিন করে নি মানে সাহস করে নি। তুমিই তো প্রশ্রয় দিয়ে-দিয়ে ওর সাহস এতো বাড়িয়ে দিয়েছ। পোষ-মানা বাঘের বাচ্চাও

বড়ো হ'য়ে মুনিবের টুঁটি কামড়ে ধরে। এ আর একটা এমন কী বেশী কথা ?

রথী আঙুল দিয়ে মনিব্যাগের গহ্বরটা ঘাঁটতে-ঘাঁটতে বল্‌লে, কিন্তু এখন কী করা যায় বলুন দিকি ?

—কী আর করা যাবে ? সোজা ব্যাটাকে পুলিশে দিয়ে এসো, মারের চোটেই ট্যাঁক থেকে ঠিক টাকা বা'র করে' দেবে দেখো। পুলিশের কথা বলে' নিজেই যেন সিতিকণ্ঠ একটু ভড়কে গেলো : পুলিশ-হাঙ্গামা না করতে চাও, সোজা ওকে বিদায় করে' দাও। বাজার ? আমাকে পয়সা দিয়ো, আমিই করে' আনতে পারবো। এটো-কাঁটা ? টাইমের একটা ঠিকে ঝি রেখে দিলেই চলবে।

—তা তো হ'লো, কিন্তু, রথীর গলা ধরে' এলো : এখন আমি কি করে' কী সামলাই বলুন। আপনি তু' মাস ধরে' কিচ্ছু পাচ্ছেন না, আর আমার তো এই অবস্থা। বাড়ি-ভাড়াটা বা কী করে' দিই, বিল্ নিয়ে এলে মুদিটাকেই বা কী বলি ?

সিতিকণ্ঠের মুখে আর কোনো শব্দ নেই। নিবিষ্ট মনে সে আবার তার লেখা নিয়ে বসেছে।

রথী বল্‌লে,—মহা মুশকিলেই পড়লাম দেখছি।

সিতিকণ্ঠ বলে' উঠলো : চাকরটাকে তাড়াবে না তো মুশকিলে পড়বে না ?

—কিন্তু সত্যি করে' দেখতে গেলে অর্জুনের কী দোষ ? দোষ আমার, আমার অসাবধানতার জন্যেই তো গেলো। এবার থেকে বাক্সে বন্ধ করে' রাখতে হ'বে দেখছি।

—বা, তা কেন ? তোমার বাড়ি, তোমার টাকা, যেখানে খুসি তুমি তা ফেলে রাখো না—ও নেবার কে ? তোমার খুসি তুমি ফেলে রাখবে, একশো বার রাখবে, তাই বলে' ও চুরি করে' নেবে নাকি ? চাকরবাকরের দোষ এমনি চাপা দিয়ে রেখো না, রথী।

সিতিকণ্ঠ আবার তার লেখার মধ্যে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে ডুবে

গেলো। তাকে আর বিরক্ত করা ঠিক হ'বে না ভেবে রথী আর সেখানে দাঁড়ালো না।

এ-সব ক্ষয়-ক্ষতি বিরক্তি ও ব্যর্থতার পর রথীর জন্য এক জায়গায় সান্ত্বনা থাকতো সঞ্চিত হ'য়ে। সে তার মাধুরী।

এমনি একেকটা সন্ধ্যায় রথী সিতিকণ্ঠের থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আসে—এই একদিন সে আলাদা।

সেজেগুজে বেরচ্ছিলো, সিতিকণ্ঠ তাকে ডাক দিলো: শুনে যাও, তোমার 'ভাঙা আয়নার' আজ প্রুফ এসেছে।

—এসেছে? বারান্দা থেকে রথী ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়লো: তা হ'লে সত্যি-সত্যি ছাপা হচ্ছে বইটা?

—তা না হ'লে কি মিথ্যে-মিথ্যে? এই দেখ।

—যাক্, মাধুরীকে গিয়ে আজ বলা যাবে।

—তাই যাও। সিতিকণ্ঠের স্বর কেমন ভারি হ'য়ে উঠলো: তুমি যাও, হাওয়া খেয়ে এসো, আর আমি এই নির্জন অন্ধকূপে বসে' তোমার বইয়ের প্রুফ করেক্ট করি। একেই বলে ভাগ্যলিপি।

রথী অসহিষ্ণু হ'য়ে বল্লে,—না, না, আপনাকেও একদিন নিয়ে যাবো তার কাছে। সে আপনার লেখার ভারি ভক্ত, আপনাকে অনেক-কিছু নাকি তার জিগ্‌গেস করবার আছে। তা, আপনাকেও সে একটা পার্টিতে নেমন্তন্ন করবে বলেছে।

—পার্টি? পার্টিতে কী হ'বে? আলাপ করবার জন্যে পার্টির কী দরকার? সিতিকণ্ঠ চোখ নাচিয়ে বল্লে,—খুব বড়লোকের মেয়ে বুঝি?

—তা অবস্থা ওদের মন্দ নয়?

—আছো বেশ। টাট্‌কা বয়েস, অগাধ টাকা—তায় আবার লিটারেচারের গন্ধে ভুরভুর করছে। আর আমাদের যে ভাঙা আয়না সেই ভাঙা আয়না!

রথী রসিকতা করবার চেষ্টা করলেঃ কেন বাড়িতে তো আপনারো সুন্দরী স্ত্রী আছে।

—সুন্দরী! তা-ও কিনা আবার স্ত্রী! সিতিকণ্ঠ মুখ বিকৃত করে' বল্‌লে,—সেই সৌন্দর্যের জন্যেই তো তাকে দেশে ফেলে বনবাস নিয়েছি!

—তা মেয়েরা কি আর সারাজীবন সুন্দরী থাকে?

—তা যা বলেছ। তিন-চারটে সন্তানের মা হ'তে-না-হ'তেই তার রূপ-যৌবন পিঁপড়ের পাখার মতো উড়ে পালায়! কিন্তু আমাদের কী? সিতিকণ্ঠ একেবারে তার জামার আস্তিন গুটিয়ে বসলোঃ আমাদের অটুট যৌবন, অনির্বাণ বাসনা।

রথী আম্‌তা আম্‌তা করে' বল্‌লে,—আপনার ছেলেপিলেও আছে নাকি?

—হয়েছিলো গোটা তিনেক। দু'টি তার বেঁচে নেই।

—বেঁচে নেই? প্রশ্ন করতে রথীর গলাটা কেঁপে উঠলোঃ কিসে গেলো?

—ঐ তাদের সুন্দরী মা'র আশীর্বাদে। হেরিডিটি, বিজ্ঞানের পরিভাষায় একেই বলে' হেরিডিটি। সিতিকণ্ঠের চোখ প্রায় ছল-ছল করে' এলোঃ তোমাকে সেই সব নিষ্ঠুর বাস্তবতার ইতিহাস বলতে আমার নিজেরই করুণা হচ্ছে। সাহিত্যিক বলে' ভগবান যেন তোমারো উপর এই নির্মম রসিকতা না করেন এই প্রার্থনা করি। কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলে' রাখি রথী,—রথী এক পা দাঁড়ালো—মেয়েমানুষকে জীবনে কোনোদিন বিশ্বাস করো না। বিয়ে করেছ কি ঠকেছ।

রথী হাসিমুখে সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে বল্‌লে, বলতে-বলতে নাম্‌লে,—কিন্তু মাধুরীকে বিয়ে করে' তেমন ঠকতে আমি একশো বার রাজি আছি, সিতি-দা।

ছয়

মাধুরী। তা'র সম্বন্ধে আর-কিছু কি বলা যায়? আমরা শুধু এটুকু জানি, সে মাধুরী। কে বল্‌বে সে কেমন; কেমন তার চুল, যখন স্নানের পর সে আয়নার সাম্‌নে এসে দাঁড়ায়—চূর্ণকুন্তল থেকে ঝরে'-পড়া জলের ফোঁটা চিক্‌চিক্ কর্‌ছে তার গালে; কেমন তার বাহুর ভঙ্গি, যখন দীর্ঘ চুলগুলোর ভিতর দিয়ে আস্তে-আস্তে সে চিরুনি টেনে নিয়ে আসে; কেমন তার ভুরুর বাঁকা রেখা, যখন প্রসাধনের শেষে সে তাকায় নিজের দিকে। কে বল্‌বে! কে বলতে পারে। আমরা শুধু এটুকু জানি, সে মাধুরী।

আর রথী জানে, সকল মেয়ের মধ্যে মাধুরী একমাত্র সমস্ত পৃথিবীতে, সমস্ত সময়ের মাধুরীর তুলনা নেই। মাধুরী তার হৃদয়ের নিশীথরাত্রির নির্জনতা, মাধুরী তার অন্তরের সঙ্গোপন, চিরন্তন কবিতা। মাধুরীর মধ্যে সীমাহীন রহস্য, মাধুরীর মধ্যে অকূল অন্ধকার। আর, লক্ষ বছর নির্নিমেষে তাকিয়ে থাক্‌লেও মাধুরীকে কখনো সম্পূর্ণ করে' দেখা হবে না।

রথীর একমাত্র চিন্তা, কী করে' সে মাধুরীর যোগ্য হ্‌বে। কেননা সে যে তার যোগ্য নয় সে-বিষয়ে একটুকু সন্দেহ তার ছিলো না। কী কর্‌তে পারে সে, কী না কর্‌তে পারে সে?—মাধুরী যদি বলে, মাধুরী যদি চায়। কিন্তু মাধুরী কিছুই বলে না; বড় জোর বলে, একটা নতুন রেকর্ড যা এনেছি—বিউটিফুল্। শোনো। রথী সেটা শোনে স্তব্ধ হ'য়ে সঙ্গীত-প্রসূত বিহ্বলতা ফোটাবার চেষ্টা করে মুখে। শোনা হ'য়ে গেলে মাধুরী বলে, কেমন। ফ্রাইট্‌ফুলি ভালো, না? রথী যথোচিত সুখ্যাতি করে। প্রসঙ্গক্রমে ওঠে অন্যান্য কথা, অতুল সেন আর নজরুল ইস্‌লাম,

শরৎ চাটুয্যে আজকাল কী-সব হার্টব্রেকিং গল্প লিখ্ছেন, কী একটা ডিভাস্টেটিং ছবি দিয়েছিলো গেলো সপ্তাহে এম্পায়ারে, মাধুরীর বন্ধু লতিকা সম্প্রতি কী অদ্ভুত কয়েকটা নাচ শিখে এসেছে শান্তি-নিকেতন থেকে—ইত্যাদি, ইত্যাদি। তারপর এক সময়ে রাত হ'য়ে যায়, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রথী বলে, উঠি। যে-কথা তার মনে, তা বলা হয় না, মাধুরীর মুখ থেকে যে-কথা সে শুন্‌তে চায় তা হয় না শোনা। মাধুরী তাকে অসম্ভব কিছু করতে বলে না, তাকে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে বলে না কোনো ভীষণ দুঃসাহসে। খুব বেশি হ'লে বলে ঃ কালো পাথরের নটরাজ-মূর্তি কোন্‌খানে পাওয়া যায় বল্‌তে পারো? হায়রে নটরাজের মূর্তি! সে কেন বল্‌লে না, তুমি একবার সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ো, আমি দেখি।

মাধুরীদের বাড়ি ভবানীপুরে। তা'র বাপ একজন নাম-করা এডভোকেট। একমাত্র মেয়ে—প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে ছেলেবেলা থেকে। রথীর সঙ্গে প্রথম আলাপ এক গানের আসরে। সুধারানী সেখানে গিয়েছিলেন মেয়েকে নিয়ে—গান-বাজনার নামে ও পাগল। রথীর মিষ্টি, নরম চেহারা দেখে সুধারানীর প্রথমটায় ভালো লেগেছিলো। পরে যখন জান্‌তে পেলেন তার দিদিমার বিস্তর বিষয়-সম্পত্তির রথীই উত্তরাধিকারী, তখন সেই মিষ্টি চেহারার সঙ্গে সঙ্গে রথীর অন্তরের আরো অনেক গুণ উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেলো, যা এতদিন আশ্চর্যরকম চাপা পড়ে' ছিলো। রথী কায়েমি হ'য়ে গেলো ও-বাড়িতে। সে বসে'-বসে' অনায়াসে বি-এ ফেল্ করতে লাগলো আর সাহিত্যিকদের সঙ্গে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করবার লোভে ভেসে বেড়াতে লাগলো এখান থেকে ওখানে।

কেননা এ-কথা ভাব্‌তে রথীর অসহ্য লাগ্‌তো যে সে সাধারণ। মাধুরী যাকে আচ্ছন্ন করে' রেখেছে, সে কি পারে ভিড়ের মধ্যে মিশে থাক্‌তে? তাকে বিশেষ-কিছু হ'য়ে উঠ্‌তেই হবে যে।

এবং বাংলাদেশে—মানে কল্‌কাতা শহরে—অসাধারণত্বের ছাপ সংগ্রহ কর্‌বার সব চেয়ে সোজা উপায় হচ্ছে সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে ভিড়ে যাওয়া। উৎসাহ আর অধ্যবসায় থাক্‌লে সাহিত্যিকত্বের পাস্‌পোর্ট যে-কোনো লোক পেতে পারে। আর রথীর ও-দুই বস্তু যথেষ্ট ছিলো—তার উপরে ছিলো পয়সা। পয়সা থাক্‌বার মাহাত্ম্য অনেক। একজন লোকের পয়সা আছে, এটা জান্‌লে তার সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতটাই যায় বদ্‌লে। সে যদি খরচ না-ও করে, তবু। খরচ যে সে ইচ্ছে কর্‌লেই কর্‌তে পারে, সেটা ভাবতেই যথেষ্ট থ্রিল্। বিশেষ, সভাসমিতিতে তাল-পাকানো সাহিত্য-সেবক ও সাহিত্যিক-সেবকদের সে-সম্বন্ধে সচেতনতা একটু তীক্ষ্ণরকম জাগ্রত।

রথী যাকে বলে দস্তুরমত সাক্‌সেস হ'য়ে উঠেছিলো অল্প সময়েই। চল্‌তি সাহিত্যের দিক্‌পালগণ সবাই তাকে চিন্‌তো। যে-সব কাগজের আপিসে, প্রকাশকের আড্ডায়, চায়ের দোকানে লেখকরা জমায়েত হ'ন, সে-সব জায়গায় তার সিল্কের পাঞ্জাবি পরিহিত দীর্ঘ ম্লান মূর্তিকে অব্যর্থ নিয়মিততায় আবির্ভূত হ'তে দেখা যেতো। সে-ও প্রায় তাদেরই একজন—তার পকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট বেরুলে নিমেষে খালি হ'য়ে যায়, সবাই মিলে কিছু খাবার প্রস্তাব হ'লে সে যখন তাড়াতাড়ি মনিব্যাগ বা'র করে, কেউ আপত্তি করে না। খ্যাতির সেই আলোকচক্রের মধ্যে সে-ও গৃহীত হ'লো বলে'। তার শুধু এই আশা ছিলো, এদের সঙ্গে মেলামেশা করে' যদি এতটুকু গৌরবও তার উপর প্রতিফলিত হ'য়ে পড়ে। সেটাই কি কম! প্রত্যুম্ন সরকারের উচ্চারিত কোনো রসিকতায় হাস্‌বার সৌভাগ্য ক'টা লোকের হয়? দিব্যেন্দ্র দাশগুপ্তর সঙ্গে কটা লোক মুখোমুখি চায়ের পেয়ালা নিয়ে বসে' অন্ধকূপ নামক বিখ্যাত উপন্যাস রচনার ইতিহাস শুনেছে? হেমমণি বাঁড়ুয্যের সঙ্গে পনেরো মিনিট ধরে' অতি-আধুনিক

ইংরেজি কবিতা নিয়ে আলোচনা কি সকলেই কর্‌তে পারে? শেষ পর্যন্ত রথী তা'র সাধনার চরম পুরস্কার পেয়ে গেলো—পেয়ে গেলো দিগ্বিজয়ী গল্প-লেখক স্বয়ং সিতিকণ্ঠ গাঙ্গুলিকে। এতটা সে নিজেও আশা করে নি।

সিতিকণ্ঠ যেদিন এসে উঠ্‌লো তার বাড়িতে, সেদিন, তবু যা হোক্ একটা-কিছু হ'লো, সে মনে-মনে বল্‌লে। এমন-কিছু হ'লো যা বিশেষ, যা আলাদা। প্রকাণ্ড আর্টিস্‌ট্ সিতিকণ্ঠর ভগ্ন, ব্যর্থ জীবনকে সে আশ্রয় দিয়েছে—অ্যালিস্ মেনেল্ যেমন ফ্রান্সিস্ টম্‌সন্‌কে—কথাটা ভাবতেও তা'র সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে। দূর-ভবিষ্যতে (খুব বেশি দূরই বা কী ?) যখন সিতিকণ্ঠর জীবন-চরিত লেখা হ'বে, যখন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাকে নিয়ে আলাদা একটা পরিচ্ছেদই তৈরি কর্‌তে হ'বে—সে-সব লেখায় কি রথীরও একটা মস্ত স্থান থাক্‌বে না—সেই রথী, দু'বারেও যে বি-এ পাস কর্‌তে পারল না, দশজন লোকের সাম্‌নে কোন কথা বল্‌তে গেলে যার গলা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে যায়, যার লেখা 'শঙ্খনাদে'র পেট-মোটা সম্পাদক অনায়াসে ফেরত দিয়েছিলো। বি-এ পরীক্ষাটা সম্বন্ধে তা'র মনে গোপন একটু কুণ্ঠা ছিলো—কেননা মাধুরী হয়-তো আর দু'দিন পরেই বি-এ পাস করে' বস্‌বে। কিন্তু সিতিকণ্ঠের সঙ্গে আলাপ হ'বার পর সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি না-নেবার একটা পবিত্র অধিকার পেয়ে গিয়েছিলো। চ্ছোঃ, বি-এ পাস! রবিঠাকুর কোন্ বি-এ পাস! শরৎ চাটুয্যে, নজরুল ইস্‌লাম, স্বয়ং সিতিকণ্ঠ গাঙ্গুলি! সাহিত্যিকের পক্ষে কিছু পাস করাটাই যে লজ্জা। সাহিত্যিক শিল্পী, সাহিত্যিক স্রষ্টা ঃ তার অন্তরেই তো প্রেরণার উৎস—তার তো কোনো দরকার নেই বই পড়্‌বার ঃ বিদ্যাকে সে কেন সাধ্‌তে যাবে, সরস্বতী যেচে তার গলায় দেবে মালা।

সুতরাং রথীর সব কুণ্ঠা দূর হ'লো। নিজের মহিমায়—বরং

সিতিকণ্ঠের মহিমায় সে প্রতিষ্ঠিত হ'লো। সিতিকণ্ঠ গাঙ্গুলি—আটাশ বছর বয়েসে যিনি প্রায় পঁয়তাল্লিশখানা বই লিখেছেন—সেই সিতিকণ্ঠ গাঙ্গুলি তার বাড়িতে! ওঃ, মাধুরীর কি তাক লেগে যাবে না এ-কথা শুনে।

লাগ্‌লো তাক। সিতিকণ্ঠর আগমনের উত্তেজনায় দিনকয়েক সে ভবানীপুর যাবার সময় করে' উঠ্‌তে পারে নি। তারপর এক সন্ধ্যায় সে গিয়ে উপস্থিত হ'লো—প্রায় সাড়ে-আটটা তখন। মাধুরীরা খেতে যাবার উদ্যোগ কর্‌ছে। সুধারানী তাকে দেখে বল্‌লেন, কোথায় ছিলে এতদিন?

—এখানেই ছিলুম।

—অনেকদিন তুমি আসো নি মনে হচ্ছে।

—আস্‌তে পারি নি, রথী কুণ্ঠিতভাবে বল্‌লে। এখনি প্রশ্ন হবে, কেন; তারপর—তারপর রথী খুব সাধারণস্বরে যেন-কিছুই-নয়ভাবে বল্‌বে, সিতিকণ্ঠবাবু আমার ওখানে আছেন কিনা—

কিন্তু সুধারানী বল্‌লেন, আমরা খেতে যাচ্ছিলুম এখন। চলো না তুমিও একটু বস্‌বে। খেতে-খেতে গল্প করা যাবে।

রথী বল্‌লে, না, থাক্—

ইতিপূর্বে এরূপ প্রস্তাবে রথী কখনো আপত্তি করে নি। সুধারানী একটু বিস্মিত হ'য়ে বল্‌লেন, কেন? বাড়ি থেকে খেয়ে বেরোও নি নিশ্চয়ই?

—না, সে-জন্যে নয়।

—এসো না, মাধুরী বল্‌লে, একটু বস্‌বে চলো। না-হয় কিছু নাই খেলে।

সুযোগ বুঝে রথী তার তীর ছুঁড়্‌লে, আমি বরঞ্চ আজ চলে'ই যাই। কাল আস্‌বো আবার।

—কিন্তু এই তো এলে, মাধুরী প্রতিবাদ কর্‌লে।

—না, যাই। সিতিকণ্ঠবাবু হয়-তো আবার বসে' থাক্‌বেন আমার জন্য।

—সিতিকণ্ঠবাবু! সিতিকণ্ঠবাবু কে?

সিতিকণ্ঠ গাঙ্গুলি, তার কণ্ঠস্বরের কম্পন যাতে শ্রুত না হয় রথীকে সে-জন্য যথেষ্ট চেষ্টা কর্‌তে হ'লো, যার বই তুমি এত পড়ো আর ভালোবাসো।

—তিনি তোমার জন্য বসে' থাক্‌বেন? মাধুরী ভুরু কুঁচ্‌কে বল্‌লে, মানে?

—তিনি আমার ওখানেই আছেন কিনা আজকাল।

—তোমার ওখানে আছেন! কথাটার পুনরাবৃত্তি করা ছাড়া মাধুরী আর কিছুই বল্‌তে পার্‌লে না।

রথী নির্লিপ্ত, রথী উদাসীন। রথী তার চেয়ারের হাতলটাকে আস্তে আস্তে আঙুল দিয়ে ঠুক্‌ছে। হ্যাঁ, কী সহজ, শান্তভাবে সে বল্‌লে, আমার ওখানে তাঁকে নিয়ে এসেছি। ভোলানাথ গোছের মানুষ—বিশ্রী একটা মেসে পড়ে' ছিলেন তো পড়ে'ই ছিলেন। তাও কি সহজে আস্‌তে চান্। কত সাধ্য-সাধনা করে'—

—কবে থেকে আছেন তিনি?

—এই তো ক'দিন। সে-জন্যেই তো আস্‌তে পারি নি। এত বড় প্রতিভা—তাঁর ভার নেয়া কি সোজা কথা!

সুধারানী বল্‌লেন, তিনি দিনকয়েক থাকতে এসেছেন—তাই তো?

রথী অনিশ্চিতভাবে বল্‌লে, ঠিক কী। কিন্তু কী চমৎকার লোক—সেদিন বল্‌ছিলেন, তোমার এই ঘরটি আমার এত ভালো লাগছে যে এই ঘরেই যদি আমার মৃত্যু হয়—বল্‌তে বল্‌তে রথীর কণ্ঠস্বর ভারি হ'য়ে এলো।

—কিন্তু, সুধারানী একটু ইতস্তত করে' বল্‌লেন, তোমার খরচ-পত্র তো বাড়লো, রথী।

রথী মনে-মনে সাংসারিক মনের বেনেপনাকে ধিক্কার দিলে। হায়রে, এঁরা শুধু খরচটাই বোঝেন, প্রতিভা বোঝেন না। এই টাকা-আনা-পাই-ময় বিশ্বে কোনো প্রতিভা যে আদৌ স্ফুরিত হ'তে পারে সেটাই একটা মির‍্যাকল্। মুখে সে অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে বল্‌লে, খরচ আর কী। তা ছাড়া, এত বড় একজন লেখককে তো একটা এঁদো মেসে পচতে দেখা যায় না।

—তা হোক, সুধারানী বল্‌লেন, একটু হিসেব করে' চালাতে দোষ নেই। খরচ করতে চাইলে কোন্ না লাখ টাকাও খরচ করা যায়। তোমার সেই চাকরটাই আছে তো?

—কে, অর্জুন? হ্যাঁ, আছে।

—তোমার দিদিমাকে আনিয়ে নাও না দেশ থেকে। বাড়িতে কোনো মেয়েমানুষ না থাকলে কি সংসারের মিছিল থাকে।

—দেখি, বলে' রথী চেয়ার ছেড়ে উঠলো। এ-সব কথাবার্তায় তার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন রী-রী করে' উঠছিলো।

সিতিকণ্ঠকে ছোটখাটো কাজের বিরক্তি থেকে বাঁচাতে গিয়ে সময়ের লক্ষপতি রথীর আজকাল সময়ের টানাটানি পড়ে' যাচ্ছে: আগেকার মত ঘন-ঘন সে মাধুরীদের বাড়িতে যাতায়াত করতে পারে না। একদিন মাধুরী বল্‌লে, তোমার আজকাল হয়েছে কী বলো তো?

—কী আবার হবে।

—সে—ই শুক্কুরবার এসেছিলে, আর তারপর আজ—করো কী সারাদিন বসে'-বসে'?

—সিতিকণ্ঠ-দার কত বিজনেস্, একটু গর্বের ভাবে হেসে রথী বল্‌লে, কত প্রুফ, কত চিঠি, কত লোকের সঙ্গে কত রকম কথাবার্তা—

মাধুরী অত্যন্ত সরলভাবে বল্‌লে, তা তোমার তা'তে কী?

—বাঃ, বিস্ময়ে রথীর একবার চোখের পাতা পড়লো, ও-সব

কাজ আমি তাঁকে করতে দেবো কেন? আমাকে দিয়ে তো জীবনে কিছু হ'বে না—আমি শুধু এটুকু দেখবো, তাঁর যাতে কোনোভাবে নিজেকে অপব্যয় করতে না হয়—তিনি যাতে তাঁর সম্পূর্ণ সময়, সম্পূর্ণ মন দিতে পারেন তাঁর সৃষ্টির কাজে—

—তাই তুমি তাঁর বিনি-মাইনের সেক্রেটারি হয়েছো বুঝি?

মাধুরীকে ও-রকম একটা ফিলিস্‌টাইনের মত কথা বল্‌তে শুনে রথী ব্যথিত হ'লো। বল্‌লে, আমার কী মূল্য, আমি আর কতটুকু! সিতিকণ্ঠবাবু যে মহান দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন স্বর্গ থেকে—

—স্বয়ং বিধাতার সই-করা লাইসেন্স বুঝি? মাধুরী হেসে উঠলো, ওঃ, তুমি আর তোমার সিতিকণ্ঠবাবু!

রথী খানিকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে তাকিয়ে রইলো সামনের দিকে। তা'র চোখে-মুখে অত্যন্ত একটা করুণ ভাব ফুটে উঠতে লাগলো। মাধুরীর মধ্যে একটা অসম্পূর্ণতা আছে, মনে-মনে সে বল্‌লে, কতগুলো জিনিস ও বোঝে না। বড়লোকের মেয়ে—কাচের ঘরে জীবন কাটাচ্ছে, জীবনের সংস্পর্শে কখনো আসে নি। জীবনের ও কী বোঝে? ও বই পড়ে সময় কাটাবার জন্য, বন্ধুদের সঙ্গে কথা বল্‌বার জন্য—যে-প্রচ্ছন্ন স্রষ্টার বিশাল ব্যথিত আত্মা তার প্রতি লাইনে স্পন্দমান, ও তার কী জানে?

—রাগ করলে নাকি আমার কথায়?

—তুমি যদি ওঁকে একবার দেখতে, মাধুরী, তা হ'লে ওঁর সম্বন্ধে অমন লঘুসুরে কথা বল্‌তে পারতে না।

—কেন, তিনি খুব সুন্দর নাকি দেখতে?

—সুন্দর! জানিনে তোমরা সুন্দর বল্‌তে কী বোঝো।

—কী বুঝি? এই ধরো, তুমি যেমন।

রথীর সমস্ত মুখ টুকটুকে লাল হ'য়ে উঠলো। পকেট থেকে রুমাল বা'র করে' সে মুখ মুছলে। একটু পরে আস্তে-আস্তে, কোনো পবিত্র, গোপন কথা উচ্চারণ করবার মত করে' বল্‌লে, না,

তিনি সুন্দর নন্। তিনি অপরূপ। ধ্যানি বুদ্ধের মত মুখ। কী প্রশান্ত, আত্ম-সমাহিত—যেখানে তিনি আছেন, সেখানে তিনি নেই, কল্পনার কোন্ ঊর্ধ্বলোকে—বল্‌তে-বল্‌তে রথী গুলিয়ে গেলো।

মাধুরী আস্তে-আস্তে বল্‌লে, তুমি তাঁকে খুব ভালোবাসো ?

—ভালোবাসি! আমার ভালোবাসায় তাঁর কী এসে যায়! মানুষের মনের এ-সব ছোট-খাটো ভাবের তিনি অনেক উপরে, অনেক উপরে। তিনি বিচ্ছিন্ন তাঁর ধ্যানের জ্যোতির্লোকে। আমরা কতটুকু তাঁকে বুঝতে পারি, তাঁর নাগাল পেতে পারি! সেদিন আমি হঠাৎ তাঁর ঘরে গিয়ে পড়েছিলুম—তিনি টেবিলে বসে' লিখছিলেন, তাঁর মাথা নোয়ানো—এক অপূর্ব জ্যোতিতে তাঁর চোখ উজ্জ্বল। আমি তাড়াতাড়ি চলে' যাচ্ছিলুম, কিন্তু আমার সাড়া পেয়েই তিনি মুখ তুলে চাইলেন, একটু হেসে হাতের কলম রেখে দিলেন। কী মধুর সে-হাসি!

কথাটার রেশ কাটবার জন্য একটু সময় যেতে দিয়ে মাধুরী বল্‌লে, তিনি দিনরাতই লেখেন বুঝি ?

—পাগল! দিন-রাত যাতে তাঁকে লিখতে না হয়, সে-জন্যই তো—। প্রকৃত লেখার প্রেরণা আসে অন্তর থেকে, জঠর থেকে নয়। এখন থেকে তিনি কেবল তাঁর অন্তর থেকেই লিখবেন। যখন তাঁর খুসি, যেমন তাঁর খুসি। মেস-এর দেনা শোধ দেবার জন্য তো আর তাঁকে গল্প লিখতে বস্‌তে হবে না।

—কেন, তিনি এতগুলো বই লিখেছেন, পয়সা করেছেন নিশ্চয়ই বিস্তর ?

—তোমরা তাই ভাবো! রথী হেসে উঠলো। বাংলাদেশে বই লিখে কী পাওয়া যায় ? রেচেড্। মুখে আনা যায় না। তা'তে কোনো ভদ্রলোকের চলে—

—কেন, শরৎবাবু তো শুনেছি—

—ওঃ, শরৎবাবুর কথা আলাদা। ও-রকম কান্নায়-প্যাঁচ পেঁচে

বই লিখলে হবে না পয়সা। তিনি যে লিখতেন পাঠকদের—পাঠিকাদের বলা উচিত—নাড়ি ধরে'। ও-রকম কখনো লিখবেন সিতিকণ্ঠ গাঙ্গুলি! তাঁর দুঃসাহস, তাঁর নির্ভেজাল স্যানিটি—

—আমার তো তাঁর খানকয়েক বই বেশ লেগেছিলো।

—তোমার মত, মাধুরী, তোমার মত যদি বাংলাদেশের আদ্ধেক লোকও হ'তো, তা হ'লে—

—তাঁর বই লোকে পছন্দ করে না?

—এত বড় প্রতিভাকে কখনো জীবৎকালে কেউ সহ্য করতে পারে জানো, এমন অনেক পাব্লিক লাইব্রেরি আছে যেখানে তাঁর বই যাওয়া বারণ। আজ এত বছর ধরে' লিখছেন—ক'টা বইয়েরই বা এডিশন হয়েছে!

—তাই তো, তা হ'লে তো সিতিকণ্ঠবাবুর মুশকিলই দেখছি।

—কে মনে রাখবে—তাঁর এই দারিদ্র্যের, দুঃখের কাহিনী কে মনে রাখবে? তিনি পৃথিবীকে যা দিয়ে যাবেন, তা তাঁর শ্রেষ্ঠতম অংশ, বিশুদ্ধতম আনন্দ—সেখানে তো মলিনতা নেই।

মাধুরী আর কিছু বল্‌লে না।

সাত

'ভাঙা আয়না' যে ছাপা হচ্ছে এ-খবরটা রথী শেষ পর্যন্ত মাধুরীকে দেয় নি : মনে ভেবে রেখেছিলো, একেবারে বই বেরুলে একখানা নিয়ে গিয়ে বিস্ময়ে তাকে অভিভূত, স্তম্ভিত করে' দেবে। প্রাণপণে সে প্রুফ দেখছে আর রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা কর্‌ছে কবে আস্‌বে সেই শুভদিন। মাধুরী তা'কে সমুদ্র ঝাঁপিয়ে পড়তে বল্‌বে না—না, সুন্দরবনে গিয়ে বাঘ মার্‌তে বল্‌বে না তার জন্য— রথী যেটুকু কর্‌তে পারে, রথী যা-কিছু কর্‌তে পারে, তা—তা সে তা'র হাতে তুলে দেবে, যখন সময় আস্‌বে। একখানা বই, রথীর বই। তা'র চেয়েও বেশি—মাধুরীর বই। কেননা মাধুরী যদি না আস্‌তো তার জীবনে, তা হ'লে তো ও-বই কখনো লেখা হ'তো না, ও যে মাধুরীতেই পরিপূর্ণ, মাধুরী থেকেই উৎসারিত। মাধুরীই তো তাকে সরিয়ে এনেছে সাধারণত্ব থেকে : নিজের প্রাত্যহিক, অভ্যস্ত অস্তিত্বের ঊর্ধ্বে উঠবার তা'র এই যে অভীপ্সা, সে তো মাধুরীরই জন্যে। বইটা যখন সে লিখ্‌ছিলো, মাঝে-মাঝে মাধুরীকে পড়ে' শোনাতো—দু'জনের মধ্যে গোপন, অবরুদ্ধ কত ছোটখাটো কথা, সামান্য ঘটনা—রথী কি নিজেই জান্‌তো সে ও-সব মনে করে' রেখেছে। শুন্‌তে-শুন্‌তে মাধুরী বল্‌তো : যাওঃ, আর পড়্‌তে হবে না। দুষ্টু! বলে' কী-রকম করে', কী-রকম করে' যে চোখ তুলে তাকাতো, ভাব্‌তে রথীর সমস্ত মন ছল্‌ছল্ করে' ওঠে। সে বই আজ বেরোতে চলেছে।

এক সন্ধ্যায় সিতিকণ্ঠ বাড়ি ফিরে এসে চাদরের তলা থেকে বা'র কর্‌লে ব্রাউন পেপারের একটা প্যাকেট। মৃদু হেসে বল্‌লে, বলো তো এটার মধ্যে কী আছে ?

রথীর হৃৎপিণ্ড লাফ দিয়ে উঠ্‌লো। ক'দিন আগে সে 'ভাঙা আয়না'র শেষ প্রুফগুলো দেখে দিয়েছিলো, আজকালের মধ্যেই বই বেরোবার কথা।

—'ভাঙা আয়না'? কবে বেরুলো? বল্‌তে গিয়ে তা'র গলা ভেঙে গেলো।

—এই তো এইমাত্র। চমৎকার করেছে দেখতে। নাও। যেন সিতিকণ্ঠই কোনো দুর্লভ, অমূল্য উপহার দিচ্ছে রথীকে, এইভাবে সে বইগুলো তার হাতে দিলে।

প্যাকেট্‌টা খুলতে রথী অনেক সময় নিলে, এমন কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো তার আঙুলগুলো। বেরিয়ে পড়্‌লো ঝক্‌ঝকে পাঁচখানা বই—একেবারে আন্‌কোরা নতুন, এখনো দপ্তরিবাড়ির গন্ধ রেগে রয়েছে তাদের গায়ে। কী সুন্দর কাগজ, কী সুন্দর ছাপা, কী চমৎকার বাঁধাই।

—উঃ, কী বিউটিফুল হয়েছে দেখতে! রথী একটা ফোয়ারার মত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে নির্লিপ্ত, শান্ত বুদ্ধমূর্তি মৃদু হাস্‌তে লাগলোঃ ছোট পাব্লিশার, যদ্দূর পারে করেছে।

—চমৎকার, চমৎকার করেছে। এর বেশি আমি চাই নে। এত ভালোরও কি আমি যোগ্য। আমার যা লেখা, তা এত সুন্দর করে' কেউ বা'র কর্‌বে, তা কি আমি স্বপ্নেও ভাবতে পার্‌তুম! রথী একখানা বই তুলে নিয়ে নেড়ে-চেড়ে, উল্টিয়ে পাল্টিয়ে তন্নতন্ন করে' তার প্রত্যেক খুঁটিনাটি দেখতে লাগলো—তার জ্যাকেট, ভিতরকার কাপড়, পুটের লেখা, ফল্‌স্‌ টাইটেল পেজ, মার্জিন—গোগ্রাসে সে সব গিল্‌তে লাগালো, ক্ষুধিতের মত, রাক্ষসের মত। একটা পৃষ্ঠা তুলে ধরে' দু' আঙুলের মধ্যে সেটা অনুভব করতে-করতে বললে, কী মোটা কাগজ দিয়েছে দেখেছেন?

—ছাপাটা কিন্তু তত ভালো হয় নি।

—কী যে বলেন, এর চাইতে ভালো আবার ছাপা হবে কী? রথী বইখানা মুখের সঙ্গে লাগিয়ে গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ করলে। আঃ, কী মিষ্টি গন্ধ, মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করে। তার যেন কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিলো না যে এই তার বই, তার 'ভাঙা আয়না'। এ-বই তার, প্রতিটি অক্ষর তার। তার মস্তিষ্কে যা একদিন এসেছিলো অস্পষ্ট হ'য়ে, তা আজ এই যুগল-মলাটের মধ্যে প্রত্যক্ষ, সঙ্কীর্ণরূপে পরিস্ফুট—অক্ষরের পর কালো অক্ষর। কী আশ্চর্য রূপান্তর। টাইটেল-পেজে নিজের নামের দিকে সে একটু তাকিয়ে রইলো—আর সেই উৎসর্গ, সে কেবলি ভেবে অবাক হয়েছে উৎর্গটা ছাপার অক্ষরে কেমন দেখাবে।

শ্রীমাধুরী দেবীকে
দিলাম

উৎসর্গ-পত্রের দিকে রথী বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। ছোট একটি কবিতা। একটি নিখুঁত সম্পূর্ণ লিরিক। আঙুরের মত ছোট, আঙুরের মত নিবিড়। তিনটি ছোট কথায় এত রস থাক্‌তে পারে!

সিতিকণ্ঠ কখন্ যে চুপে-চুপে তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে রথী টের পায় নি। হঠাৎ সিতিকণ্ঠ অত্যন্ত গভীর, অত্যন্ত কোমল সুরে বললে, প্রিয়তমার নামটি দেখছো বুঝি মুগ্ধ হ'য়ে?

রথী অত্যন্ত লজ্জিত হ'য়ে তাড়াতাড়ি বইটা মুড়ে রেখে বললে, না, এই—ছাপাটা একটু দেখছিলাম। বেশ ছেপেছে। তা ওরা আর ক' কপি বই দেবে?

সিতিকণ্ঠ দীর্ঘশ্বাস ফেলে' বললে, আর তো দেবে না।

—সে কী? রথীর মুখ একটু ম্লান হ'য়ে গেলো, পঁচিশখানা না বই দেয় প্রকাশকরা?

সিতিকণ্ঠ হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হ'য়ে বলতে লাগলো, আর বোলো না ব্যাটাদের কথা ছোটলোক! চামার! আলু-পটোলের দোকান না দিয়ে বইয়ের ব্যবসা ফেঁদেছে। বলে কিনা —নতুন অথর, প্রথমেই অত দিতে গেলে চলে না—যদি বিক্রি-টিক্রি ভালো হয় আরে হু'পাঁচখানা দেয়া যাবে না হয়। আমি কি তোমার জন্য কম লড়েছি! বলে'-বলে' মুখে থুতু বেরিয়ে গেলো, ব্যাটারা অনড়। বলে কি, অথর যদি একরাশ বই নিয়ে তাঁর বন্ধুদের বিলোন্ তা হ'লে বই কিনবে কে? আমার এমন রাগ হয়েছিলো, রথী—

—থাক্, থাক্, রথী কুণ্ঠিত হ'য়ে বললে, কী আর এমন হয়েছে। কয়েকজনকে বই উপহার দেবো ভেবেছিলাম, সে যা হোক্ একরকম ব্যবস্থা করা যাবে।

—তুমি ব্যস্ত হোয়ো না, রথী, আমি যদি ব্যাটাদের কান মলে' গুনে-গুনে পঁচিশখানা বই আদায় না করেছি তো—কী বললাম। আমি জোর করে' একটা কথা বললে তা না রেখে সাধ্যি আছে অনাদি দস্তিদারের! ওদের দোকান চলছে কাদের জোরে।

রথী আরো বেশি কুণ্ঠিত হ'য়ে বললে, না, থাক্ আমার জন্যে অত সব হ্যাঙামা আপনি কর্তে যাবেন কেন? থাক্, আমি না-হয় খানকয়েক বই কিনেই নেবো।

—সে-কথা তুমি বলতে পারো বটে। এম্নিও তো মাসে বিশ-পঁচিশ টাকার বই আসে ঘরে। তা ছ্যাখো, কিছু বই কিন্লে একরকম মন্দ নয়, টাকাটা তো তোমার কাছেই ফিরে আস্বে শেষ পর্যন্ত। আর অনাদিবাবু বলেছেন, তুমি নিজে বই কিন্লে পনেরো পার্সেণ্ট কমিশন দেবেন। হ্যাঁ, ছ্যাখো—যদি বই কেনোই, আমাকে দিয়ো কিন্তে, আমি নির্ঘাত পঁচিশ পার্সেণ্ট আদায় করে' নিতে পারবো।

—আপনি আবার কেন আমার জন্য কষ্ট করতে যাবেন ? আমি না-হয় পুরো দাম দিয়েই বই কিন্‌বো।

—কষ্ট! যদি কষ্ট মনে করতুম তা হ'লে কি আর এত করতুম তোমার জন্য! কোন নতুন আগন্তুককে খ্যাতির রাস্তায় খানিকটা এগিয়ে দেয়া—এটাও কি সাহিত্যিকের একটা কাজ নয় ?

—আপনি আমার জন্য যা করলেন—কৃতজ্ঞতায় রথীর কণ্ঠস্বর ভারি হ'য়ে এলো।

সিতিকণ্ঠর চোখের পাতা যেন আবেশে নিমীলিত হ'য়ে এলো। মুখে ফুটে উঠ্‌লো মোক্ষপ্রাপ্ত বুদ্ধের হাসি।—যাক্, প্রথম বই তো বেরুলো, আর ভাবনা কী। একবার যখন গ্রন্থকার হ'তে পেরেছো, ধাঁ-ধাঁ করে' উপরে উঠে যেতে কতক্ষণ। চলো দু'জনে মিলে কোথাও গিয়ে কিছু খাওয়া যাক্। এত বড় একটা ব্যাপার সেলিব্রেট না করলে কি চলে ?

রথী লজ্জায় জড়োসড়ো হ'য়ে গিয়ে বল্‌লে, আজ তো—এখন তো—একটু বেরুবো মনে করছিলাম।

—হ্যাঁ, বেরোতে তো হ'বেই। খাওয়া মানে কি আর বাড়িতে বসে' একটু পাঁঠার ঝোল চাখা। চলো ক্যাণ্টনে যাই, কি ন্যান্‌কিনে—ন্যান্‌কিনের মত চৌ-চৌ আর কোথাও হয় না। খান্ দুই ক'রে' ফাউল-কট্‌লেট আর, ধরো, একটু ডক্-রোস্‌ট্—কী বলো ? বলতে-বলতে সিতিকণ্ঠর চোখের দৃষ্টি উগ্র হ'য়ে উঠ্‌লো।

—কালকে—কালকে ঠিক যাবো, রথী অসহায়ভাবে বল্‌তে লাগলো, আজ একটু বিশেষ—

সিতিকণ্ঠ রথীর মুখের দিকে তাকালো। তারপর হঠাৎ তার ঠোঁটের কোণে-কোণে ফুটে উঠ্‌লো মধুর, সূক্ষ্ম হাসি। ও, বুঝেছি, সিল্কেরমত নরম সুরে সে বল্‌লে, বুঝেছি। কেন ভাই এতক্ষণ লুকোচ্ছিলে আমার কাছ থেকে ? আমি তো আর যেতাম না তোমার সঙ্গে-সঙ্গে।

লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠে রথী চুপ করে রইলো।

—আর লুকোবারই বা কী আছে। অন্যায় তো কর্‌ছো না কোনো। যাবেই তো—আজ তোমার প্রথম বই বেরুলো, আজকের দিনে একবার প্রিয়ার সঙ্গে দেখা না কর্‌লে চলে।

সিতিকণ্ঠর অনুমোদন পেয়ে রথী হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌লো।—তা হ'লে আমি একটু ঘুরে আসি চট্ করে' ?

—বাঃ, এ আবার জিগ্যেস কর্‌তে হয় নাকি ? আমার জন্যে তুমি কিচ্ছু ভেবো না, রথী, তুমি যাও। আমার কী। আমি যা হোক্ একটা বই-টই নিয়ে কাটিয়ে দিতে পারবো সন্ধেটা। ও আমার অভ্যেস আছে। কলকাতায় প্রথম যখন এলুম, কাউকেই তো চিনি নে এ-অরণ্যে—কী করতুম তখন বিকেলবেলায় ? বসতুম একটা বই নিয়ে—কতদিন দশটা এগারোটা বেজে খাবার সময় পার হ'য়ে যেতো, টেরও পেতুম না। সেই পোড়া মেসে এত গরজ তো আর কারো নেই যে ডেকে তুলবে। কোনোদিন হয়-তো খাওয়াই জুটলো না বরাতে। সেই সময়েই তো আমি রাজ্যের যত বই পড়ে' ফেলি—এই, তোমাদের ম্যাক্সিম গর্কি, আর মোপাসাঁ, আর —ডিকেন্স্ আর হুইট্‌ম্যান—আর কী বলে গিয়ে মিল্টন।

—না, না, রথী ব্যাকুলভাবে বলে' উঠ্‌লো, আপনি একা বাড়ি বসে থাকবেন, সে কি হয় ? আপনি একটা ফিল্‌ম্ দেখে আসুন না—এখনো চিত্রায় যাবার সময় আছে বোধ হয়—কি—যদি আপনার ইচ্ছে করে, কোনো হোটেলে—টাকাটা না হয় আজ আমার কাছ থেকে নিন, পরে—আপনার যখন সুবিধে হবে—রথী কথার খেই হারিয়ে ফেলে হাঁপাতে লাগলো। লাল হ'য়ে উঠ্‌লো আর-এক প্রস্থ।

—কী ছেলেমান্‌ষি যে কর্‌ছো, একটু হেসে সিতিকণ্ঠ বল্‌লে, আমার আর কাজ নেই এখন একা-একা হোটেলে বসে' খাই গিয়ে। টাকার একটু মায়া করতে শেখো, রথী। ঈশ্বর যথেষ্ট

দিয়েছেন বলে'ই কি তু'হাতে ওড়াতে হবে? আর তোমার ঐ হতভাগা চাকর—ও যে তোমার সর্বস্ব লু'টে নিচ্ছে, তাও তোমার ভ্রূক্ষেপ নেই। রোজ যে এই টাকাটা সিকেটা অদৃশ্য হচ্ছে—

রথী তাকে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বল্‌লে, থাক্, এখন আর ও-সব বলে' লাভ কী? আপনি চট্ করে' একটা জামা গায়ে দিয়ে নিন। একসঙ্গেই বেরুনো যাক, চলুন। বলে' রথী কাপড় বদ্‌লাবার জন্য তার নিজের ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লো।

তু'জনে একসঙ্গে রাস্তায় বেরুলো। বাস্-এ ওঠ্‌বার আগে রথী আল্‌গোছে কী একটা জিনিস ফেলে দিলে সিতিকণ্ঠর পকেটে। সিতিকণ্ঠ সেটা তুলে এনে দেখ্‌লে, খুব ছোট ভাঁজ করা একটা পাঁচ টাকার নোট।

সিতিকণ্ঠ রথীর দিকে তাকাতেই সে বলে' উঠ্‌লো, দেখুন, এটা যদি এখন ফেরত দিতে চান, তা হ'লে কিন্তু—

সিতিকণ্ঠ সস্নেহে তার কাঁধের উপর একখানা হাত রেখে বল্‌লে, পাগল!

আট

বস্‌বার ঘরে একটা সোফার উপর আধ-শোয়া অবস্থায়, ঘাড়ের, কনুইয়ের নিচে কুশান গুঁজে মাধুরী বই পড়্‌ছিলো। বাঁ হাতে তার বই ধরা আঙুলগুলো মলাটটাকে আঁকড়ে রয়েছে, ডান হাত আল্‌গোছে পড়ে' রয়েছে কপালের উপর। শিয়রের কাছে লম্বা স্ট্যাণ্ডের উপর ঝালরওয়ালা ঢাকনা-দেয়া আলো জ্বলছে ঃ শুধু বইয়ের পৃষ্ঠা উদ্ভাসিত, আর তার ডান হাতের আঙুলগুলি আর মুখের খানিকটা। বাকি ঘর ভরে নীলাভ অন্ধকার।

সেই ছায়ায় ছায়ার মত নিঃশব্দে রথী ঢুক্‌লো। দরজার কাছে এসেই সে থম্‌কে দাঁড়ালো ঃ তার চোখ পড়লো মাধুরীর এলায়িত শরীরের দিকে, খানিক-আলো-এসে-পড়া তার মুখের দিকে—ছোট, সাদা তার হাত—এই অন্ধকারের মধ্যে ছোট একটি আলোর দ্বীপের মত। আর রথী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কী করে' এই ছবি সে নষ্ট করে' দেবে, ভেঙে দেবে এই স্বপ্ন? কত ভাগ্য তার, ঠিক এই মুহূর্তে এসে সে উপস্থিত হয়েছে, ছায়ার মোহে-ঘেরা এই মুহূর্তে—আর মাধুরী দিগন্তের চোখের ছলছলানির মত অস্পষ্ট।

মাধুরী পৃষ্ঠা ওল্‌টালো। মৃদুভাবে, তার হাতের ক্ষীণ আঙুল-গুলো একবার নড়্‌লো, কপালের উপর থেকে স্রস্তকুন্তল সরিয়ে দিতে। যেন নিজেরই অজান্তে, যেন হাওয়ায় ভেসে এসে রথী অবতীর্ণ হলো মাধুরীর সোফার ধারে, তা'র পায়ের কাছে।

আস্তে, স্বপ্নে কথা কয়ে' ওঠ্‌বার মত স্বরে সে ডাক্‌লে, মাধুরী।

মাধুরী চম্‌কে চোখ তুলে চাইলো।—এ কী! তুমি!

আমি, মাধুরী, আমি, রথী বিহ্বলের মত বলে' উঠ্‌লো, আমি আর তুমি। তুমি আর আমি।

মাধুরী রথীকে কখনো এ-রকম করে' কথা বল্‌তে শোনে নি। অবাক হ'য়ে সে তাকিয়ে রইলো তা'র মুখে। আর কী যে ছিলো তার কণ্ঠস্বরে, মাধুরীর হৃৎস্পন্দন হঠাৎ দ্রুত হ'য়ে উঠ্‌লো। একটু চুপ করে' থেকে সে বল্‌লে, দাঁড়াও, বড় আলোটা জ্বালি।

বলে' সে উঠ্‌তে যাচ্ছিলো, রথী তাড়াতাড়ি বলে' উঠ্‌লো, না, এই থাক্, এই তো বেশ আছে। এই ছায়া। এই অন্ধকার। এই আলো। তুমি বোসো ; যেমন ছিলে, তেমনি বসে' থাকো।

—কিন্তু তুমি বস্‌বে না ?

—বস্‌ছি। যেখানে একটা মিশকালো কুশানের উপর মাধুরীর শ্বেত দুটি পা বিশ্রামে স্তব্ধ হ'য়ে ছিলো, রথী একবার সেদিকে তাকালো। মাধুরী তার পা সরিয়ে নিয়ে সোফার আদ্ধেকটা খালি করে' দিলে। মাধুরীর দেহ-উষ্ণ সেই আসনে রথী বস্‌লো, সেই কালো কুশানটাকে তুলে নিলে কোলের উপর।

—কী পড়্‌ছিলে ? রথী জিগ্যেস কর্‌লে।

—টুর্গেনিভের সেই গল্পটা—এসিয়া। কী চমৎকার বলো তো ! পড়তে পড়তে মরে' যেতে ইচ্ছে করে।

—মনে আছে, প্রথম যখন টুর্গেনিভ পড়ি, ঠিক এ-কথা মনে হয়েছিলো, এতদিন কোথায় ছিলুম ! এতদিন বইগুলো পৃথিবীতে ছিলো, আমার হাতের কাছে ছিলো—অথচ আমি পড়ি নি !

—তোমরা টুটা-ফুটার দল যাই বলো, মাধুরী একটু হেসে বল্‌লে, সুন্দর জিনিসের মত সুন্দর কিছুই নয়। টুর্গেনিভ পড়লে মনটা যেমন ভিজে আসে, তেমনি হয় তোমাদের কোনো কুশ্রীতার ছাপওয়ালা আধুনিকের লেখা পড়ে' ?

রথীও একটু হাসলো। কিছু বল্‌লে না। ছেলেমানুষ, মনে-মনে সে বল্‌লে, ছেলেমানুষ। সুখের রঙিন আলোয় ও প্রজাপতি, ও

দুঃখের কী জানে, ব্যর্থতার কী জানে। ও তো বলবেই ও-কথা। ওকে কী করে' বোঝানো যাবে যে কাঁচা মাল যা-ই হোক্, আর্ট হচ্ছে আর্ট : ভালো আর্ট আছে, মন্দ আর্ট আছে, সৌন্দর্যের কী কুশ্রীতার আর্ট বলে' কোনো জিনিস নেই। তা ছাড়া, ও-সব কথা বলতেই কি রথী আজ এসেছে, এসে বসেছে মাধুরীর পাশে এই ছায়ার অন্তরঙ্গতায়, উষ্ণ সান্নিধ্যের আবহে?

একটু পরে মাধুরীই আবার বললে, আমি ভাবছিলুম এ-রকম গল্প কি বাংলায় কেউ লিখবে না কখনো?

—ঠিক একজনের মত কি আর-একজনের লেখা হ'তে পারে?

—তা নয়। কিন্তু এই মধুরতা, এই বিষাদ—আগাগোড়া এই স্বপ্নের ভাব—যাই বলো, এর মতো কিছু নয়। এ-রকম কেউ লিখতে পারে না বাংলায়? তুমি ত্যাখো না চেষ্টা করে'।

—ঠাট্টা করছো?

—বাঃ, তুমি বুঝি আর লিখতে পারো না ইচ্ছে করলে? আগে তো লিখতেই—আজকাল ছেড়ে দিয়েছো নাকি? সিতিকণ্ঠবাবুর প্রতিভার বিকাশ-সাধনের চেষ্টাতেই বড় বেশি ব্যস্ত বুঝি?

—এটা তুমি জেনো, রথী আস্তে-আস্তে বল্‌লে, লেখার দিকে যদি কখনো আমার কিছু হয়, তা সিতিকণ্ঠবাবুর জন্যেই হবে।

—তা আমি বুঝি নে। যার যা হবার তা নিজের জন্যেই হয়, নিজের জোরেই হয়।

একটু চুপচাপ। রথী আগেও লক্ষ্য করেছে, এখনও কর্‌লে, সিতিকণ্ঠর কথা উঠলেই মাধুরী কী-রকম প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গোক্তি না করে' পারে না। এতে তার মনে অত্যন্ত কষ্ট হ'তো। যখন আমরা দু'জন লোককে খুব বেশি ভালোবাসি, সেই দু'জনের মধ্যে ভালোবাসা না-থাকা এক বিষম যন্ত্রণা। কিন্তু, ভাবতে রথীর গর্ব হ'লো, আনন্দ হ'লো, কোথায় উড়ে যাবে মাধুরীর এই ব্যঙ্গ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে, যখন সে শুন্‌বে—যখন সে শুন্‌বে তা'র জন্য সিতিকণ্ঠ কী করেছে?

—তোমার জন্য একটা বই এনেছি, বলে' রথী তার চাদরের তলা থেকে এতক্ষণ সযত্নে লুকিয়ে-রাখা একখানা বই বা'র করলে।

রথী প্রায়ই মাধুরীকে বই-টই এনে দেয়, তাই অসাধারণ কোনো উৎসাহ না দেখিয়ে মাধুরী হাত বাড়িয়ে বইখানা নিলে। কিন্তু বইয়ের মলাটের দিকে তাকিয়েই সে ভয়ানক-রকম চম্‌কে উঠলো। প্রায় খাড়া হ'য়ে উঠে বসে' রথীর দিকে উজ্জ্বল, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বল্‌লে, ভা ঙা আ য় না! তোমার বই!

রথী খুব আস্তে বল্‌লে, তো মা র বই।

বইয়ের পাতা ওল্‌টাতে-ওল্‌টাতে মাধুরীর উৎসর্গ-পত্রে চোখ পড়লো। গলা পর্যন্ত লাল হ'য়ে উঠে সে বল্‌লে, ছি-ছি, এ কী তুমি করেছো?

—কেন, কী দোষ হয়েছে?

মাধুরীর গভীর, আশ্চর্য-সুন্দর চোখ মুহূর্তের জন্য রথীর চোখের উপর ঝল্‌সে গেলো।

—কী অন্যায় তোমার, এখন সবখানে জানাজানি হ'য়ে যাক্ আর কি—

—কী আর জানাজানি হ'বে। সংসারে তুমি একাই তো আর মাধুরী দেবী নও।

—তবু, কী দরকার ছিলো তোমার এটা করবার? মা-বাবাই বা কী মনে করবেন।

—তাঁরা যা জানেন, তাই জানবেন, রথী শান্তভাবে বল্‌লে।

এত স্পষ্ট করে' রথী কখনো বলে নি। স্বভাবত সে ভীরু। কিন্তু আজ তার রক্তে সাহসের ধার এসেছে। আজ সে নগণ্য নয়, তুচ্ছ নয়. আজ সে গ্রন্থকার।

—যদি স্পষ্ট করে' ওঁরা বুঝতে পারেন, রথী আবার বল্‌লে সে তো ভালোই। আর বেশি দেরি নেই, মাধুরী, বেশি দেরি নেই।

মাধুরী মুখ ফিরিয়ে চুপ করে' রইলো। তার বুকের মধ্যে ঘণ্টা বেজে যাচ্ছে, পূজার ঘণ্টা : কোনো পূজার অঞ্জলির মত সে লুটিয়ে পড়তে চাচ্ছে।

খানিক পরে রথী ডাকলে, মাধুরী।

মাধুরী আস্তে-আস্তে মুখ ফেরালে।—বলো।

—তুমি কিছু বলো।

—আমি আর কী বলবো।

—কিছু বলো।

মাধুরী আস্তে-আস্তে তার একখানা হাত এনে রথীর হাতের উপর রাখলে। একটু পরে বললে, এতদিন আমাকে বলো নি কেন ?

—কী ?

—এই বইয়ের কথা ?

—রাগ করেছো সে-জন্যে ?

—করতে পারি তো। কবে শেষ করলে তাও তো আমাকে বলো নি।

—কে জানে বই বা'র করতে পারি কি না-পারি—

—সেই ভয়ে লুকিয়ে রেখেছিলে বুঝি ? ছাপা না-হয় নাই হ'তো, আমি তো পড়তে পার্‌তাম।

—চট্‌ করে' ছাপাবার সুবিধে হ'য়ে গেলো কিনা—সিতিকণ্ঠ-বাবুর সঙ্গে আলাপ হওয়ায়। কী চমৎকার লোক তিনি, তুমি জানো না। গায়ে পড়ে' আমার বই দেখতে চাইলেন, আমি কিছু বলবার আগেই গছিয়ে দিলেন প্রকাশককে। তিনি নিজে নিয়ে গিয়ে ছিলেন বলে', নয় তো আমার মত লেখকের বই কে ছাপতো, বলো।

—তিনি এত বড় হয়েছেন, তিনি যদি একজন নতুন লেখককে হাতে ধরে' টেনে না তোলেন—

—তুমি জানো না, মাধুরী, তাই তুমি ও-কথা বলছো। আমি তো এই সাহিত্যিকদের সঙ্গে মিশে দেখেছি—এরা নতুন কাউকে উঠতে দেখলে প্রাণপণে তাকে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টাই করে। সব জায়গাতেই ক্লিক, ছোট-ছোট স্বার্থের চক্র। উপায় নেই তার মধ্যে ঢোকবার। কিন্তু সিতিকণ্ঠ-দা ও-সবের উপরেঃ আমার বই যে বেরিয়েছে এতে আমার চাইতে তাঁরই যেন বেশি আনন্দ।

—তাঁকে একদিন নিয়ে এসো না আমাদের এখানে।

—নিশ্চয়ই! তাঁর সঙ্গে আলাপ করে' তুমি খুব খুসি হবে, মাধুরী। এমন নরম, মিষ্টি স্বুরে কথা বলেন—

—এর পর যেদিন আসবে, নিয়ে এসো তাঁকে।

—কবে ?

—যেদিন হয়। ধরো—এই সাম্‌নের মঙ্গলবার।

—আচ্ছা, মঙ্গলবারই, তা হ'লে। খুব বেশি লোক-টোক বোলো না কিন্তু—তিনি আবার পাব্লিসিটি ভয়ঙ্কর অপছন্দ করেন।

—না, না, লোক আর কে। আমার তু'একজন বন্ধু হয়-তো থাক্‌তে পারে। উনি চা খান্ তো ?

—তা খান্ বই কি।

—এখন আর ভাবনা কী, তার শিথিল খোঁপাটাকে বাঁ হাত দিয়ে অনুভব কর্‌তে-কর্‌তে মাধুরী বল্‌লে, লিখে যেতে থাকো একটু-একটু করে'।

—হ্যাঁ, লিখবোই তো। তুমি যার জীবনে আছো উপায় কী তার না লিখে।

মুহূর্তের জন্য মাধুরী চোখ নত করলে। তারপর বল্‌লে, ও-কথা কেন বলছো ? লেখা তোমারই জন্য। লিখতে তোমাকে হবে বলে'ই তুমি লিখবে।

—তুমি খুব খুসি হও আমি লিখলে ?

—খুব, খুব খুসি হই।

—তাই হ'বে তা হ'লে। আশা করি এ দিয়েই আমি তোমার যোগ্য হ'তে পারবো।

মাধুরী 'ভাঙা আয়না' খানা তুলে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলে। তারপর বল্‌লে, আর-কিছু চাই নে, তুমি আমাকে তোমার যোগ্য করে' নিয়ো।

নয়

মঙ্গলবার। বিকেলে চারটে না বাজতেই সিতিকণ্ঠ তার কোঁচার খুঁট গলার উপর ফেলে রথীর ঘরে এসে ঢুক্‌লো।—তোমার কাছে নতুন একটা ব্লেড আছে না, রথী?

—আছে, দিচ্ছি। রথী শুয়ে-শুয়ে বই পড়ছিলো, উঠতে যাচ্ছিলো। সিতিকণ্ঠ তাড়াতাড়ি বল্‌লে, থাক্‌, তোমাকে আর কষ্ট করে' উঠতে হবে না—আমি নিজেই নিচ্ছি, সেই ক্ষুরের বাক্স-টার খোপেই আছে তো?

জানলার ধারে ছোট একটি টেবিলে রথীর দাড়ি কামাবার ও অন্যান্য প্রসাধনের সরঞ্জাম, সিতিকণ্ঠ সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো। গালে একবার হাতের উল্টো দিকটা বুলিয়ে বল্‌লে, উঃ, দাড়ির জ্বালায় আর পারি নে। মানুষের মরবার সময় নেই এদিকে, ছ্যাখো, দাড়ি ঠিক গজিয়ে উঠছে সুড়সুড় করে'। সিতিকণ্ঠ আয়নায় একবার মুখ দেখলেঃ কী ছিরিই হয়েছে বদনমণ্ডলের। তোমার আয়নাটা কিন্তু ভাই ফাইন এ কী বলে, তোমার এখানে বসে'ই তো দাড়ি-কামানো সেরে ফেলা যায় গল্প করতে-করতে কী বলো?

—বেশ তো। রথী উঠে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসলো।

—তাই ভালো, সিতিকণ্ঠ ছোট চেয়ারটায় বসে' ক্ষুরে ব্লেড লাগিয়ে নিলে, তোমার এই ঘরটিতে এলেই, রথী, মনটা কেমন প্রফুল্ল লাগে। একটা যেন আলাদা শ্রী আছে তোমার ঘরের। যেন দূরে থেকেও মাধুরী

ঈষৎ লাল হ'য়ে রথী বল্‌লে, কী যে বলেন।

সিতিকণ্ঠ মৃদুহাস্য করে' বল্‌লে, বুঝতে পারি, রথী, সবই বুঝতে

পারি। একদিন আমারও বলে' সে একটা ক্ষীণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌লো জল, জল কোথায় ? সিতিকণ্ঠ গলা ছেড়ে হাঁক দিলে, অর্জুন, অর্জুন।

রথী কুণ্ঠিতভাবে বল্‌লে, অর্জুন ঘুমিয়ে আছে বুঝি দিন্, আমি এনে দিচ্ছি।

হ্যাঁঃ, তুমিও যেমন ! চারটে বেজে গেলো, এখন পর্যন্ত তিনি ঘুমোচ্ছেন ! বাদ্‌শাজাদা !

রথী বিছানা থেকে নেমে পাশের বাথরুম থেকে জল এনে দিলে।

কী-এক চাকরই তোমার হয়েছে, সিতিকণ্ঠ বলে' চল্‌লো, নবাব সিরাজদৌল্লা। কাজের সময় টিকিটির দেখা পাবার জো নেইঃ এদিকে লুটে-পুটে খেলো তো সব।

রথী মৃদুস্বরে বল্‌লে, সে-জন্য আপনি অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? চাকরবাকর অমন দু'টো পয়সা নিয়েই থাকে।

সিতিকণ্ঠ আস্তে আস্তে গালে ফেনা করতে লাগলো। তারপর জুল্‌পির নিচে একটা প্রাথমিক পোঁচ দিয়ে বল্‌লে, ওরা খুব বড়লোক বুঝি ?

—কা'রা ?

—এই—তোমার মাধুরীরা ?

—খুব আর বড়লোক কী ?

—কমই বা কী। মোটরগাড়ি আছে তো।

—তা আছে একখানা।

—আচ্ছা, ওদের বাড়িতে ড্রয়িংরুম আছে ?

রথী হঠাৎ কথাটা বুঝতে না পেরে বল্‌লে, কী আছে ?

—ড্রয়িংরুম। সোফা, ছোট-ছোট টেবিল, পিতলের বাটি—

—হ্যাঁ, ও-রকম একখানা ঘর আছেই তো।

—তাই বলো, তাই বলো, সিতিকণ্ঠ পিছন দিকে মাথা

হেলিয়ে গলার উপর উল্টো পোঁচ লাগালে, ওরা তা হ'লে সোসাইটি, কী বলো?

—কী বল্‌ছেন?

—ওরা—এই তোমরা যাকে বলো ফ্যাশ্‌নেব্‌ল্ সোসাইটি—

—না, না, তেমন আর ফ্যাশ্‌নেব্‌ল্ কী—রথী মনে-মনে কুণ্ঠিত হ'য়ে উঠ্‌লো। কোথায় মাধুরী আর তার সম্প্রদায়ের ফুর্তিবাজ, রংদার, হাস্য-লঘু জীবন—আর কোথায় সিতিকণ্ঠর নিষ্ঠুর, একাগ্র তপস্যার বহ্নিচক্র। মাধুরী যে অপেক্ষাকৃত ধনীর কন্যা সে-জন্য সে রীতিমত লজ্জাবোধ কর্‌তে লাগ্‌লো।

উপরের ঠোঁটে জোরে-জোরে ক্ষুর টানতে-টানতে সিতিকণ্ঠ বল্‌লে, তা মাধুরীর বয়েস কত হবে?

—এই উনিশ-কুড়ি।

—বাঃ, তোমার সমানেই যে প্রায়। মা-বাপ বুঝি খুব মডার্ন্‌, অল্প বয়সে মেয়ের বিয়েতে মত নেই?

—যেমন হয় আজকালকার দিনে। তা ছাড়া একমাত্র মেয়ে—

—একমাত্র মেয়ে! সিতিকণ্ঠ আয়না থেকে চোখ তুলে চাইলো, তা হ'লে তোমার কপালে চাই কি অর্ধেক রাজত্ব

রথী লাল হ'য়ে উঠে বল্‌লে, কী যে বলেন।

—বেশ, বেশ, কৃতমুণ্ডন্ চিবুকে সিতিকণ্ঠ একবার হাত বুলোলে, তা মাধুরী এখন পড়্‌ছে বুঝি?

—এই তো বি-এ দেবে সাম্‌নের বার।

—বি-এ দেবে! চাই কি পাস করে'ও যাবে?

রথী ক্ষীণ হেসে বললে, ভালোরকমই পাস করবে। আই-এ-তে জলপানি পেয়েছিলো। আমার মত ছাত্র তো আর নয়।

—খুব তুখোড় বুঝি?

—লোকে তো তাই বলে।

—হুঁ। যাই বলো, নতুন ব্লেড দিয়ে কামাবার মত আরাম

কিছু নেই। উঃ, বাঁচলাম। আত্মপ্রসন্নভাবে সিতিকণ্ঠ আয়নায় তার সত্তকামানো পরিচ্ছন্ন মুখের দিকে তাকালে, দাড়ির জ্বালায় যেন মরে' যাচ্ছিলাম। তা আমার ছাখো অত সময়ই হয় না— আর, একবার লিখতে আরম্ভ করলে তো সবই ভুলে যাই।

দেয়ালে ব্র্যাকেটের উপর একখানা ধবধবে ভাঁজ-করা তোয়ালে ছিলো, সেটা পেড়ে এনে সিতিকণ্ঠ ভালো করে' মুখ মুছলো।— সেই জন্যই, ছাখো, পৃথিবীর যত বড় সাহিত্যিক, সবারই দাড়ি আছে। অত হ্যাঙামা করা কি আর লেখকের পোষায়। রবি ঠাকুরই বলো আর বার্নার্ড্ শই বলো, আর—হ্যাঁঃ, টল্‌স্‌টয়ই বলো। আমি তো ভাবছি তিরিশ বছর বয়েস হ'লেই দাড়িটা রাখতে আরম্ভ করবো। আর ভালো লাগে না এ-যন্ত্রণা। সিতিকণ্ঠ একটা ক্রিমের পট কাছে টেনে এনে ছিপি খুললে, বাঃ, সুন্দর গন্ধ তো। দেখি একটু মেখে। সিতিকণ্ঠ আঙুল ডুবিয়ে এক খাবলা তুলে এনে মুখে মাখতে লাগলো : কত দাম ভাই এটার ?

—কী যেন। টাকা দেড়েক হ'বে।

—দেড় টাকা! বলো কী ? নাঃ, তোমাকে ঠিকই ভুতে পেয়েছে। নীহারিণীর দাম তো ছ' আনা মোটে। তাও তো বেশ ভালো। আমি ব্যবহার করে' দেখেছি—একটা স্যাম্পল্ পেয়েছিলাম একবার। তা বলেই বা লাভ কী—কাঁচা বয়েসে পয়সা পেয়েছো হাতে, একটু না ওড়ালেই বা চলে কী করে'। সিতিকণ্ঠ ক্রিমের গন্ধে ম-ম করতে লাগলো।

আয়নার দিকে আরো একবার তাকিয়ে সে বললে : মাধুরী দেখতে কেমন ?

—ভালোই—মানে, এই মন্দ নয় আর কী।

—আর খুব স্মার্ট বুঝি ?

—যেমন আজকালকার মেয়েরা হ'য়ে থাকে।

—সাহিত্যের দিকে ঝোঁক আছে নিশ্চয়ই ?

—ইংরিজিই বেশি পড়ে। বাংলা সাহিত্য আমিই ওকে পড়িয়েছি—আপনার লেখার খুব ভক্ত।

—মেয়েরা কেন আমার লেখা অত ভালোবাসে বুঝতে পারি নে। রোমান্সের গন্ধ তো নেই আমার লেখায়। সিতিকণ্ঠ উদাসীনভাব উঠে দাঁড়ালো—কই, তুমি যে ঠায় বসে'ই আছো!

—তাড়া কী, সবে তো চারটে বাজলো। অর্জুনকে ডেকে চায়ের কথা বলি।

—আঃ, চা! তোমার সঙ্গে থাকতে-থাকতে, রথী, আমার রীতিমত নবাবি মেজাজ হ'য়ে পড়ছে। ঠিক চারটেয় চায়ের বাটি না এলেই হাই উঠ্‌তে থাকে।

—সেটা আর এমন দোষের কথা কী ?

—ও-সব অভ্যাসের মোহে পড়্‌লে আমাদের চলবে কেন ? আমাদের যে সর্বপ্রকার মুক্ত থাকৃতে হ'বে। এমন হ'বে যে যা-কিছু পাওয়া যাচ্ছে, ভালো—না পাওয়া গেলেও কিছু এসে যায় না। কোনোটাতেই জড়িয়ে পড়লে চলবে না। সেই তো শিল্পীর নির্লিপ্ততা।

রথী মুগ্ধ হ'য়ে বললে, আপনি ইচ্ছা করলেই চা ছেড়ে দিতে পারেন ?

—এক্ষুনি, এই মুহূর্তে। তুমি আমাকে মনে করো কী ? লোকের কাছে আমার অনেক বদ্‌নাম শুনবে—আমি নেশা করি। সঙ্গে সঙ্গে এক অপার্থিব জ্যোতিতে সিতিকণ্ঠর মুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো, মানে—হ্যাঁ, শক্‌ড্‌ হোয়ো না, সবরকম নেশা আমি করেছি। সেই তো এক্স্‌পিরিয়েন্স্‌, জীবন। ভালো ছেলে হ'য়ে ঘরে বসে' থাকলে আমাদের চলে! কিন্তু তাই বলে' আমি কি নিজকে কোনো জিনিসের মধ্যেই আবদ্ধ হ'য়ে পড়তে দেবো ? পাগল। তা হ'লেই তো নিজকে সঙ্কীর্ণ করে' ফেললাম, ছোট

করে' ফেললাম। অন্তরের সেই নিঃস্পৃহতা না থাকলে কখনো বড় শিল্পী হওয়া যায় ?

রথী মুগ্ধ হ'য়ে শুন্‌ছিলো। হায়রে,আর একবেলা চায়ের একটু দেরি হ'য়ে তা'র ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, একদিন তিরিশটার বদলে কুড়িটা সিগারেটে চালাতে হলে তার কান্না পায়!

সিতিকণ্ঠ তা'র মুখের দিকে তাকিয়ে প্রসন্ন দেবতার মত মৃদু হাসলো।—যা দেখছি, দেবতা যেন ভক্তের প্রতি কৃপা করে' মানুষের স্বরে কথা কইলেন, যা দেখছি, চায়ের মৌতাতটা আমাকে ভালো করে'ই ধরিয়ে ছাড়বে। সিতিকণ্ঠ দরজার দিকে এগোতে লাগলো। দরজার কাছে এসে হঠাৎ থেমে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে বললে, হ্যাঁ, ভালো কথা, তোমার একটা সিল্কের পাঞ্জাবি-টাঞ্জাবি কিছু আছে? বোলো না ভাই দুঃখের কথা, ঐ মোড়ের ডাইং-ক্লিনিং-এ কতগুলো জামাকাপড় আর্জেণ্ট কাচাতে দিলুম—কাল দেবার কথা, আজ বলে, কিনা, দু'দিন দেরি হ'বে। ছাখো একবার কাণ্ড—পয়সায় পয়সা নষ্ট—তা'র উপর আজ যে ভদ্রলোকের বাড়িতে পরে' যাবো, এমন একটা জামা নেই। তোমার যদি—

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আমার একটা গরদের পাঞ্জাবি আছে, একেবারে নতুন, সেটা—

—তা একটা হলে'ই হয়। আমার আর অত সাজগোজের দরকার কী? আমি তো আর—

মুখ টিপে হেসে সিতিকণ্ঠ দরজার বাইরে চলে' গেলো।

দশ

সন্ধ্যার একটু আগে দু'জনে বেরুলো একসঙ্গে। গলির মোড়েই একটা কাগজের স্টল, সিতিকণ্ঠ দাঁড়িয়ে গেলো। বললে, একটু দাঁড়াও ভাই, কী-কী কাগজ বেরুলো একটু দেখে নিই।

সিতিকণ্ঠের একটা অভ্যেস ছিলো, যে-সব কাগজ সে পেতো না, স্টলে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সেগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে নিতো— সাড়েছ'টাকা দামের মাসিক 'মহাভারত' থেকে আরম্ভ করে' এক পয়সার সাপ্তাহিক 'হ্যাঙ্‌লা' পর্যন্ত। সাময়িক সাহিত্য সম্বন্ধে তার একটা পৈশাচিক ক্ষুধা ছিলো—কোথায় কার কোন্ নতুন গল্প বেরুলো, কোন্ সাপ্তাহিক তার কোন্ সমব্যবসায়ীকে গাল দিয়ে নর্দমা-শায়ী করলে, কোন্ সাপ্তাহিকই বা তার আকাশস্পর্শী স্তুতি ছাপলে—তা ছাড়া নাট্যজগতের, ফিল্‌ম্-জগতের চুটকি খবর, সাহিত্যিক সভা-সমিতির বিবরণ—সব তার খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়া চাই। এখন পর্যন্ত অখ্যাত কোনো প্রকাশক বাংলা নভেল ছাপছে কিনা, তা জানবার জন্য সবগুলো মাসিকের বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠা তন্ন-তন্ন করে' দেখা চাই। রথী প্রথমটায় একটু প্রতিবাদ করেছিলো। বলেছিলো : রাস্তায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অত কী দেখবেন—কোন্‌গুলো আপনার দরকার বলুন, কিনে নিয়ে যাচ্ছি।

—ও বাবা, সিতিকণ্ঠ বলেছিলো, সবগুলো কাগজ কিনতে গেলে তো দু'দিনেই ফতুর। তা' ছাড়া, কেনবার মত কাগজ একটাও নয়। ভালো কাগজগুলো তো সবই আছে—অন্যগুলোর উপর একটু চোখ বুলিয়ে নেয়া—এই যা।

—কিন্তু অত ঘাটাঘাঁটি করলে দোকানি যদি—

সিতিকণ্ঠ হেসে বলেছিলো, দোকানি! আমাদের রামচরণ। ও আমাকে কিছু বলবে? তুমিও যেমন। ও আমাকে চেনে না? সেদিন বলছিলো—আপনার জন্যেই তো একরকম বেঁচে আছি। যে-যে কাগজে আপনার লেখা থাকে, সেগুলোরই তো বিক্রি।

তারপর রথী আর আপত্তি করে নি। সন্ধ্যের দিকে দু'জনে যখন বেরোয়, রোজই প্রায় স্টলের কাছে এসে একটু দাঁড়াতে হয়। আজ বুধবার, 'জয়ঢাক' বেরুবে; আজ শনিবার, 'রঙ্গরস' আর 'দুর্মুখ' আর 'চুনকালি' বেরোবে; আজ সোমবার; আজ 'ছায়ালোক' আর 'মজলিশ' আর 'পাদপ্রদীপ'—সিনেমা-থিয়েটারের কাগজগুলো বেরোবে—একটাও সিতিকণ্ঠর না দেখলে চলে না। আর বাংলা মাসের প্রথমদিকে—যখন নানা দলের, নানা ওজনের, নানা রঙের মাসিকগুলো বেরোতে থাকে—সিতিকণ্ঠ চাই কি কোনো-কোনোদিন আধ ঘণ্টাই কাটিয়ে দিলে মাসিক ঘেঁটে-ঘেঁটে। রথীর ভারি লজ্জা করে: তার যেন মনে হয়, দোকানির মুখে অপ্রসন্নতার ছায়া পড়েছে—যদিও সিতিকণ্ঠর গল্পের জোরেই সে খেয়ে-পরে' বেঁচে আছে। সে উস্‌খুস্ করে; কেবলই যাবার জন্যে তাড়া দেয়, আর সিতিকণ্ঠ কেবলই বলে, এই তো, দাঁড়াও—আর-একটু।

আজও রথী মৃদুস্বরে বলতে গেলো, এখন থাক না-হয়—

—এই তো, আধ মিনিট, সিতিকণ্ঠ বললে, 'হ্যাঙলা' আর নতুন কাউকে ধরলে কিনা, সেইটে একটু দেখে নেবো শুধু। আমার ভাই মাঝে-মাঝে লাইট লিটারেচার খুব ভালো লাগে—এক-এক সময় মাথাটা এমন ভারি হ'য়ে থাকে—গল্প লেখা কি সোজা কাজ! হ্যাঁ, দাও দেখি একটা সিগ্রেট। দেশলাই? আছে আমার কাছে। ঐ 'হ্যাঙলা' খানা একটু তুলে আনো না ভাই। সিতিকণ্ঠ দেশলাইয়ের আলো দু-হাতে আড়াল করে' সিগ্রেট ধরালে। হ্যাঁ, এইবার একটু খুলে ধরো তো—মাঝখানের পৃষ্ঠাটায় চট্ করে' একটু চোখ বুলিয়ে নিই।

রথী কাগজটা সিতিকণ্ঠর হাতে দিতে গেলো, সিতিকণ্ঠ বললে, না, তোমার হাতেই থাক্, অমনি করে' থাকো একটু—সিগ্রেটটা খাচ্ছি কিনা, সিগ্রেট ঠোঁটে চেপে ধরে' রাখতে গেলেই আমার নাকে-চোখে ধোঁয়া গিয়ে এক বিতিকিচ্ছি কাণ্ড হয়।

রথী খুলে ধরে' রাখলো কাগজটা, সিতিকণ্ঠ চোখ বুলিয়ে যেতে লাগলো কলমের পর কলম, নতুন খইয়ের মত গরম, টাটকা গালাগালের উপর দিয়ে।

এমন সময় পিছন থেকে সিতিকণ্ঠর কাঁধের উপর একখানা হাত পড়লো।—কী খবর।

সিতিকণ্ঠ মুখ ফিরিয়ে বললে, আরে!

শ্রীনিবাস হালদার। বই লেখে। নাম আছে তার বাজারে। বাজারের সবচেয়ে ধনী ও বড় প্রকাশক তার বই প্রকাশ করে' থাকে। দুষ্ট লোকে এই নিয়ে নানা ইঙ্গিত করে—কোথায় নাকি এর ভেতর কি একটা গোল আছে। কিন্তু গোল আর এমন কী: লেখকের যদি খুসি হয় তা হ'লে সে লাখপতি প্রকাশককেই বা তার প্রথম বই গভীর বন্ধুত্বের অজুহাতে উৎসর্গ করতে পারবে না কেন? গভীর বন্ধুত্ব কি প্রকাশকের সঙ্গে হ'তে পারে না?—হ'লোই বা একদিনে? যাই হোক, শ্রীনিবাসের কীর্তি অনেক। আর একবার কলকাতায় সবাই জেনে গেলো যে লণ্ডনের অবজার্ভার পত্রিকায় তার 'যাই হোক্ না' নামের গল্পের বইয়ের দু'কলমব্যাপী সমালোচনা বেরিয়েছে; পরে বোঝা গেলো যে ওটা একটা রাজনীতির প্রবন্ধ, যার নাম 'whatever it is'। কোন এক দৈনিকের আপিসে শ্রীনিবাসের এক বন্ধু ছিলো; সে এই রসিকতা করেছিলো তার সঙ্গে—করতে পেরেছিলো। যাই হোক্, এ-ধাপ্পা ফাঁস হ'য়েও শ্রীনিবাসের কিছু ক্ষতি হয়নি; বাংলা সাহিত্যের জগতে এক লেখা বন্ধ করে' রাখা ছাড়া আর কিছুতে কোনো ক্ষতি হয় না। নোবেল প্রাইজ পেতে হ'লে কী-কী করতে হয়, সে তার

খোঁজ-খবর নিচ্ছে আজকাল। একজন ভালো ইংরিজিওয়ালা লোক খুঁজছে যাকে দিয়ে তর্জমা করানো যেতে পারে তার বই। বার্নার্ড শ যখন বম্বেতে এসে জাহাজে ছিলেন তাঁকে এক তার করেছিলো—তার মর্ম এই যে পিউরিটানরা আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে উচ্ছন্নে দিতে চাচ্ছে—আপনি তাকে উদ্ধার করুন ঃ লোকে বলে, নির্ভুল ইংরিজি লিখবার এমন একটা সুযোগ সে ছাড়তে চায় নি। একবার রবিঠাকুরকে গিয়ে বলেছিলো, আপনার 'শেষের কবিতা' খানা বেশ বই হয়েছে। আরো লিখতে থাকুন, এতদিনে আপনার হাত খুলছে। অনেক তার কীর্তি, মস্ত লেখক সে। চমৎকার দেখতে ঃ বড়-বড় চোখ, চোখে চশমা, বাবড়ি চুল, তার ছবি ছাপা হয়েছে 'জরদ্গব' পত্রিকায়। সব সময় সে ছটফট করে, তড়বড় করে, সব সময় সে ভয়ঙ্কর ব্যস্ত —যেন সে কী প্রচণ্ড কাজ করছে—পাছে অন্য-কেউ তাকে একতিলও কমিয়ে ছ্যাখে, সে-জন্য নিজেকে সে ফাঁপিয়ে তুলছে সব সময়।

শ্রীনিবাস সহাস্যে সিতিকণ্ঠর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, কী রে, কোথায় থাকিস আজকাল ?

সিতিকণ্ঠ তার হাত ধরে' বললে, আয়, একটু এদিকে আয়— কথা আছে তোর সঙ্গে। ছ'জনে এগিয়ে কয়েক গজ দূরে গিয়ে দাঁড়ালো।

—তারপর, তোকে যে চেনাই যাচ্ছে না একেবারে! গরদের পাঞ্জাবি, চকচকে জুতো—আর মুখেরও যেন একটু ভোল ফিরেছে। ব্যাপার কী, বল্ তো।

সিতিকণ্ঠ সিগ্রেটে এক টান দিয়ে বললে, ব্যাপার আর কী, দিন চলে' যাচ্ছে কোনো রকমে।

—তোর সেই মেস্-এ একদিন গিয়ে শুনলুম উঠে গেছিস। আবার আড্ডা গাড়লি কোথায় ?

—না, এবার আর কোনো আড্ডা নয়, ভাই ; এবার বাড়ি নিয়েছি একটা।

—বাড়ি ! হঠাৎ এই ঘোড়ারোগ !

—ভেসে-ভেসে বেড়াতে আর ভালো লাগে না। শরীরটাও খারাপ হয়ে পড়ছিলো—

—বেশ, তা এক কাণ্ড করে' বসে' আছিস, আমি কিচ্ছু জানি নে। কোথায় নিলি বাড়ি ?

—এই তো এই গলিতেই। ঐ যে সাদা বাড়িটা দেখছিস, বারান্দা থেকে কাপড় ঝুলছে, তারই দোতলার ফ্ল্যাট। বারোর-বি।

—দেখতে তো বেশ ভালোই মনে হচ্ছে বাড়িটে।

—তা একরকম মন্দ নয়। দু'খানা বড়-বড় ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম, কল, ইলেকট্রিক লাইট, দক্ষিণটা খোলা—আলো হাওয়া প্রচুর : ভাড়াও বেশি নয়—পঁয়ত্রিশ টাকা মোটে।

শ্রীনিবাস সিতিকণ্ঠর দিকে মিটমিট করে' তাকিয়ে বললে, কার মাথায় হাত বুলোচ্ছিস বল্ তো সত্যি করে' ?

সিতিকণ্ঠ ম্লান হেসে বললে, সে-কপাল নিয়েই যদি আসবো পৃথিবীতে, তা হ'লে এত দুঃখ পাবো কেন ? যার ধাতে যা নেই তাকে দিয়ে তা হয় না। চেষ্টা তো করি—পারি কই। এই তো শুনলুম প্রাণকুমার কাঞ্জিলাল নাকি কোন্ ব্যবসাদারের জীবনচরিত লিখে দু'হাজার টাকা পেয়েছে। আমাদের কপালে চিরকেলে একাদশী। তা সে-দুঃখ করে' আর লাভ কী।

—তোর আর এখন দুঃখ কী, বেশ তো আছিস মনে হচ্ছে।

সিতিকণ্ঠ গভীরভাবে হাসলো।—কোনোরকমে গুন টেনে চলা আর কি। বাড়িটা নিলুম—শরীরটা যদি একটু সারে। টাকার কথা ভেবে আর কী হবে—এতদিন যদি চলতে পারলো, চলে' যাবেই একরকম করে'। একখানা বই লিখে থোকে পাঁচ-শো টাকা পেলুম—

শ্রীনিবাসের মুখ হাঁ হ’য়ে গেলো। বলিস কী? কে দিলে তোকে এত টাকা?

সিতিকণ্ঠ গলা খাটো করে’ বললে, পেয়েছি ভাই এক জায়গা থেকে, কাউকে বলিস্ নে কথাটা। তা ঐ ভর্সাতেই নিয়েছি বাড়িটা যে ক’দিন চলে চলুক। এমন যদি হয় যে আর টানতে পার্ছি নে, আবার মেস্-এ উঠে এলেই হবে। তবু তো দু’দিন হাত-পা ছড়িয়ে একটু আরাম করা গেলো।

শ্রীনিবাস তার ঈর্ষা লুকোবার কিছুমাত্র চেষ্টা না করে’ বললে, কী সুখেই আছিস ভাই, গাল-টাল দিব্যি ভরে’ উঠেছে।

—তা মন্দ নয় নেহাত। আসিস একদিন সময় করে’।

—এখন যাচ্ছিস কোথায়?

সিতিকণ্ঠ যেন খুব অনিচ্ছুকভাবে বললে, নিমন্ত্রণ আছে এক বাড়িতে—চায়ের।

—কোথায় রে? মনের কোনো ভাব গোপন করবার ক্ষমতাই শ্রীনিবাসের ছিলো নাঃ তার কণ্ঠ-স্বরে স্পষ্ট ফুটে উঠলো কৌতূহল।

—এই ভবানীপুরের দিকে। ল্যান্স্‌ডাউন রোড।

শ্রীনিবাসের চোখ বিস্ফারিত হ’লো। সে তো বড়লোকের পাড়া! সেইজন্যেই এত সাজগোজ!

আর বলিস্ কেন। এক মেয়ে লিখেছে উচ্ছ্বসিত চিঠি, মাধুরী না কী নাম, বই পড়ে’ মূর্ছা গেছে, এখন আমাকে যেতেই হবে তার বাড়িতে। পারিনে আর ভক্তদের জ্বালায়।

একটা অত্যন্ত স্থূল রসের পীড়নে শ্রীনিবাসের নিচের ঠোঁটটা একটু ঝুলে পড়লো। তাই বল্! একেবারে ষোলো কলা পূর্ণ। মাধুরী নামটি কিন্তু বেশ। শ্রীনিবাস পিছনে তাকিয়ে একবার অদূরে অপেক্ষমান রথীর দিকে তাকালো। তা উটিও যাচ্ছে নাকি তোর সঙ্গে?

মার্টারের মত ভঙ্গিতে সিতিকণ্ঠ ঈষৎ কাঁধ-ঝাঁকুনি দিলে।—জীবনে অবিমিশ্র সুখ কোথায় ভাই ?

শ্রীনিবাস ভুরু কুঁচকে জিগ্‌গেস করলে, ও কে ? সব সময় দেখি তোর পিছে-পিছে ঘুরছে ফেউয়ের মত।

—আর বলিস নে—পাড়ার এক ছোঁড়া, অকালে নিজের মাথাটি নিজে চিবিয়ে খেয়েছে—আসে এক পেয়ালা চায়ের লোভে।

—ভালো জুটিয়েছিস্ যা হোক্। তোর পড়বার জন্য কাগজ মেলে' ধরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে। জুতোও বুরুশ করে' দেয় নাকি ? শ্রীনিবাস উচ্চহাস্য করে' উঠলো।

—এই আস্তে, আস্তে। তোকে কী বলবো, এমন আপদ জুটেছে, এক মুহূর্ত স্বস্তিতে থাক্‌বার উপায় নেই। এই তো ছাখ না—চলেছি এক জায়গায়, ও-ও যাচ্ছে সঙ্গে-সঙ্গে। ছিনে-জোঁকের মত লেগে আছে সব সময়।

—তুই কিছু বলিস্ নে ? সব সহ্য করিস্ ?

—এক ফোঁটা আত্মসম্মান যার নেই, তাকে আর কী বলা যায়। তাকে কিছু বলতেও ঘেন্না করে। তা আসে—দিই এক-আধ পেয়ালা চা, বসে' থাকে চুপ করে'। ছেলেটা এমনিতে বেশ ভালো, মনটা সাদা। আচ্ছা—আসিস কিন্তু একদিন।

শ্রীনিবাসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাড়াতাড়ি রথীর কাছে এসে সিতিকণ্ঠ বললে, চলো, চলো শিগ্‌গির। দেরি হ'য়ে গেলো বুঝি ? আর এই শ্রীনিবাসটা এত বক্‌তেও পারে—ঐ তো বাস এসে গেছে—চলো, চলো।

দু'জনে বাস-এ উঠলো।

এগারো

এই, তা হ'লে, ড্রয়িংরুম।

ঢোকবার আগে, দরজার কাছে একটু দাঁড়িয়ে, সিতিকণ্ঠ এক ব্যাপক দৃষ্টিতে সমস্তটা দেখে নিলে। ঠিক সে যেমন ভেবেছিলো—শুধু, তার চেয়েও সুন্দর। সোফায়, চেয়ারে—কী অনায়াস, সহজ ভঙ্গিতে বসে' কয়েকটি মেয়ে-পুরুষ; আলো ঝরে' পড়ছে রঙিন ঢাকনার আবরণে নরম হয়ে, নিঃশব্দে ঘুরছে পাখা, ঝকঝক করছে লাল সিমেন্টের মেঝে। তাদের আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে আলাপের মৃদুগুঞ্জন স্তব্ধ হ'য়ে গেলো। সবাই উঠে দাঁড়ালো তাদেরকে দেখে: এগিয়ে এলেন একটি মাঝ-বয়েসি মহিলা, আর তাঁর পিছনে এলো ফিকে-সবুজ শাড়ি পরা লম্বা ছিপছিপে একটি মেয়ে।

রথী বললে, এই মাধুরী। আর এই মাধুরীর মা। আর ইনি সিতিকণ্ঠ গাঙ্গুলি।

ধ্যানি বুদ্ধের ওষ্ঠাধর ঈষৎ হাস্যে স্ফুরিত হলো।

সুধারানি বললেন, আসুন। এত খুসি হলাম, আপনি আমাদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পেরেছেন।

ধ্যানী বুদ্ধের মুখ প্রশান্ত হাস্যে আভাময় হ'য়ে উঠলো।

—এঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। লতিকা দত্ত, ইন্দুমতী চাটার্জি—মাধুরীর কলেজের বন্ধু। মোহিত সরকার, মাধুরীর মামাতো ভাই। রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, মিহির মজুমদার। সবাই আপনার লেখার ভক্ত।

একটা অস্ফুট মর্মর উঠলো চারদিক থেকে।

সবাই বসলো। মাঝখানে একটা সোফায় সিতিকণ্ঠ, তার

একপাশে সুধারানী আর অন্যপাশে মাধুরী; মাধুরীর পাশে মোহিত; উল্টো দিকে একটা সেটিতে লতিকা আর ইন্দুমতী; তাদের কাছাকাছি ছোট গদিআঁটা চেয়ারে রাজেন আর মিহির— আর রথী বসলো এক কোণে নিচু একটা অটোমানে। কয়েক মুহূর্ত, অনেকগুলো চোখ সিতিকণ্ঠর উপর। নিবদ্ধতারপর আস্তে-আস্তে কথাবার্তা আরম্ভ হ'লো।

সুধারানী ভদ্রতা করে' বললেন, আপনার অনেকগুলো সময় আমরা নষ্ট করলুম—

তিনি আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, মাধুরী মাঝখান থেকে বলে' উঠলো: আপনি এই সন্ধেবেলাতেও বাড়ি বসে' লেখেন না নিশ্চয়ই?

সিতিকণ্ঠ বললে, তা লেখা যখন আসে, অত কি আর সময়ের জ্ঞান থাকে। অন্য যে-কোনো কাজ বাঁধা সময়ে করা যায়: লেখার জন্যে মনের একটা বিশেষ অবস্থা দরকার—সে শুভ সময় কি হারালে চলে!

মাধুরী বললে, এখন কি কিছু লিখছেন?

—না। একটা প্রকাণ্ড উপন্যাসে হাত দেবো ভাবছি, তার আগে কিছুদিন স্তব্ধ হ'য়ে আছি—মনটাকে নিচ্ছি তৈরি করে'। বিরাট বই হবে—

—Forsyte Saga-র মত?

সিতিকণ্ঠ ঈষৎ মাথা নত করে' একটু চোখ বুজলো। অস্পষ্ট একটি মৃদু হাসি ঠোঁট থেকে উঠে ছড়িয়ে পড়লো তার সারামুখে।

—আইরিনিকে আপনার কেমন লাগে?

সিতিকণ্ঠ চোখ খুলে মাথা একদিকে কাত করে' তার হাসিটিকে স্পষ্ট করে' তুললো: যেন সল্‌তে উস্কে দেবার পর উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো আলো।

* * *

লতিকা। কী-রকম dreamy চোখ—না ?

ইন্দুমতী। But I can't like his বাবরি।

লতিকা। He does look an artist, doesn't he ?

ইন্দুমতী। মুখে চোখে একটা সিরিনিটি আছে বটে।

লতিকা। কিন্তু ওঁর মেয়েগুলো সব সময় ও-রকম ছেলে-ছেলে করে' পাগল হয় কেন ? ছেলে হওয়া কি না-হওয়ার মধ্যে কী আছে ?

ইন্দুমতী। জিগ্‌গেস কর না।

* * *

রাজেন। ইন্‌স্‌টিটিউটে একবার দেখেছিলুম। চমৎকার আবৃত্তি করতে পারেন।

মিহির। He has a rich voice।

রাজেন। ওঁর গল্প নাকি ওঁর মুখ থেকে শুনলে আরো অনেক ভালো লাগে।

মিহির। কী সব ভীষণ গল্প লেখেন ! অমন নিষ্ঠুরতা—

রাজেন। Tetrible realist ওঁর মত আর কে আজকাল লেখে বাংলা-দেশে।

মিহির। উনি কি কবিতাও লেখেন ?

রাজেন। কই, দেখেছি বলে' মনে পড়ে না তো। আর দু-লাইন মেলাতে পারা—সেটা এমনই বা কী ব্যাপার। ও-সব মিনমিনে পদ্যের দিন চলে' গেছে।

মিহির। হ্যাঁ, ও-সব আইডিয়্যালিজ্‌ম্‌ কি আজকাল আর চলে ! এই বাস্তবতার যুগে—

রাজেন। আস্তে, আস্তে। ওঁকে একদিন আমাদের ক্লাবে নিয়ে গেলে কেমন হয় ?

মিহির। তোমাদের তো খেলার ক্লাব—

রাজেন। তা'তে কী ? সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা সবাই

interested, উনি কিছু বলবেন আধুনিক সাহিত্যের বাস্তবতা সম্বন্ধে। আমাদের ক্যারমের ফাইনেলের দিন ওঁকে নিয়ে গেলে কেমন হয়?

মিহির। ক্যারমের—

রাজেন। হ্যাঁ, তাই বেশ হবে। ছেলেরাও উৎসাহ পাবে, আর…

*　　　　*　　　　*

মোহিত এগিয়ে এলো লাল রঙের একটা সিগ্রেটের কৌটো নিয়ে।—আপনি স্মোক করেন?

—একেবারে যে না করি তা নয়।

মোহিত কৌটোটা খুলে সিতিকণ্ঠর সামনে টিপয়ের উপর রাখলে।—নিন্।

মোহিত যতক্ষণ পকেট থেকে দেশলাই বা'র করছে, সিতিকণ্ঠ হাতের মোটা বেঁটে সিগ্রেটটার নামটা দেখে নিলে চট্ করে'। খুব একটা 'হাই ক্লাস' নাম—ভয়ঙ্কর দামি সিগ্রেট। খেতে না জানি কেমন লাগবে।

উপরের দিকে একবার তাকিয়ে সিতিকণ্ঠ বললে, পাখাটা একটু বন্ধ করে' দেবেন?

মোহিত ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে তার ছু'হাতের মধ্যে আড়াল করে' দেশলাই জ্বালিয়ে আলোটা সিতিকণ্ঠর মুখের কাছে ধরে' বললে, এই নিন্।

সিগ্রেট ধরিয়ে সিতিকণ্ঠ বললে, না, বন্ধই করে' দিন পাখাটা। তারপর চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়েঃ সিগ্রেট আমি সাধারণত খাই নে, কিন্তু যখন খাই পুরোপুরি এঞ্জয় কর্‌তে চাই। পাখার হাওয়ায় কী-রকম তাড়াতাড়ি পুড়ে যায়। বলে' সে হেসে উঠ্‌লো।

মিহিরের হাতের কাছে সুইচটা ছিলো; সে উঠে বন্ধ করে' দিলে পাখা। সিতিকণ্ঠ কুশানে ঠেস্ দিয়ে পরম আরামে এক

গাল ধোঁয়া ছাড়লে মুখ থেকে। কিন্তু মনে-মনে সে অবাক হ'লো। এ তো অসাধারণ-রকম কিছু ভালো লাগছে না। কাঁচির মতই তো।

লতিকার হ্যাণ্ড্ব্যাগ থেকে রুমাল বেরুলো। আস্তে কপাল মুছে সে বললে, কী ফানি—স্মোক করবার সময় পাখা বন্ধ করে' দেয়া।

রাজেন কোত্থেকে একটা জাপানি পাখা বা'র করে' হাত বাড়িয়ে দিলে ইন্দুমতীকে। ইন্দুমতী বাঁকা হেসে বললে, থ্যাঙ্কিউ। তারপর নিজকে একটু হাওয়া করে' বললে, Wonderfully frank কিন্তু, যাই বলিস।

—সব জিনিসই কী-রকম এঞ্জয় করবার স্পৃহা।—দে একটু পাখাটা।

—ঠোঁট দু'টোর কেমন সুন্দর একটা curve—

—কিন্তু অমন কালো ঠোঁট কেন ভাই। দে পাখাটা।

—উঃ, কী গরম। ঘামাচি না বেরুলে বাঁচি।

* * *

মিহির আর রাজেন রুমালে ঘাড় মুছতে-মুছতে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করলে। মিহির বললে, উনি যতবার সিগ্রেট খাবেন, ততবারই যদি—

—জিনিয়াসদের এ-সব idiosyncrasies থাকেই।

—Is he *really* a genius ?

—তুমি বলছো কী?

—না, না, আমি কিছু বলছি নে। তোমার কী মনে হয় তাই জানতে চাই।

—বাঃ, ওঁর সম্বন্ধে অন্ধ্র ইউনিভার্সিটির হিসট্রির প্রোফেসর কী লিখেছেন গ্যাখোনি ?

—না—কী লিখেছে ?

—লিখেছে—ওঃ, সে অনেক কথা, পড়ে' দেখো। বেরিয়েছে এ মাসের 'ধুতুরা'য়। ওটা পড়লেই বুঝতে পারবে—কী বীস্‌ট্‌লি গরম।

*   *   *

সিগ্রেটের আগুন যখন আঙুলে এসে লাগে-লাগে, সিতিকণ্ঠ অগত্যা সেটা ফেলে দিয়ে ঘোষণা করলে, এইবার পাখা খুলতে পারেন।

পাখা চলতে আরম্ভ করলো। সবাই নড়ে'-চড়ে' একটু হাত-পা ছড়িয়ে বসলো।

—আপনাদের কষ্ট দিলুম, সিতিকণ্ঠ মধুর হেসে বললে, আপনারা শহরের লোক, পাখা ছাড়া কষ্ট হয়।

অনেকগুলি কুণ্ঠিত স্বর একসঙ্গে মৃদু প্রতিবাদ করে' উঠলো।—কিন্তু আমার বাল্যকাল কেটেছে গ্রামে, আমার কিন্তু গরমটা বেশ ভালোই লাগে।

মাধুরী জিগ্‌গেস করলে, আপনি বুঝি গ্রামই খুব ভালবাসেন?

—গ্রামই তো আমাদের দেশ, গ্রামই তো আসল। সেই যে কী বলে—God made the country and man made the town।

মাধুরী দীর্ঘশ্বাস ফেলে' বললে, আমি এখনো কোনো গ্রাম চোখে পর্যন্ত দেখলুম না।

—আপনাদের অবিশ্যি ভালো লাগবার কথা নয়, কিন্তু আমার মনে যে গ্রামের কী মোহ—সিতিকণ্ঠ কথাটা শেষ না করে' চোখ বুজলো।

—তা হ'লে আপনি, ইন্দুমতী জিগ্‌গেস করলে, এই শহরে কেন থাকেন?

—কেন থাকি? ইচ্ছে করে' কী আর থাকি? থাকতে হয় বলে' থাকি।

—ভালো যদি নাই লাগে—

—তবু থাকতে হয়, সিতিকণ্ঠ গভীরভাবে বললে, তবু থাকতে হয়। জীবনে সবই কি আর নিজের ইচ্ছেমত হবার উপায় আছে!

—আপনার বইগুলো অবিশ্যি সবই গ্রাম নিয়ে।

—তা হবে না! শহরে কী আছে?

মাধুরী বলে' উঠ্‌লো, এখানে থেকে-থেকে আপনার নিশ্চয়ই nostalgia হয় মাঝে-মাঝে?

সিতিকণ্ঠ মাধুরীর মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বল্‌লে, তা কল্‌কাতায় কি কারো স্বাস্থ্য ভালো থাকবার উপায় আছে—

মাধুরী তাড়াতাড়ি বলে' উঠ্‌লো: আমি সে-কথা বল্‌ছিলাম না—মাঝে-মাঝে কি homesickness—

সিতিকণ্ঠ বল্‌লে, কল্‌কাতায় বসবাস করতে হ'লে তো যে-কোনো রকমের sickness-ই হ'তে পারে।

সবাই সমস্বরে হেসে উঠ্‌লো। সিতিকণ্ঠবাবুর কী wit—রাজেন মনে-মনে ভাবলে।

* * *

মোহিত দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাকলে—বিজয়!

ফরসা ধুতি আর ফতুয়া পরা একটি লোক আবির্ভূত হ'লো।—চা নিয়ে আয়।

শুধু যে চা এলো তা নয়: সেই সঙ্গে স্তূপীকৃত দিশি ও বিলিতি খাবার। লাল রঙের চৌকোমত চায়ের বাটি, রঙে ও আকৃতিতে তার সঙ্গে মেলানো এক ঝুড়ি পেলেট: মোহিত সেগুলো অনায়াসে একটা-একটা করে' তুলে প্রত্যেক অতিথির সামনে রাখছে—তাকিয়ে দেখছে না পর্যন্ত একবার।

মাধুরী সিতিকণ্ঠর পেয়ালায় চা ঢেলে জিগ্‌গেস কর্‌লে, ক' চামচে চিনি?

—যত আপনার খুসি।

মাধুরী হেসে বললে, আপনি মিষ্টি বেশি খান বুঝি ?

—চা আমি খাই দুধ আর চিনির জন্যেই। আমার তো অভ্যেস নেই ও-সব। সবাই খায়, তাই খেতে হয়।

মাধুরী তিন চামচে চিনি ঢেলে বললে, দেখুন।

—আরো দিতে পারেন গোটা দুই।

মাধুরী চোখ তুলে সিতিকণ্ঠর দিকে তাকালে। সে কি ঠাট্টা করছে ?—সিরপ হ'য়ে যাবে যে।

—ভালোই তো।

এর পর আর আপত্তি না করে' মাধুরী প্রচুর পরিমাণে দুধ আর চিনি সহযোগে এক অদ্ভুত পানীয় তৈরি করলে। সিতিকণ্ঠ সশব্দে পেয়ালায় এক চুমুক দিয়ে বললে, আঃ।

মাধুরী একটা থালায় খাবার সাজিয়ে সিতিকণ্ঠর দিকে আগিয়ে দিলে : কিছু নিন।

—ওঃ, এত সব !

—যা হোক একটু খান।

—আমি তো রাত্তিরে বিশেষ-কিছু খাই নে।

সুধারানী বললেন, সে কী! কিছু খেতে হবে বই কি—যা-হোক্ কিছু।

যেন ঘোরতর অনিচ্ছায় সিতিকণ্ঠ চায়ের বাটিটা নাবিয়ে রেখে একহাতে থালাটা তুলে নিলে। জুড়ে দিলে গল্প মাধুরীর সঙ্গে। সে অনেক কথা—তা'র বাল্যের স্মৃতি, পল্লী-প্রকৃতির সৌন্দর্য, শহরের মানুষের কৃত্রিমতা, শহরের দরিদ্রের যন্ত্রপিষ্ট মৃত-প্রায় আত্মা। মাধুরী মুগ্ধ হ'য়ে শুনলো। কী সমবেদনা, কী গভীরতা। সত্যি, বড় লেখকের সঙ্গে আলাপ করতে পারা একটা সৌভাগ্য। মানুষ হিসেবে বড় না হ'লে কখনোই বড় লেখক হওয়া যায় না।

খানিক পরে দেখা গেলো, সিতিকণ্ঠর হাতের থালা একেবারে শূন্য। সেদিকে তাকিয়ে সিতিকণ্ঠ নিজেই অত্যন্ত লজ্জিত হ'য়ে

পড়লো। হেসে বললে, দেখলেন কাণ্ডটা! আপনার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে কখন অন্যমনস্ক হ'য়ে সব খেয়ে ফেলেছি। ঐ আমার এক দোষ—একবার মনের মত কথা পেলে আর-কিছু খেয়াল থাকে না।

—তাতে কী, তাতে কী, বিশেষ-কিছু তো ছিলোও না—আর-কিছু খাবেন, একখানা আইস্‌ড্‌ সন্দেশ?

—না, না, সিতিকণ্ঠ প্রায় আর্তস্বরে বলে' উঠ্‌লো, আর খেলে রাত্তিরে ঘুমোতেই পারবো না। সুধারানী বললেন, ও কিচ্ছু হবে না, খুব লাইট্‌ সন্দেশগুলো। নিন আর-একখানা। সুধারানী একরকম জোর করেই আরো দু'খানা সন্দেশ সিতিকণ্ঠর থালায় তুলে দিলেন।

বাংলা কথা-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলাপ করতে-করতে অন্যমনস্ক হ'য়ে গিয়ে সিতিকণ্ঠ সবসুদ্ধ ছ'খানা আইস্‌ড্‌ সন্দেশ ভক্ষণ করলে।

তারপর—তারপর আর কী? মাধুরী একটা গান করলে; অনেক সাধাসাধির পর লতিকা উঠে অর্গ্যানের ধারে একটু বসলো, দু'একবার কাশলো, সীলিঙের দিকে একবার তাকালো, একটু হাসলো ইন্দুমতীর দিকে তাকিয়ে, তারপর—সে-ও একটা গান করলো। তারপর আর-এক প্রস্থ চা; একটু খুচ্‌রো কথাবার্তা; ইন্দুমতীকে গাইতে অনুরোধ আর তার দৃঢ় প্রতিবাদ যে গাইতে সে পারে না; অগত্যা মাধুরীরই আর-একটা গান। তারপর একজন মন্তব্য করলে যে দশটা প্রায় বাজতে চলেছে, আর-একজন বললে এমন ডিভাইন সন্ধ্যা সে জীবনেও কখনো কাটায় নি, সবাই সুধারানীকে ধন্যবাদ দিলে, আর সুধারানী সিতিকণ্ঠকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। আর তারপর সভা-ভঙ্গ হ'লো।

রথী বরাবর এক কোণে চুপচাপ বসে' ছিলো—একটি কথাও বলে নি। সমস্ত ব্যাপারটা দেখে তার কেমন-যেন মন্‌-খারাপ

লাগ্‌ছিলো। যেমন হওয়া উচিত ছিলো, তা যেন হ'লো না : এই সন্ধ্যার যে-রকম ছবি সে মনে-মনে এঁকে রেখেছিলো, তার সঙ্গে কিছুই যেন মিললো না। আর, বিশেষ করে' একটা কথা তার মনের মধ্যে বার-বার খোঁচা দিতে লাগ্‌লো : সিতিকণ্ঠ কেন বললে যে রাত্তিরে সে বিশেষ-কিছু খায় না। সে তো খায় : সংসারের আর পাঁচজন লোক যেমন খায়, তেমনি। আর ও-কথা বলবার পর—রথী তার মনকে ধমকালে, শাসন করে' বললে যে এ সব চিন্তা মনে স্থান দেয়া হচ্ছে নিছক স্নবিশ্‌নেস্—তবু—একথা তার মনে না হ'য়েই পারলো না যে কোনো ভদ্রসমাজে এসে ওরকম গুরু আহার করা কেমন যেন, কেমন যেন—মোট কথা, ও রকম কেউ করে না। অবিশ্যি, তক্ষুনি সে তীব্র স্বগত স্বরে বলে' উঠ্‌লো সিতিকণ্ঠর সঙ্গে কা'র তুলনা, সিতিকণ্ঠর মত প্রতিভা থাকলে যা খুসি তাই করা যায়। কিন্তু তবু, ঠিক ও কথা বলবার পরেই···

রাস্তায় এসে সিতিকণ্ঠ বললে, ভালো লাগে না এ সব।

—কী সব ?

—রাগ কোরো না, এই সব বড়লোকিয়ানার মধ্যে কেমন যেন অস্বস্তি লাগে। তোমার মাধুরীটি কিন্তু ভাই বেশ।

রথী চুপ করে' রইলো।

—তুমি ওকে বিয়ে করবে ?

—তাই তো ঠিক আছে।

—একেবারে ঠিক হ'য়ে গেছে ?

রথী নীরবে কয়েক পা হাঁটলো। তারপর বললে, হ্যাঁ।

বারো

পরদিন দুপুরবেলা রথী একটু বেরিয়েছিলো ; বিকেলের দিকে ফিরে এসে তার ঘরে ঢুকতে গিয়ে দরজার কাছে থমকে দাঁড়ালো। কিছু খুচরো পয়সা পকেটে নিয়ে রথী পার্স্‌টা টেবিলের উপর ফেলে গিয়েছিলো ঃ সিতিকণ্ঠ সেই টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে, পার্সটা তার হাতে। পার্সটা খুলে সে একটু ঘেঁটে ঘেঁটে দেখ্‌লো, তারপর একটা টাকা বা'র করে' নিজের পকেটে রেখে সেটা ফিরে বন্ধ করে' টেবিলের উপর রেখে দিলে। রথীর চোখে পলক পড়লো না, তার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হ'য়ে আসছে।

মুখ ফিরিয়ে রথীকে দেখেই সিতিকণ্ঠর মুখ এক স্বর্গীয় জ্যোতিতে ভেসে গেলো।—এই যে, রথী। কখন্‌ এলে ? এইমাত্র একটা গল্প শেষ করে' উঠে আসছি। বোসো, একটু গল্প করা যাক্‌। কোথায় গিয়েছিলে ?

—এই ঘুরে এলাম একটু। রথী গায়ের জামাটা খুলে হ্যাঙ্গারের সঙ্গে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখলে।

সিতিকণ্ঠ তার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললে, ভারি সুন্দর পার্সটা তোমার—একটু দেখ্‌ছিলাম। সিতিকণ্ঠ পার্সটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলে, কোথায় কিনেছো ?

—সবখানেই পাওয়া যায়।

—তা এ-রকম যেখানে সেখানে ফেলে যাও—তোমাকে বলে' বলে' আর পারলাম না। আর কত যে থাকে ওর মধ্যে, তার তো হিসেবও রাখো না।

রথী চুপ করে' রইলো।

—অর্জুনকে দোষ দিয়ে আর লাভ কী, সিতিকণ্ঠ বলে' চললো,

গরিব মানুষ, হাতের কাছে পেলে কোন্ না নেবে। আর নিলেও যখন ধরা পড়বার ভয় নেই। একটু সাবধান হ'তে শেখো, রথী, একটু সাবধান হ'তে শেখো। বেরোবার সময় পার্সটা যদি সঙ্গে না নাও—তা ছ্যাখো, এক হিসেবে না নেয়া মন্দ নয়, পিক্‌পকেটের সংখ্যা কলকাতায় দিনদিন বেড়েই চলেছে—বেশ, আমার কাছে রেখে যেতে পারো, আমার কাছ থেকে চুরি করবে, এত বড় চালাক পৃথিবীতে আজও জন্মায় নি। সিতিকণ্ঠ রথীর খুব কাছে সরে' এসে তার মুখের দিকে মিটমিটে চোখে তাকালো, তুমি যে কী রকম অসাবধান, তা এখনই প্রমাণ করে' দিচ্ছি। আচ্ছা বলো তো, তোমার এই পার্সে কত ছিলো ?

—কী যেন।

—বলো না। আচ্ছা, দেখে বলো। সিতিকণ্ঠ পার্সটা রথীর দিকে আগিয়ে দিলে, খুলে দেখে তুমি বলো, ঠিক আছে কিনা।

রথী পার্সটা খুলে একবার একটু তাকিয়েই বললে, ঠিকই আছে।

সিতিকণ্ঠ উচ্চস্বরে হেসে উঠলো।—কেমন! বলি নি! এমন ভোলা মন নিয়ে যে কী করবে সংসারে—সিতিকণ্ঠ বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়লে, সংসারটা বড় কঠিন জায়গা, রথী, বড় কঠিন জায়গা। একটু হুঁশিয়ার না হ'লে কেবলই ঠক্‌বে। আমিও এককালে তোমারই মত ছিলুম, আজ অনেক দুঃখে পড়ে' এ-কথা বলছি। এই তো, তুমি বলছো, ঠিকই আছে, অথচ—বিজয়ের ভঙ্গিতে সিতিকণ্ঠ তার নিচের পকেট থেকে একটা টাকা বার করলে, অথচ এই ছ্যাখো তোমার পার্স থেকে একটা টাকা নিয়েছিলুম। নাও। সিতিকণ্ঠ ঝনাৎ করে' টাকাটা টেবিলের উপর ফেললে, নাও, তুলে রাখো। আমি যা ভেবেছিলুম তাই তাই হ'লো কিনা, ছ্যাখো। আমি জানতুম যে কক্ষনো তুমি টের পাবে না। হাতে-হাতে পরীক্ষা হ'য়ে গেলো—দেখলে তো! অর্জুন না জানি কত সরায়

—আর তুমি তো ওর হাতে সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছো। হয় তোমার স্বভাব বদ্‌লাও রথী, না-হয় অর্জুনকে তাড়াও।

রথী কোনো কথা বললে না। খানিক চুপ থেকে সিতিকণ্ঠ হঠাৎ বলে' উঠলো, যাই, গল্পটা একটু রিভাইজ করতে হবে।

সিতিকণ্ঠ চলে' গেলো। একটা বই হাতে নিয়ে রথী স্তব্ধ হ'য়ে বসে' রইলো।

একটু পরে দরজার কাছে অর্জুনের মূর্তিকে ইতস্তত করতে দেখা গেলো। রথী কোলের উপর বই নামিয়ে রেখে বললে, কী?

অর্জুন ঘরে ঢুকে কয়েক পা এগিয়ে বললে, ধোবাবাড়ি আর-কিছু যাবে নাকি?

—ধোবা তো সব নিয়ে গেলো কাল।

—আর-কিছু যদি থাকে তো দিয়ে আসতে পারি।

—না, আর কিছু নেই। বলে' রথী আবার বইয়ের উপর চোখ নামালো।

কিন্তু অর্জুন দাঁড়িয়েই রইলো। রথী মনে-মনে একটু বিরক্ত হ'য়ে উচ্চস্বরে বললে, না, আর-কিছু যাবে না।

অর্জুন অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে বললে, একটা কথা বলতে চাই, দাদাবাবু।

—তোর কিছু দরকার? কাল নিয়ে যাস্ টাকা।

—আজ্ঞে আমি—আমাকে এবার ছুটি দিন।

—ছুটি! ছুটি নিয়ে তুই কী করবি।

—একবার দেশে যাবো, দাদাবাবু। অনেকদিন যাইনে—

—না, না, দেশে যাওয়া-টাওয়া চলবে না। তুই গেলে আমাদের এদিকে চলবে কী করে'?

—অন্য কোনো লোক কি পাবেন না, দাদাবাবু? আমার চেয়ে ভালো লোকই পাবেন।

রথী বিরক্ত হ'য়ে বললে, যা, যা, তোকে এখন ফাজলেমি করতে হবে না ঃ তোর নিজের কাজে যা।

অর্জুন একটু চুপ করে' থেকে বললে, আমি একেবারেই চলে' যেতে চাই।

রথী বইখানা চোখের সামনে তুলতে যাচ্ছিলো, ধুপ্ করে' সেটা পড়ে' গেলো কোলের উপর।

—কেন, তোর হয়েছে কী?

—এতদিন আপনার এখানে আছি, কখনো মুখ ফুটে একটি কথা বলিনি—

—তা তো বুঝ্‌লাম, রথী অসহিষ্ণুভাবে বললে, এখন সোজা কথায় বল্ তো কী হয়েছে।

—আপনারা যখন আমাকে এত সন্দেহ করেন—

—কে তোকে সন্দেহ করে? রথী ধমকে উঠলো, বড়-বড় কথা শিখেছিস—না?

—এই সিতিকণ্ঠবাবু—

—সিতিকণ্ঠবাবু! কী করেছে তোর সিতিকণ্ঠবাবু? তাঁর সম্বন্ধে যদি কিছু বলবি—

—আমরা ছোটলোক ঃ আমাদের মুখে কোনো কথাই মানায় না।

—মনে রাখিস্ সেটা।

অর্জুন মাথা নিচু করে' একটু চুপ করে' রইলো। রথী বললে, যা এখন।

অর্জুন আস্তে-আস্তে মুখ তুলে বললে, আপনার টাকা-পয়সা চুরি যাচ্ছে, সে-জন্য—

—সে-জন্য আমি তোকে কিছু বলেছি? তুই বড় বেশি কথা বলছিস আজকাল।

—না, কিছু বলেন নি। কিন্তু কোনো জিনিস না-পাওয়া গেলে সব সময় বাড়ির চাকরই তো চোর হয়।

রথী অর্জুনের মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললে, এ-সব তুই বলছিস্ কী ? তোকে কিছু বলিনে কিনা—

—আজ্ঞে আপনি মনিব, আপনি যা-খুসি বলতে পারেন। কিন্তু তাই বলে' যে-কেউ যা-তা বল্‌বে—না, আমি আর কাজ করতে পারবো না, আমাকে বিদেয় দিন।

রথী তড়াক করে' লাফিয়ে উঠলো চেয়ার ছেড়েঃ কে তোকে যা-তা বলেছে, শুনি ? তোর এত বড় সাহস—! শোন্ঃ সিতিকণ্ঠ-বাবুকে তুই ঠিক আমারই মত মেনে চলবি! যদি না পারিস, যা এখান থেকে।

—আমি তো যেতেই চাইছি, দাদাবাবু, এত গঞ্জনা সয়ে' থাকা যায় না—পদে-পদে চোর-ধরা। আর আমার কোনো কাজই তাঁর পছন্দ হয় না—কথায় কথায় মুখ-ঝামটা।

রথী কোমলস্বরে বললে, তা ওঁরটা একটু সইতে হবে বই কি, অর্জুন; উনি কত বড় লোক, তুই তার কী বুঝ্‌বি। তোর কত জন্মের পুণ্যি তুই তাঁর সেবা করতে পারছিস!

—না, আমাকে বিদেয় দিনঃ আমরা গতর খাটিয়ে খাই, এ-সব আমাদের সহ্য হয় না।

একটু চুপ করে' থেকে রথী বললে, আচ্ছা, তুই যা এখন।

এক সপ্তাহ কাটলো। কী-যেন একটা একটা ছায়া' একটা প্রেত, একটা অদৃশ্য বীভৎস উপস্থিতি ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই বাড়িতে। সব সময় রথীর সামনে, রথীর চোখের সামনে। সে প্রাণপণ চেষ্টা করে সেটা সরিয়ে দিতে, মুছে দিতে, সেটাকে ভুলে' থাকতে—কিন্তু সব সময় সেটা আছে, সেখানে আছে।

কিছুই রথীর ভালো লাগে না। সব সময় সিতিকণ্ঠর সঙ্গে-সঙ্গে থাকতে পারা ছিলো তার সুখের চরম, আজকাল যেন একা থাকতে পারলেই তার ভালো লাগে। অথচ তা হওয়া উচিত নয়—তা হয় বলে' নিজের কাছেই দুঃখে, লজ্জায় সে মুহ্যমান হ'য়ে পড়ে।

এক বিকেলে চা না খেয়েই সে বেরিয়ে পড়লো বাড়ি থেকে—মনটা কী রকম ভারি হ'য়ে আছে, একটু ঘুরে এলে যদি ভালো লাগে। বাস্ সে নিলে না—কোথায় যাবে তার ঠিক নেই, এলোমেলোভাবে খানিক হেঁটে বেড়াবে।

ঘুরতে-ঘুরতে হঠাৎ এক সময়ে সে দেখলে তার সামনে অনিলা প্রেসের প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড। এখান থেকে তার বই বেরিয়েছে, কিন্তু সে কখনো বাড়িটার ভিতরে যায় নি—যা করবার সিতিকণ্ঠই সব করেছে। কী মনে হ'লো তার, ঢুকে পড়লো ভিতরে। নিচে একটি লোককে জিগ্‌গেস করলে, অনাদিবাবু আছেন?

—উপরে। লোকটি উপরের সিঁড়ি দেখিয়ে দিলে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে তার একবার মনে হ'লো—দূর ছাই, ফিরে যাই। কী জন্যে আমি এসেছি, কী কথা বলবো? কিন্তু ততক্ষণে সে প্রায় দোতলায় এসে পড়েছে।

সামনেই একটা দরজায়-পরদা-লাগানো ঘর। বাইরে দাঁড়িয়ে সে একটু ইতস্তত করছে, একটা বেয়ারা-মত লোক কোত্থেকে এসে বললে, যান, বাবু আছেন ঘরে।

পাতলা, টাক-পড়া এক ভদ্রলোক একটা প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিলে বসে বাংলা মাসিকপত্রের বিজ্ঞাপন দেখছিলেন। তাকে দেখেই বলে' উঠলেন, এই যে, আসুন।

—আপনিই অনাদিবাবু?

—হ্যাঁ, বসুন।

—আমার নাম হচ্ছে রথীকুমার—

—বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি। আমি আপনাকে চিনি। বসুন, বসুন।

রথী উল্টোদিকের চেয়ারটায় বসে' রুমাল বা'র করে' কপালের ঘাম মুছলো।

—তারপর? কী খবর?—চা খাবেন?

রথী অস্ফুট একটা শব্দ করে' মাথা নাড়লে।

—কেন, খান্ না, খান্ না এক পেয়ালা। অনাদিবাবু বেল্ টিপলেন। তা'তে আশানুরূপ আওয়াজ হ'লো না। তারপর হাঁক দিলেন, ওরে—দয়া করে' তবু আজ পায়ের ধুলো দিলেন—এই যে চা নিয়ে আয়, দু' পেয়ালা।—তারপর, হঠাৎ আমার এত ভাগ্য?

ভদ্রতার আতিশয্যে অভিভূত হ'য়ে রথী বার-বার লাল হ'য়ে উঠছিলো। কিছু-একটা বলবার জন্যই বললে, আমার দু'খানা 'ভাঙা আয়না' দরকার।

—তা বেশ, তা বেশ। কিন্তু উপহারের বই সিতিকণ্ঠবাবু এসে তো সবগুলো নিয়ে গেছেন।

—আরো দু'খানা দরকার, তা আমি দাম দিয়েই নেবো।

—না, না, দাম আপনাকে দিতে হবে না। দু'খানা কেন,

আপনি পাঁচখানা বই-ই নিয়ে যান না—ওতে আর কী এসে যায়। যে-ক'খানা দরকার হয় নেবেন, তা'তে আর কী আছে।

—আমি দাম দিয়েই নিতে চাই। আপনাদের লোকসান করে'—

লোকসান! বিলক্ষণ। অথর ছ' পাঁচখানা বই বেশি নেবেন, সেটা লোকসান! না, দাম দেবার কথা আপনি মুখে আনবেন না, মুখেও আনবেন না। তা আমি তখনই সিতিকণ্ঠবাবুকে বলেছিলুম, অন্তত কুড়িখানা বই নিয়ে যান—অথরের উপহার দিতে কিছু যাবে তো, বিশেষ প্রথম বই।

রথী প্রচণ্ড ঘামতে লাগলো। অতিকষ্টে সে উচ্চারণ করলে, আপনারা সাধারণত ক'খানা বই দিয়ে থাকেন?

—সবাই যা দেয়, তা-ই। আপনাকে যা দিয়েছি, তা-ই। পঁচিশখানা। আমি তখনই সিতিকণ্ঠবাবুকে বলেছিলুম যে এটা ঠিক হচ্ছে না, মোটে পাঁচখানা বইতে কী হয়—তা উনি বললেন যে না, রথীবাবু পাঁচখানাই বই চান আর বাকি কুড়িখানা বইয়ের দাম। তা ও-ব্যবস্থাতেও আমাদের আপত্তি নেই—কী হ'লো?

রথী মুখের উপর নির্মমভাবে রুমাল ঘষতে-ঘষতে বললে, হ্যাঁ, তখন আমি ভেবেছিলুম—

—কিন্তু আমি তখনই জানতুম, তখনই জানতুম, যে আপনি ভুল করছেন। বইয়ের জন্য আপনাকে আবার আসতে হবে। আর কমিশন বাদ দিয়ে কীই বা সামান্য টাকা।

—তখন হঠাৎ একটু দরকার হ'য়ে পড়েছিলো।

—তা বুঝেছিলুম, তা বুঝেছিলুম। এই যে, চা এসেছে। আপনার বইখানা কাটছে মন্দ না। আরো লিখুন।

—আপনারা ছাপবেন লিখলে?

—তা বই ছাপাই তো আমাদের ব্যবসা।

—কিন্তু কিছু আগাম টাকা পেলে—

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। দেখুন, বিজনেস মানেই give-and-take। কেবল কথায় কী হয়—টাকা দেবো বই কি। এবার যা দিয়েছি তার বেশিই দেবো।

রথী চায়ের পেয়ালাটা মুখে তুলতে যাচ্ছিলো, হঠাৎ খানিকটা গরম চা ঝল্‌কে পড়ে' গেলো তার কাপড়ের উপর।

—আহা, পড়ে' গেলো বুঝি, পড়ে' গেলো বুঝি—

—ও কিছু নয়। রথী যান্ত্রিকভাবে এক চুমুক চা খেলো। জিগ্‌গেস করলে, আপনারা কি সাধারণত এ-রকম পেমেণ্টই করেন ?

—কত দিয়েছি না আপনাকে ? একশো তো ? না, দু'টাকার বইয়ের পক্ষে কম হয়েছে, খুবই কম হয়েছে। তা একেবারে প্রথম বই—সে হিসেবে একটু risk-ও তো আছে। কিন্তু এর পরে যদি আমাদের বই দেন, ঠিক চলতি রেটেই দেবো।

রথী বাকিটা চা ঢক্‌ঢক্ করে' এক চুমুকে খেয়ে ফেল্‌লো। সে যেন নিজেই টের পাচ্ছিলো না সে কী করছে।

—আপনি এর পর বই লিখলে আমাদের এখানেই সবার আগে নিয়ে আসবেন, এই কিন্তু কথা রইলো। নিজেই আসবেন, এখন তো লজ্জা ভাঙ্‌লোই।

—আচ্ছা, দেখবো। রথীর সমস্ত শরীর অবশ হ'য়ে গেছে। এখন তো সে চলে' গেলেই পারে, কিন্তু চেয়ার থেকে ওঠবার ক্ষমতাও যেন তার নেই।

অনাদিবাবু জিগ্‌গেস করলেন, আপনি সিতিকণ্ঠর বাড়িতেই থাকেন তো ?

রথী খানিকক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর বললে, হ্যাঁ।

অনাদিবাবু একটু হেসে বললেন, সিতিকণ্ঠ আর আমি একসঙ্গে পড়তুম ইস্কুলে।

রথী অনাদিবাবুর টাকের দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে' তাকিয়ে বললে, একসঙ্গে পড়তেন!

—হ্যাঁ, আমরা ম্যাট্রিক পাস করি এক বছরে। তারপরে ও আর পড়লো না—অনেক কাল ওর কোনো পাত্তাই নেই। তারপর এখানে যখন দেখা, ও মস্ত লেখক হয়েছে।

রথী নির্বোধের মত প্রশ্ন করলে, আপনারা এক বছরে ম্যাট্রিক পাস করেন?

—হ্যাঁ, এক বছরে। ওঃ, সে কি আজকের কথা—উনিশ-কুড়ি বছর তো হবে। আপনারা তখন শিশু।

—কিন্তু সিতিকণ্ঠবাবুকে দেখে তো মনে হয় না তাঁর এত বয়েস হয়েছে।

—না, আমাকে কত বুড়ো দেখায় ওর চাইতে। বিজ্‌নেস্‌-এ ঢুকলেই, মশাই, worry-র শেষ নেই। অকালে বুড়িয়ে ফেলে। হ্যাঁ, সিতিকণ্ঠ চেহারায় এখনো বেশ ছোকরাটে ভাব বজায় রেখেছে। আর ও নাকি লোকের কাছে বয়েস অনেক কমিয়েও বলে। অনাদিবাবু উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন, ও কী, উঠছেন?

—হ্যাঁ, যাই আজকে।

—আসবেন মাঝে-মাঝে। আর কই, বই নিয়ে গেলেন না?

—আজ থাক, আর-একদিন এসে নিয়ে যাবো, বলে' রথী তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

চোদ্দ

—আঃ, সিতিকণ্ঠবাবু যে। মাধুরী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

—হঠাৎ এসে পড়ে' আপনার কোনো অসুবিধে করলুম না তো? কিছু লিখছিলেন?

—ও কিছু নয়। কলেজের কাজ। বাঁচালেন আপনি এসে। বসুন। মাধুরী ছোট একটা চেয়ার টেনে এনে সিতিকণ্ঠর কাছাকাছি বসলো। জিগ্‌গেস করলো, রথী কোথায়?

—কোথায় যেন বেরিয়ে গেছে।

—কোথায়?

—তা তো জানি নে?

—কেমন আছে সে?

—ভালো। ভালোই আছে। দেখে তো ভালোই মনে হয়। আমি এদিকে এসেছিলাম একটু কাজে, ভাবলুম একবার—

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আপনি যখন খুসি আসবেন। রথীবাবুর আপনি এত বড় বন্ধু—আমাদের সবাইকে আপনি বন্ধু বলে' মনে করবেন।

—বড় ভালো ছেলে রথী, মধুর স্বরে সিতিকণ্ঠ বললে।

—সিতিকণ্ঠবাবু, আপনাকে আমার বিশেষ একটা ধন্যবাদ জানাবার আছে।

—কী জন্যে বলুন তো?

—এই রথীর ভাঙা আয়না নিয়ে। আপনার সাহায্য না পেলে ও—

—সেইজন্যে ধন্যবাদ! রথীর মত প্রমিস্ যার মধ্যে আছে তার জন্যে কিছু করতে পারা—তা যে আমারই সৌভাগ্য।

মাধুরী খুসিতে লাল হ'য়ে বললে, ও সত্যি বেশ ভালো লেখে —না ?

—যে বলে, রথীর লেখবার ক্ষমতা নেই, সে হয় মিথ্যুক নয় সে সাহিত্য বোঝে না। প্রথমে মাসিক কাগজে ওর হু' একটা লেখা দেখেই আমার ভালো লেগেছিলো। মনে-মনে বলেছিলুম, এই হচ্ছে দেশের ভাবীকালের লেখক। হবে না! বৌদ্ধ আভায় সিতিকণ্ঠর চোখ নিমীল হ'য়ে এলো, এমন ইন্স্পিরেশন পেলে অলেখকও লেখক হ'য়ে যায়, আর রথা তো লিখতে পারে।

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে মাধুরী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে একটু চুপ করে' রইলো। তারপর বললে, আপনার মত এত বড় আশ্রয় ও যখন পেয়ে গেছে তখন সাহিত্যে একটা-কিছু করতে পারবেই, আশা করা যায়।

হ্যাঁ, সিতিকণ্ঠ আস্তে-আস্তে এপাশ থেকে ওপাশে মাথা নাড়তে লাগলো, আমি তো অন্তত ওকে দিয়ে অনেক-কিছু আশা করি। আর সেইজন্যই তো ওর সঙ্গে এসে থাকছি—একরকম ওর ভারই নিলুম।

—আপনার সঙ্গে থেকে ওর লেখা তো খুলবেই।

—তা ছাড়া ওকে আমি বড্ড ভালোবাসি। এমন নরম, মিষ্টি ছেলে। আজকালকার দিনে এমন ছেলে হয় না। কিন্তু এই কাঁচা বয়েস, তার উপর ভিড়েছে সাহিত্যিকদের সঙ্গে, পয়সারও অভাব নেই—সিতিকণ্ঠ একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেললে : একরকম ইচ্ছে করে'ই ওর সঙ্গে এসে থাকলুম।

মাধুরী চমকিত দৃষ্টিতে সিতিকণ্ঠর মুখে তাকিয়ে বললে, সাহিত্যিক তো সাহিত্যিকের সঙ্গেই মিশবে।

সিতিকণ্ঠর প্রশান্ত কপালে বিষাদের রেখা পড়লো : তেমন সাহিত্যিক যদি দেশে থাকতো তা হ'লে আর ভাবনা ছিলো কী। কিন্তু—আপনাকে কী বলবো—এখানকার সব সাহিত্যিকরা, তারা

যা করে, যা নিয়ে দিন কাটায়—সিতিকণ্ঠ মনে-মনে শিহরিত হ'য়ে উঠে চোখ বুজলো।

—কেন, তারা কী? মাধুরী রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করলে।

সিতিকণ্ঠ আস্তে-আস্তে চোখ খুললো।—না, জিগ্‌গেস করবেন না, ও-সব বলে' আপনার মনে কষ্ট দিতে চাইনে। আমার নিজেরই এমন কষ্ট হয় দেখে।

—তারা কি খুব খারাপ লোক?

একটি ক্ষীণ করুণার হাসি সিতিকণ্ঠের ঠোঁটে খেলা করে' গেলো।—যাক, এ-প্রসঙ্গ থাক্। অন্য কোনো কথা বলুন।

—কিন্তু রথী নিশ্চয়ই—

—না, না, ও অন্য-সবার মত নয়, ও আলাদা। আমি ঠিক জানি, ও শেষ পর্যন্ত সামলে নেবে। প্রায় নিয়েওছে। ও যা করছে, তা নেহাতই ফ্যাশান হিসেবে, তাতে ওর অন্তরের সায় নেই। সাহিত্যিক হ'লে কতগুলো জিনিস করতেই হবে, এ যেন একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। ও সে নিয়ম রক্ষা করে' যাচ্ছে মাত্র। কিন্তু ও শিগ্‌গিরই কাটিয়ে উঠবে, শিগ্‌গিরই বুঝতে পারবে—

মাধুরীর মুখ ছাইয়ের মত পাংশু হ'য়ে গেলো। সে কী যেন একটা বলবার চেষ্টা করলে, বলতে পারলে না।

সমবেদনায় আর্দ্র স্বরে সিতিকণ্ঠ বলে' যেতে লাগলো, এমন দুঃখ হয় আমার ওর জন্য। পয়সার গন্ধ পেয়ে চারদিকে জুটেছে কতগুলো লোফার—সবার গায়েই সাহিত্যের মার্কা। তাদের কেউ বা বাংলাদেশের গর্কী, কেউ বা হাম্‌সুন। পেশাদার প্যারাসাইট। ও ছেলেমানুষ, ও তো আর অত বোঝে না, ওর বয়েসে সবাইকেই জিনিয়াস্ মনে হয়। প্রথম যেদিন দেখলুম ওকে—মাতাল হ'য়ে একটা ট্যাক্সির মধ্যে পড়ে' আছে—

মাধুরীর মুখ পাথরের মত কঠিন হ'য়ে গেলো। সে তার নিচের ঠোঁটের উপর আস্তে একবার জিভ বুলিয়ে নিলে।

—সেদিন আমি মনে-মনে বললুম, ওকে বাঁচাতেই হবে। দেশের জন্য, সাহিত্যের জন্য ওকে বাঁচানো আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য। আর কেউ সে-ভার না নেয়, আমি নেবো। সেই থেকে আমি ওর সঙ্গে বাসা নিলুম। আস্তে-আস্তে ও শুধরে আসছেও। কিন্তু এই তো সেদিনই আবার রাত তিনটের সময় বাড়ি ফিরলো। পরদিন সকালে অবিশ্যি ভালো হ'য়ে উঠে কত কান্নাকাটি করলে। আসলে ও বড় ভালো—ও-সব জিনিস ওর সত্যি ভালো লাগে না। সবাইকে করতে দেখে বলে'ই করে'।

—ও কি—বরাবরই এইরকম ? এতক্ষণে মাধুরী একটা কথা বলতে পারলে।

—আমি তো যদ্দিন থেকে দেখছি—অবিশ্যি আগেও অনেক কথা শুনতুম ওর নামে, কিন্তু সে-সব বিশ্বাস করি নি, লোকের সম্বন্ধে কোনো বদ্‌নাম আমি সহজে বিশ্বাস করি নে। ওকে দেখলুম যখন—বড় কষ্ট হ'লো। সিতিকণ্ঠ গূঢ়ভাবে একটু চুপ করে' রইলো। তারপর আস্তে-আস্তে বললে, অবিশ্যি সবই কেটে যাবে—ছেলেবয়সে মানুষ একটু আত্মবিস্মৃত হ'য়ে পড়েই। তার উপর আপনার প্রভাব—

সিতিকণ্ঠর কথা শেষ হবার আগেই ঝড়ের মত ঘরে এসে ঢুকলো রথী—তা'র চুল উস্‌কো-খুস্‌কো, মুখ ফ্যাকাশে—দেখে যেন ঠিক চেনা যায় না। সিতিকণ্ঠকে দেখেই তার মুখে একটা ভীত, ত্রস্তভাব ফুটে উঠলো—তাড়াতাড়ি সে একটা সোফায় বসে' পড়ে' দু' হাতের মধ্যে মুখ ঢাকলো! অনিলা প্রেস থেকে বেরিয়ে সোজা সে চলে' এসেছে এখানে। মাধুরী—তার সমস্ত মন আলোড়িত হ'য়ে উঠেছিলো, মাধুরীকে একবার দেখতে, একবার তার কথা শুনতে। মাধুরীই তো তার শেষ আশ্রয়, সেখানে সে শান্তি পাবে। আর-সব যাক্, লুপ্ত হ'য়ে যাক্ সমস্ত পৃথিবী। আমার সব ক্লান্তি তুমি মুছে নাও, মাধুরী, আমাকে তুমি নতুন

করে' তোলো। সমস্ত রাস্তা সে এ-কথা বলেছে নিজের মনে—আর এখানে এসেই প্রথম যার উপর তার চোখ পড়লো, সে সিতিকণ্ঠ।

রথীকে দেখেই সিতিকণ্ঠর মুখ হাসিতে ভরে' গেলো।—আরে, এই যে রথী। তোমার জন্য অপেক্ষা করে'-করে' আমি হয়রান্। কোথায় গিয়েছিলে ?

রথী মুখ তুললে না, কোনো কথা বললে না।

—তোমার শরীর খারাপ হয়নি তো ?

তবু রথী মুখ তুললো না। অসম্ভব, অসম্ভব ঃ সিতিকণ্ঠর মুখের উপর সে আর চোখ রাখতে পারবে না।

—ওর শরীরই খারাপ হয়েছে বোধ হয়, মাধুরীর দিকে তাকিয়ে সিতিকণ্ঠ বললে, প্রায়ই আবার ওর মাথা ধরে।—আচ্ছা, সিতিকণ্ঠ উঠে দাঁড়ালো, আমি চলি।

মাধুরী বললে, এখনই ?

সিতিকণ্ঠর চোখে হাসি ঝিলিক মেরে উঠলো।—হ্যাঁ, যাই। এখন আর আমার দরকার কী ? তা ছাড়া আমার একটু দরকারও আছে এক জায়গায়।

মাধুরী আর-কিছু বললে না। সিতিকণ্ঠ চলে' গেলো। রথীর মাথা তবু তার দু'হাতের মধ্যে ডোবানো। খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপ।

তারপর রথী অদ্ভুত, রক্তিম চোখ তুলে মাধুরীর দিকে তাকিয়ে বললে, আমাকে একটু চা দিতে পারো খেতে ? সেই মুহূর্তে, চায়ের জন্য তীব্র, তীব্র বাসনা ছাড়া আর সব অনুভূতি যেন তার মন থেকে লোপ পেয়ে গিয়েছিলো। কতকাল, কতকাল যেন সে চা খায় নি। অনিলা প্রেসে যে তাকে চা খেতে দেয়া হয়েছিলো তা ভালো করে' মনে করতে পারছে না।

মাধুরী আস্তে-আস্তে, কঠিনস্বরে বললে, চায়ে তোমার কী

হবে। যে-সব জিনিস তোমার পান করে' অভ্যেস তা তো আমাদের বাড়িতে নেই।

রথী মূঢ়দৃষ্টিতে মাধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

—তোমার লজ্জা করে না, মাধুরী আবার বললে, তোমার লজ্জা করে না আবার এখানে এসে বসতে?

ক্লান্তি, ক্লান্তি—সীমাহীন, সময়হীন ক্লান্তি। কথা বলবার ক্ষমতা আর রথীর নেই—বলে'ই বা কী হবে। যদি সে এই মুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়তে পারতো, যদি আর কখনো না জাগতো! সিতিকণ্ঠর পরিত্যক্ত চেয়ারটার দিকে একবার সে তাকালো। তারপর অত্যন্ত দুর্বলভাবে হেসে উঠলো।

সে-হাসি শুনে মাধুরী প্রায় ভয় পেয়ে বলে' উঠ্‌লো—ও কী? কিছু খেয়ে এসেছো নাকি? তুমি যাও—মাধুরী কথাটা শেষ করতে পারলে না। রথীর এমন অবিন্যস্ত, বিহ্বল চেহারা সে কখনো দেখে নি। তার বুকের মধ্যে ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করছিলো।

রথী মুহূর্তকাল মাধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর উঠে আস্তে-আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। একটি কথা বললে না।

রাস্তায় বেরিয়ে হঠাৎ তার দু' চোখ ফেটে জল এসে পড়লো। শেষ, সব শেষ। কিছু আর নেই। যেদিকে তাকায়, যেদিকে হাত বাড়াতে যায়, শূন্যের পর শূন্য। কী করবে, কী আর করবে সে এ-জীবন নিয়ে?

পনরো

মানুষের জীবনে ট্র্যাজেডির বীজ যে কোথায় থাকে কেউ বলতে পারে না। অত্যন্ত সুস্থ স্বাভাবিক জীবন, বাইরে থেকে দেখলে সাধারণ লোকের হয়-তো ঈর্ষাই হ'তে পারে কিন্তু তারই ভিতর কোথায় থাকে একটি অদৃশ্য চিড়্। সেই সূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক ফাটলটি ধীরে-ধীরে অবস্থা ও আবেষ্টনের চাপে বড় হ'য়ে সমস্ত জীবন দেয় একদিন ভেঙে।

রথীর জীবনে এমনি একটি ফাটল বেরুবে কে জানতো। উপর থেকে দেখতে গেলে তার তো কিছুরই অভাব ছিলো না। অনেকের চেয়ে সে বেশি সৌভাগ্যবান। এমন কিছু অনটন তার জীবনে ছিল না। সাধারণ স্বাস্থ্য, সাধারণ সচ্ছলতা, সাধারণ বিদ্যা-বুদ্ধি সুযোগ সবই তার ছিলো। সুখী হবার জন্যে আর এর চেয়ে কি বেশি উপকরণ দরকার! কিন্তু তবু সে-রাত্রে মাধুরীদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যে-ছেলেটি উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে শহরের রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলো তার চেয়ে দুঃখী আর ক'জন আছে! জীবনটা তার গেছে একদিনে ঘুলিয়ে, তছনছ হ'য়ে। চারদিকে বিশৃঙ্খলা, চারদিকে জীবনের অস্ফুট মুকুলের সমাধি-শয্যা!

গভীর, গভীর তার দুঃখ। আত্মার তলদেশ পর্যন্ত তার অন্ধকার বেদনায় যেন ছেয়ে গেছে। অত অন্ধকার বুঝি রাত্রির আকাশেও নেই। নিজের অন্তরের ভিতর যে-শূন্যতা সে অনুভব করে তার সীমা নেই। সে-শূন্যতা পৃথিবীর সব-কিছুর মানেও যেন দিয়েছে বদলে। কিছুরই আর কোনো মূল্য নেই। শূন্য দৃষ্টিতে চারিধারে চেয়ে তার মনে হয় সৃষ্টির চটক্ ধুয়ে গিয়ে যেন তার সমস্ত কুশ্রীতা বিবর্ণতা বেরিয়ে পড়েছে!

এগুলো রথীর বেদনা-বিলাস বলে' উপহাস করা যায়, বলা যেতে পারে যে এগুলো তার কাল্পনিক, নিজের মনের বানানো দুঃখ। কিন্তু সে-মন বলে' যায় কোন বালাই নেই, সকল হ্যাঙ্গাম থেকে সে তো মুক্ত। তার তো সুখ-দুঃখ কিছুই নেই এবং তার কাহিনীও তাই হ'তে পারে না।

রথী জীবনে কেন এত দুঃখী হ'ল, কেন তার নিখুঁত নিটোল জীবনে এসব চিড়্ ধরল তার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যাবে রথী মস্ত বড় একটা ভুল করেছে ; এবং এরকম ভুল সবাইকেই বুঝি ভাগ্যের বিধানে করতে হয়। রথী নিজের মাপ বোঝেনি বা মাপ বুঝে সন্তুষ্ট হ'তে পারেনি। রথী হচ্ছে পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য সেই মানুষ যাকে বলে সাধারণ লোক। আগাগোড়া সব দিকে তার বাটখারা সমান হ'য়ে আছে, কোন দিকে বেশি ঝুলে পড়ে' জীবনটাকে একবগ্‌গা করে' দেয়নি। সে অসামান্য প্রতিভা পায়নি কিন্তু তেমনি প্রতিভার অপরিহার্য উন্মত্ততাও তার ছিল না। সকল দিক দিয়ে তার গড়ন সুসঙ্গত, সুষ্ঠু।

কিন্তু নিজের এই ঐশ্বর্যে রথী পারলে না সন্তুষ্ট হ'তে। সে হ'তে চাইলো অসাধারণ অর্থাৎ একদিকের পাল্লাকে অসম্ভব ভাবে ঝুলিয়ে জীবনটাকে বাঁকা করে' দেখা ও বেয়াড়া ভাবে পাওয়ার লোভে সে উঠ্‌ল মেতে। সম্পূর্ণতার বদলে চাইলো অসাধারণত্ব। এবং সেই লোভেই তার জীবনে প্রথম ফাটল ধরল।

তার সাধারণ জীবন-সম্পদে সন্তুষ্ট হ'য়ে রথী বেশ ভালো ভাবেই জীবন কাটাতে পারত। দু'বার কেন বার দশেক বি-এ ফেল করলেও তার কিছু আসত-যেত না। তারই মত সাধারণ ও স্বাভাবিক মেয়ে মাধুরীকে জীবনের সঙ্গিনী করে' সে পরম সুখে জীবন কাটিয়ে দিতে পারত। কিন্তু তার বদলে রথী দেখলে অসাধারণত্বের স্বপ্ন। এ স্বপ্ন শুধু নিজের জন্যে হয়ত সে দেখেনি, হয়ত ভেতরে-ভেতরে ছিল তার মাধুরীর কাল্পনিক প্রেরণা।

মাধুরীকে, পৃথিবীর সব চেয়ে কাম্যা নারীকে যে ভালোবাসে, সে কি হবে সাধারণ লোক,—এই হয়ত ছিল রথীর ভেতরকার কথা। মাধুরীর জন্যে সে নিজের চারিধারে কীর্তির জ্যোতির্মণ্ডল সংগ্রহ করতে চায়—মাধুরীর জন্যে সে চায় অসাধারণ হ'তে। এইখানেই রথীর ভুল, আবার এই খানেই রথীর পৌরুষের প্রমাণ।

মাধুরী হয়ত তাকে শুধু রথীরূপে পেয়েই খুসি, কিন্তু তাই বলে' রথী শুধু তাই থাকবে কেন? তার চার পাশে যারা আছে তাদের কাঁধ ছাড়িয়ে সে যদি না উঠতে পারে, তা হ'লে মাধুরীকে পেয়েও যে তার তৃপ্তি হ'বে না। মাধুরীকে সে ঠকিয়েছে এই অনুভূতি তার সমস্ত আনন্দ যে ম্লান করে' দেবে, তাই মাধুরীর যোগ্য হ'বার সাধনায় রথী নিজের পরিচিত স্বাভাবিক জগত ছেড়ে যেতে চাইল।

রথীর সকলের থেকে আলাদা হ'বার প্রেরণাকে অবশ্য অস্বাভাবিক বলা যায় না। কিন্তু পথ সে যে ভুল করল এটা ঠিক। সেই ভুল পথেই সে সিতিকণ্ঠকে ডেকে নিয়ে এল নিজের ঘরে, তার সঙ্গে আনল ট্র্যাজিডি।

সেদিন উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াবার সময় রথীর মনে কিন্তু বিশেষ করে' সিতিকণ্ঠের উপর কোন আক্রোশ ছিল না, মাধুরীর সম্বন্ধে বিশেষ কোন চিন্তাও তার মনকে অধিকার করে' তখন নেই। শুধু নামহীন অস্পষ্ট এক বেদনায় তার মন আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। এ বেদনা যেন গভীর কোন নেশার মত। তার ভেতর সে গেছে মগ্ন হ'য়ে, গভীর হতাশার কালো এক যবনিকা যেন ছোট-খাট সমস্ত ঘটনাকে ঢেকে দিয়েছে।

তার অন্তরের বেদনা অমন অতল না হ'লে হয়ত সে কিছু করতে পারত। করবার তো তার অনেক কিছুই ছিল। মাধুরীর সঙ্গে পরিচয় তার এমন কিছু ভাসা-ভাসা নয় যে সে সেখানে তার

অদ্ভুত ইঙ্গিতের কৈফিয়ত দাবি করতে পারে না, সিতিকণ্ঠকে তার মিথ্যাচরণের জন্যে জবাবদিহি দিতে বাধ্য করতেও সে তো পারে। কিন্তু সে সব কথা তখন তার মনে নেই। অভিযোগ, অনুযোগ বা বিদ্রোহ করবার অতীত লোকে সে তখন নেমে গেছে। গভীরতম বিশ্বাসে আঘাত খেয়ে সে এমন বিফল হ'য়ে গেছে যে ঘটনাগুলিকে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা আর তার নেই।

অনেকক্ষণ রাস্তায়-রাস্তায় এমনি ঘুরে বেড়িয়ে অবশেষে ক্লান্ত হ'য়ে রথী বাড়ি ফিরল। বাড়ি ফেরা সম্বন্ধে এতক্ষণ তার যেন অহৈতুক এক আশঙ্কা ছিল। সিতিকণ্ঠের সঙ্গে পাছে তার দেখা হ'য়ে যায়। সিতিকণ্ঠের সামনে মনের এই অবস্থায় সে কোন মতেই দাঁড়াতে পারবে না।

সে-ই যেন গভীর কোন অপরাধ করেছে এমনি ভাবে রথী সন্তর্পণে চোরের মত বাড়িতে গিয়ে উঠল।

সিঁড়ির গোড়ায় অর্জুন তখনও বসে'-বসে' ঢুলছে। তাকে পর্যন্ত না ডেকে রথী নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। না, ভয়ের কোন কারণ নেই, সিতিকণ্ঠের ঘরের আলো নেবানো। ঘরের ভেতর থেকে তার নাক ডাকার গভীর কর্কশ আওয়াজ আসছে। রথী যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। প্রকাণ্ড একটা বিপদ থেকে সে যেন বেঁচে গেছে।

নিজের ঘরের আলোটা জ্বালতেই কিন্তু অর্জুন ধড়মড় করে' উঠে পড়ে' বল্‌লে,—বাবু!

রথী অকারণ তার ওপরেই চটে গিয়ে চাপা গলায় ধমক দিয়ে বল্‌লে,—ষাঁড়ের মত চেঁচায় দেখ!

অর্জুন সত্যি ষাঁড়ের মত চেঁচায়নি, কিন্তু বাবুর ভর্ৎসনায় বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হ'য়ে সে অনুযোগের স্বরে বল্‌লে,—আপনার এত রাগ হ'ল যে!

রথী এবার আর কোন উত্তর দিলে না, জামা জুতো খুলে সটান বিছানায় শুয়ে পড়ল।

অর্জুন আরো কি বলতে যাচ্ছিল, রথী তাকে হাতের ইশারায় থামিয়ে মৃদুস্বরে বল্‌লে,—সুইচটা নিবিয়ে দিয়ে যা, আজ আর খাবো না।

অর্জুন তবু ইতস্তত করে' দাঁড়িয়েছিল, রথী বিরক্ত স্বরে বল্‌লে, —তুই কি সোজা কথা আজকাল বুঝিস্ না অর্জুন! বুদ্ধি দিন-দিন বাড়ছে, না?

অর্জুন হতাশার ভঙ্গিতে হাত দুটো একবার চিত করে' মনিবের আদেশ পালন করে' চলে' গেল। বাবু তার কাছে দিন-দিন দুর্বোধ হ'য়ে উঠছে।

ঘুম সে রাত্রে অনেকক্ষণ রথীর এল না। অন্ধকারে চোখ বুজে সে মিছেই বিছানায় পড়ে' রইল।

পাশের ঘর থেকে সিতিকণ্ঠের নিয়মিত নাকডাকার শব্দ আসছে। কি গভীর নিশ্চিন্ত আরামেই না সে ঘুমোচ্ছে। রথী শুনেছিল যে মনে যাদের গ্লানি আছে তারা নাকি ভালো করে' ঘুমোতে পারে না। কিন্তু সিতিকণ্ঠকে দেখে কে সে কথা বলবে! শিশুর মত গভীর তার নিদ্রা। আর শুধুই কি নিদ্রা! ভাবতে-ভাবতে রথীর বিস্ময় লাগছিল। সিতিকণ্ঠের যে পরিচয় আজ সে পেয়েছে তার কোন ছাপই তো তার চেহারায় বা আচরণে নেই! রথীর সত্যিই সন্দেহ হয় যে সে-ই ভুল করেছে কিনা! অমন সরল ধ্যান-গম্ভীর যার মুখ, অমন মধুর যার প্রকৃতি, তার ভেতর এ কপটতা কেমন করে' সম্ভব! রথীর সমস্ত গুলিয়ে যায়। আজকের দিনের ঘটনাগুলো তার অসম্ভব মনে হয়। মনে হয় সে যেন ভয়ানক একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছে মাত্র—জাগ্রত জীবনের সঙ্গে তার কোন যোগ নেই।

ষোল

একটু বেলাতেই রথীর ঘুম ভাঙ্গে। ঘরে বেশ আলো এসে পড়েছে। ঘর-দোর গুছিয়ে পরিষ্কার করে', চায়ের টেবিল সাজিয়ে অর্জুন বোধহয় চায়ের জল গরম করতেই গেছে, ঘুম থেকে উঠেও রথী সমস্ত শরীরে অসীম ক্লান্তি অনুভব করে। বিছানা ছেড়ে যেন তার উঠতে ইচ্ছে করে না। তার মনে হয় খুব বড় গোছের রোগ ভোগ করে' সে যেন এখনও ভালো করে' সেরে উঠেনি। মনে ও শরীরে দুঃসহ অবসাদ।

কালকের স্মৃতি তার কাছে অস্পষ্ট একটা বেদনার মত হ'য়ে আছে। পীড়া সে অনুভব করে' কিন্তু বেদনার কেন্দ্রস্থল যে কোথায় তা কিছুতেই যেন ঠিক করতে পারে না।

বিছানায় শুয়ে অর্জুনকে বকবে কিনা ভাবছে এমন সময়ে পাশের ঘরে কণ্ঠস্বর শুনে সে চমকে ওঠে!

সিতিকণ্ঠ সেখানে একলা নেই। আর কার সঙ্গে সে আলাপ করছে। সিতিকণ্ঠের উপস্থিতি টের পাবামাত্র রথী আবার ভীত হ'য়ে ওঠে। রাত্রির বিশ্রামও তাকে সিতিকণ্ঠের সম্মুখীন হ'বার শক্তি দেয়নি! সিতিকণ্ঠকে এখনও সে এড়িয়ে যেতে পারলেই যেন বাঁচে।

চুপিচুপি উঠে জামা পরে' সিঁড়ি দিয়ে যাবার অলক্ষ্যে নেমে পালিয়ে যাওয়া যায় কিনা রথী তাই মনে-মনে গবেষণা করে। এমন ভাবে পালিয়ে বেড়ানোটা তার কাছে অত্যন্ত খারাপ লাগে অবশ্য, নিজের প্রতি কেমন ঘৃণাও হয়, কিন্তু উপায় কি? সিতিকণ্ঠকে সোজাসুজি অভিযুক্ত করতে সে যে কিছুতেই পারবে না, অথচ তার সামনে কিছুই হয়নি এমন ভান করে' থাকাও তার

পক্ষে অসম্ভব। অবশ্য পালিয়ে বেড়ানো বরাবর চলবে না তা রথী জানে, আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্যও তাকে একদিন সিতিকণ্ঠের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হ'বে, কিন্তু সে বোঝাপড়ার দিনটা যত অনির্দিষ্টভাবে পেছিয়ে দেওয়া যায় ততই যেন ভাল।

কি ভাবে ঘর থেকে সরে' পড়বে সেই মতলব ঠিক করবার আগেই কিন্তু দরজার গোড়ায় হঠাৎ সিতিকণ্ঠের প্রসন্ন মূর্তি দেখা যায়।

—এই যে উঠেছ রথী! কাল কখন ফিরলে বল তো!

রথীর গলা থেকে একটা শব্দ বেরোয় কিন্তু সেটা ভাষাপদবাচ্য নয়। রথীর উত্তরের অর্থ না খুঁজেই সিতিকণ্ঠ বলে' চলে,—তোমার জন্যে জেগে জেগে বসে' আমি তো হয়রান হ'য়ে গেলাম। শেষকালে বল্‌লাম—দে অর্জুন, আমায় খেতে দে বাপু, আর পারিনে। অর্জুন তবু বলে—বাবু আসুক না। অর্জুনকে আর কি বলব, মনে মনে বল্‌লাম, বাবুর কি আর এখন বাড়ি আসার কথা মনে আছে রে, বাবু যেখানে গেছে সেখানে ঘড়ির কাঁটা নড়ে না। ক্ষিদে-তেষ্টাও পায় না।

সিতিকণ্ঠ উচ্চস্বরে হেসে ওঠে। সরল, প্রাণ-খোলা হাসি। সে হাসি শুনে রথী অবাক হ'য়ে যায়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সিতিকণ্ঠের মুখের দিকে একবার না তাকিয়ে সে পারে না। আশ্চর্য, এতটুকু অভিনয়ের ইঙ্গিত সে মুখে নেই। রথীর মনে সমস্ত আরো গোলমাল হ'য়ে যায়।

সিতিকণ্ঠ আবার বলে,—উঠে পড় হে, আজ আবার এক নতুন অতিথি এসেছে।

শেষ কথার সঙ্গে সিতিকণ্ঠের মুখ একটু বিকৃত হয়। নিজের মনের অবসাদের ভেতরও নতুন অতিথিটি কে জানবার জন্যে রথীর মনে একটু কৌতূহল জাগে। সে কৌতূহল নিবৃত্ত হ'তেও দেরি হয় না।

ও-ঘর থেকে ভারী গলায় শোনা যায়,—অতিথি তো এসেছে কিন্তু তার সৎকারের ব্যবস্থা কই? বেলা আটটা হ'ল, এক কাপ চায়ের চেহারাও তো দেখলাম না।

গলা চিনতে রথীর বিলম্ব হয় না—এ গলা শ্রীনিবাসের। অতিথি যেমনই হোক, এ কথায় রথী এবার লজ্জিত হ'য়ে উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি। তার ভদ্রতাজ্ঞানই প্রধান হ'য়ে তার মনের অন্য সমস্ত চিন্তাকে ছাপিয়ে যায়। হাঁক দিয়ে অর্জুনকে তাড়াতাড়ি চায়ের বন্দোবস্ত করতে বলে' সে মুখ হাত ধুতে বেরিয়ে যায়।

সে যখন ফিরে আসে তখন সিতিকণ্ঠের ঘরে টেবিলের ওপর চায়ের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হ'য়ে গেছে। তার জন্যে অপেক্ষা না করে'ই শ্রীনিবাস তখন নিজের পেয়ালায় টি-পট্ থেকে চা ঢালতে ব্যস্ত। রথীকে দেখে বাঁ হাতটা থিয়েটারী ভঙ্গিতে মাথায় তুলে সে মুখ না তুলেই বল্লে,—আসুন রথীবাবু, আপনার জন্যে অপেক্ষা না করে'ই নিজের পাত্রে চা ঢেলেছি বলে' কিছু অবাক হবেন না। ওটা আমার স্বভাব। কারুর জন্যে আমি অপেক্ষা করি না।

চা ঢালা সম্পূর্ণ করে' পাত্রটা নামিয়ে রেখে প্রচুর ভাবে দুধ ও চিনি মেশাতে-মেশাতে শ্রীনিবাস আবার বললে,—আপনি অবাক হচ্ছেন হয়ত ভেবে যে আমি কি করে' আপনার নাম জানলাম! কিন্তু ক্রমশ জানতে পারবেন যে আমি সব জানি, সকলকে জানি, সাহিত্যের রাজ্যের রাজা-মহারাজা নবাব-বাদশা থেকে সামান্য পদাতিক পর্যন্ত সকলের নাম আমার জানা। এক্ষুনি জিগ্‌গেস করলে আপনাকে: 'শেষের কবিতা' যে দপ্তরী বেঁধেছে তার নামও বলে' দিতে পারি।

রথী ততক্ষণে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে' ভদ্রতা হিসাবে শ্রীনিবাসের কথায় মৃদু একটু হাসবার চেষ্টা করছে। শ্রীনিবাসের কথার একটু ফাঁক পেয়ে সে একবার বললে,—আপনি বিস্কুট নিলেন না!

—সব নেবো, কিছু বলতে হবে না। যা দরকার আমি নিজেই নিয়ে থাকি, কারুর বলার অপেক্ষা রাখি না। না দিলে কেড়ে নেবার শক্তিও রাখি। শ্রীনিবাস বুকটা এবার চিতিয়ে সোজা হয়ে বসে' রথীর দিকে চেয়ে বললে,—আমি আপনাদের মিন্‌মিনে সাহিত্যিক নই, আমি প্রচুর পরিমাণে খাই, প্রবল ভাবে বাঁচি।

চায়ের পেয়ালায় সশব্দে এক চুমুক দিয়ে শ্রীনিবাস আবার বললে,—তারপর কি বলছিলাম—হুঁ মুখ চেনার কথা। আমি সকলের মুখ চিনি, বুঝেছেন রথীবাবু, সব মনে রাখি। রাস্তায় দেখা হ'লে ভুরু কুঁচকে—আপনাকে কোথায় দেখেছি মনে পড়ছে না তো—বলা আমার স্বভাব নয়। আপনাদের শরৎ চাটুজ্যে শুনি এক মাস এক সঙ্গে কাটিয়ে তিন দিন বাদে তাঁকে নমস্কার করলে আর চিনতে পারেন না, কিন্তু শ্রীনিবাস হালদার তেমন নয়।

একে তো সিতিকণ্ঠের সঙ্গে থাকতে রথী অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করছিল, তার ওপর শ্রীনিবাসের এই আত্মম্ভরিতা তাকে একেবারে অতিষ্ঠ করে' তুলল। কিন্তু উপায় নেই। মনে তার যাই হোক, ভদ্রতার খাতিরে তাকে বসে'-বসে' সব সহ্য করতেই হবে। এ চায়ের টেবিল থেকে উঠে যেতে তার শিক্ষা দীক্ষা সংস্কারে একান্ত ভাবে বাধে। অস্পৃষ্ট চায়ের পেয়ালা সামনে রেখে সে নীরবে বসে' রইল।

সিতিকণ্ঠ এতক্ষণ কোন কথা বলে নি। এবার মৃদু একটু হেসে প্লেট থেকে একটা বিস্কুট নিয়ে সে বললে,—তুই আজকাল বড় বেশি বক্‌বক্ করিস, শ্রীনিবাস।

—এনার্জি, এনার্জি ভাই, এই যে কি বলে এলান ভাইটাল, অর্থাৎ হ্লাদিনী শক্তি! তোমাদের মত রক্ত তো আমার শিরায় ঝিরঝির করে' কোন রকমে কায়ক্লেশে বয় না—এখানে রীতিমত

বন্ধ্যা বলেছে। টেবিলের ওপর একটা মুষ্ট্যাঘাত করে' শ্রীনিবাস বল্‌লে,—তোমাদের এই জোলো মেয়েলি সাহিত্যিকয়ানা আমি দস্তুরমত ঘৃণা করি। সেদিন তাই কে বল্‌লে না—শ্রীনিবাসবাবু, আপনার জন্ম হওয়া উচিত ছিল ইউরোপে—আপনার লেখায় এমন একটা হি-ম্যান-এর দৃপ্ত ভঙ্গি! আমি বল্‌লাম, শুধু লেখায় নয় হে, লেখায় নয়,—এই দেহে! পায়ে হেঁটে ল্যাণ্ডিকোটাল পর্যন্ত তোমাদের ক'টা সাহিত্যিক বেড়িয়ে এসেছে—ক'টা বাঙালী আঙ্গুর বেদানা ফেলে ঘোর পাঠানের হাত মুচড়ে দিতে পেরেছে পাঞ্জায়! আগে চাই দেহ, তার পর লেখা!

সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্বন্ধে এখনও রথীর মনে যথেষ্ট মোহ ছিল, কিন্তু আজ এরা দুজনে মিলে সেটুকুও যেন নিঃশেষে মুছে দেবার সঙ্কল্প করেছে।

সিতিকণ্ঠ একটু মুখ বেঁকিয়ে বল্‌লে—নতুন লোক দেখলে তুই বড় বেশি বাড়াবাড়ি করিস তো আজকাল!

—বাড়াবাড়ি! প্রাণের প্রাচুর্যকে তুই তো বাড়াবাড়ি বলবিই! বাড়াবাড়ি ক'টা লোক করতে পারে—বাড়তি কিছু থাকলে তো! তোদের যা আছে সে তো খেতে-ঘুমোতেই যায় ফুরিয়ে—চায়ের পেয়ালাটা হাতে নিয়েই চেয়ার থেকে উঠে পড়ে' শ্রীনিবাস দু'বার অপরূপ ভঙ্গিতে ঘাড় বেঁকিয়ে সমস্ত ঘরটা পায়চারি করে' এল, তারপর চেয়ারটায় ঘোড়ার মত চেপে বসে' বল্‌লে—আর নতুন লোক কে? শ্রীনিবাস হালদারের কাছে নতুন কেউ নেই, এক দণ্ডে দেশ-বিদেশের লোক পুরান হ'য়ে যায়। মানুষের অন্দর মহলের চাবিকাঠি খোলবার কায়দা জানতে হয় ভাই—জানতে হয়।

—চাবিকাঠি না সিঁদকাঠি!—সিতিকণ্ঠ একটু মুখভঙ্গি করে' বল্‌লে।

শ্রীনিবাস কিছুতেই দমবে না, বল্‌লে,—চাবিকাঠিতে না

কুলোলে ওটাও দরকার হয় বইকি। নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল।

রথী ক্রমশই পীড়িত হ'য়ে উঠছিল। কিন্তু তার শিক্ষা ও শাস্তির তখনও অনেক বাকি।

শ্রীনিবাস কিন্তু তাকে উদ্দেশ করে' বল্‌লে,—তারপর রথীবাবু, সাহিত্যের জগতের পাসপোর্ট তো আপনি পেয়ে গেছেন। সেদিন আপনার একখানা বই যেন দেখলাম কোন্ স্টলে!

রথী সবিনয়ে বল্‌লে,—হ্যাঁ লিখেছি ওই একখানাই; আপনি পড়েছেন?

চশমার তলা থেকে ভুরুটা একটু কুঁচকে মেকি হতাশার ভঙ্গিতে শ্রীনিবাস বল্‌লে—না, সে সৌভাগ্য আর হ'ল কই! বাংলা বই কিনে পড়ার অভ্যাস বহুকাল গেছে কিনা। নতুন লেখকেরা—সবই কি মনে করে জানি না—এক-আধটা পাঠিয়ে দেয়। যা পাঠায় তাই পড়ে' উঠতে পারি না। আপনাকে অবশ্য বই না পাঠাবার জন্য দোষ দিচ্ছি মনে করবেন না।

রথী কিছু না বলে' চুপ করে' বসে' রইল। শ্রীনিবাসকে বই না দেবার জন্যে লজ্জিত হবার ভান করকার উৎসাহও আর তার নেই।

সিতিকণ্ঠই বললে—তোকে আবার সবাই বই পাঠায় নাকি রে? কবে থেকে?

এ ব্যঙ্গের প্রত্যুত্তরে উপযুক্ত মুখভঙ্গি করে' শ্রীনিবাস বললে,—অনেক দিন থেকেই তো পাঠাচ্ছে দেখছি,—কেন, তোকে পাঠায় না?

সিতিকণ্ঠ জবাব দিলে,—সবাই সাহস করে না।

—ওই ভেবেই খুসি থাক। বলে' শ্রীনিবাস আর একবার ঘরটা পায়চারি করে' এল এবং হঠাৎ যেন উপাদেয়তর বিষয়ের সন্ধান পেয়ে উত্তেজিত ভাবে ব'সে প'ড়ে বললে,—ওরে, কাল মহিতোষকে খুব এক হাত নিয়েছি যে।

এইবার সিতিকণ্ঠের মুখ উঠল উজ্জ্বল হ'য়ে। দুই সাহিত্যিকের ভেতরকার আবহাওয়া রেষারেষিতে যেটুকু বিষাক্ত হ'য়ে আসছিল পরনিন্দার সুযোগে সেটুকু যেন কেটে গেল।

সিতিকণ্ঠ উৎসুক ভাবে বললে,—কি রকম!

—ওর নতুন একটা বই বেরিয়েছে না—জন্মান্তর! সেইটে হাতে করে' কোথায় যাচ্ছিল, ভাগ্যক্রমে আমিও উঠে পড়েছি সেই ট্রামে, বললাম্—ও হে, বইখানা উল্টেই না-হয় ধরে' থাক—ট্রামের লোকেরা নামটা একটু দেখতে পাক্—ভালো বিজ্ঞাপন হ'বে। মুখে আর কথাটি নেই।

সিতিকণ্ঠ একটু হতাশ ভাবে বললে,—এই!

—শোন্ আগে সবটা। তারপর পাশে বসে' পড়ে' বইটা চাইলাম। দিতে প্রথমত কিছুতেই রাজি নয়, এক রকম কেড়েই নিতে হ'ল। উল্টে-পাল্টে দেখে বললাম, ছাপার একটু ভুল হ'য়ে গেছে যে ভাই। শেষকালে 'ইংরাজি উপন্যাসের অনুকরণে'টুকু যে উঠে গেছে! মুখ একেবারে এতটুকু। আমার সঙ্গে কথা না কয়েই বইটা নিয়ে নেমে গেল।

সিতিকণ্ঠ অত্যন্ত ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞাসা করলে,—সত্যি চুরি নাকি বইটা?

শ্রীনিবাস বললে—তা নয় তো কি! ওসব গল্পের প্লট ওর মাথায় আসে কখনো?

—কোন্ বই থেকে বল তো? দিই সব ফাঁস করে'। আমায় একবার বড্ড যা-তা বলেছিল। সিতিকণ্ঠ দেখা গেল বেশ উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছে।

শ্রীনিবাস তাচ্ছিল্যভরে বললে,—তা কেমন করে' বলব! ওসব আজকালকার ইংরিজি বই-টই আমি পড়ি না—আজকালকার লেখকেরা আবার ইংরেজি লিখতে জানে নাকি!

চুরিটা সদ্য-সদ্য ধরতে না পেরে সিতিকণ্ঠ একটু হতাশই

হয়েছিল, তবু সেটা দমন করে' সে বললে,—আমি ভেবে পাই না এ সব বই লোকে পয়সা দিয়ে কেনে কি করে'। কি আছে ওতে?

শ্রীনিবাস গম্ভীর ভাবে ভবিষ্যদ্বক্তার মতো বললে,—আজ কিনেছে কিনুক, কিন্তু চিরদিন কিনবে না, ঝুটো পালিশ ধুয়ে যেতে বেশিদিন লাগে না।

কিন্তু সিতিকণ্ঠ এ আশ্বাসে সান্ত্বনা পায় না, কিম্বা তার বিশ্বাসই তেমন এ কথায় নেই। তিক্ত কণ্ঠে সে বললে,—আজকালকার লেখা পড়ে' এক-এক সময় লিখতেই ইচ্ছে করে না আর! কি জন্যে লেখা—মুড়ি-মিছরির যেখানে এক দর!

শ্রীনিবাস হঠাৎ সুর পাল্টে বললে,—তা যা বলেছিস! তোর লেখা আজকাল বন্ধ করাই ভাল! কি ছাই-পাঁশ লিখছিস আজকাল! নতুন বই যেটা লিখেছিস সেটা কি হয়েছে? হ্যাঁ, ছাপাতে লজ্জা হওয়া উচিত ছিল, সেই পাড়াগাঁয়ের ঘ্যানঘ্যানানি আর কতদিন চালাবি?

সিতিকণ্ঠ প্রথমটা সত্যই এ অপ্রত্যাশিত আক্রমণে থতমত হ'য়ে গেছল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই সামলে নিয়ে দুই চোখের দৃষ্টি স্তিমিত করে' গভীর ব্যঙ্গের স্বরে বললে,—আমার লেখা বড্ড খারাপ লাগছে আজকাল তা হ'লে শ্রীনিবাস! নায়ক-নায়িকার মাথায় একটুও ছিট নেই—যখন-তখন যা-তা আবোল-তাবোল বকে না—ভালো না লাগবারই কথা।

রথী যে উপস্থিত তা এরা যেন দু'জনে ভুলেই গেছে পরস্পরের হিংসায়। কিন্তু রথীর পক্ষে তাই বুঝি শুভ। এমন করে' একদিনে তার চোখের পর্দা তা না হলে বুঝি খসে' পড়ত না! রথীর সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে। কি অকিঞ্চিৎকর ঈর্ষা ও অহঙ্কারের জগতে এরা বিচরণ করে! সাহিত্যের প্রতি মোহ যদি তার ছিল, তবে এর ঊর্ধ্বে কেন সে সন্ধান করেনি এই ভেবেই তার আফসোস হচ্ছিল।

সিতিকণ্ঠের ব্যঙ্গ গ্রাহ্য না করে'ই নাটুকে ভঙ্গিতে হাত নেড়ে শ্রীনিবাস বললে,—একটু বড় হ—বড় হ, মাথা তুলে তুনিয়ার দিকে চাইতে শেখ্,—নইলে ওই পানাপুকুরে ডুব দিয়ে শুধু পাঁক তুলেই মরবি চিরকাল।

সিতিকণ্ঠ তীব্র বিদ্রূপের স্বরে বললে,—বটে!

শ্রীনিবাস নিজের উৎসাহেই বলে' চলল,—তুটো তুশ্চরিত্র মেয়ে, গাঁয়ের খানিকটা নোংরা ঝগড়া কচ্‌কচি—এই পুঁজি ভাঙিয়ে আর কতদিন চালাবি? মানুষকে চিনতে শেখ, বিশাল পৃথিবীর দিকে চেয়ে ত্যাখ্, মানবাত্মার অসীম রহস্য বোঝ্।

—যেমন তুই বুঝেছিস্—আমি শুধু ভাবি তুই কি ছিলি আর কি হয়েছিস! চাপা রাগে সিতিকণ্ঠের গলার স্বর পর্যন্ত বদ্‌লে গেছে।

শ্রীনিবাস হো-হো করে' হেসে উঠে বললে—তেজস্বীর ধর্মই তো তাই রে। যা ছিল তা সে থাকে না। নদীর মোহানা আর উৎস কখন এক হয়?

—আবার আঙ্গুল ফুলে কলাগাছও হয়।

—তাও হয় বই কি! সে দৃষ্টান্ত তো দেখতে পাচ্ছি সামনেই।

এবার তুজনে ভদ্রতার মুখোসটুকুও পরিত্যাগ করেছে। নির্লজ্জ মূর্খ মেয়েমানুষের মত তুজনে পরস্পরের প্রতি আক্রোশে অন্ধ হ'য়ে গেল।

সিতিকণ্ঠের আক্রোশই যেন বেশি, কিন্তু বাইরের উত্তেজনা যথাসম্ভব দমন করবার চেষ্টা করে মুখে ব্যঙ্গের হাসি টেনে সে বললে,—বালির কাগজে গল্প লিখে শোধরাবার জন্যে যখন আমার মেসে ছুটতিস, তখনকার কথা মনে আছে শ্রীনিবাস?—তোর তো সব মনে থাকে!

—তা থাকে বই কি! বলিস তো জীবনচরিতে ও-কথাটা

লিখেই যাব। ভাবীকালে এই গৌরব নিয়েই তুই তো বেঁচে থাকবি,—একদিন শ্রীনিবাস হালদারের লেখা সংশোধন করেছিস। কিন্তু তাতে এমন কিছু হল কি—একদিন নেপোলিয়নকেও দাই-এর হাতে মানুষ হতে হয়েছিল তো। তার জন্যে দাই পেয়েছিল ভাতা, আর নেপোলিয়ন হল সম্রাট!

সিতিকণ্ঠ অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে বললে,—দুঃখ আর কিছুর জন্যে নয়—শুধু শিব গড়তে এমন বাঁদর হবে বুঝতে পারিনি।

—সে কেরামতি তো তোর আছে সব কাজেই, লিখতে চাস এক, হয় আরেক! কিন্তু আজকাল তো শুনি সভ্য সমাজে মিশছিস, ভালো-ভালো দুএকটা মেয়ের সঙ্গেও আলাপ নাকি হচ্ছে —একটু শোধরাতে পারিস না? কিন্তু তাই বা শোধরাবি কেমন করে? শুক্‌নির নজর সব সময়েই ভাগাড়ে!

সিতিকণ্ঠ একবার জবাব খুঁজে পাবার আগেই শ্রীনিবাস আবার বললে,—সেদিন কে একটা মেয়ের নাম করছিলি না? তোর সঙ্গে গভীর প্রেমে পড়ে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছে—গোপনে চিঠিপত্র চলেছে—

সিতিকণ্ঠ হঠাৎ যেন অত্যন্ত ভীত হয়ে বাধা দিতে গেল, কিন্তু শ্রীনিবাস থামবার পাত্র নয়। সে বলে চলল,—না হয় তাকে নিয়েই কিছু লেখ্ না,—পাড়াগাঁয়ে নষ্ট মেয়ে আর শহুরে পতিতার পচা গল্প থেকে মুখ বদ্‌লে পাঠকরা দুদিন বাঁচুক। না, এ দেবতারও বুঝি খড়ের কাঠাম! বাইরের ঘরে বেডরুমে তফাত নেই। তোর সঙ্গে যে প্রেমে পড়ে সে আর ওর বেশি কি-ই বা হবে! কি নাম বলেছিলি—মাধুরী না কি?

শ্রীনিবাস হয়ত আরও কিছু বলত, কিন্তু হঠাৎ সামনের দিকে চেয়ে তার কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হয়ে গেল। কাঁপতে-কাঁপতে রথী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। মানুষের মুখের এমন চেহারা শ্রীনিবাস

বোধহয় কখনো দেখেনি। কিছু বুঝতে না পেরে অহৈতুক ভয়ে তারই মুখ হঠাৎ সাদা হয়ে গেল।

রথীর সমস্ত মুখ টকটকে রাঙা হয়ে উঠেছে। টেবিল ধরে' কয়েক সেকেণ্ড স্পন্দহীন অবস্থায় দাঁড়িয়ে সিতিকণ্ঠের দিকে অদ্ভুত ভাবে একবার চেয়ে রথী দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ। সিতিকণ্ঠের মুখের অবিচলিত ধ্যানময় গাম্ভীর্য একেবারে ছুটে গেছে। শ্রীনিবাস বিমূঢ়।

সতেরো

রথী ঘরে ফিরে এল নতুন সঙ্কল্প নিয়ে। বেশিক্ষণ সে বাইরে থাকেনি, বড় জোর ঘণ্টা দু'-এক নিজের বিশৃঙ্খল মনকে শান্ত করবার জন্যে সে এদিক-ওদিক ট্রামে চেপে বেড়িয়ে এসেছে। কিন্তু এই দু'ঘণ্টায় নিজের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া সে যেন করে' ফেলেছে। এই দু'ঘণ্টায় সে যত গভীর ভাবে যা ভেবেছে গত দু'বছরেও তা সে ভাবেনি। নিজেকে স্পষ্ট করে' দেখবার, নিজের প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করবার এমন চেষ্টা আর কখনো সে করেছে কিনা সন্দেহ।

এই আত্মবিচারে একটা জিনিস সে বেশ ভাল করে'ই বুঝতে পেরেছে—সে অত্যন্ত দুর্বল, একেবারে মেরুদণ্ডহীনও বলা যেতে পারে। নিঃস্বার্থ হ'বার চেষ্টায় সে নিজেকে একেবারে অপদার্থ করে' তুলেছে, ভদ্রতার চরমে গিয়ে সে নিজের স্বাতন্ত্র্য এমন কি আত্মসম্মানও হারাতে বসেছে। কিন্তু সত্যি তার চরিত্রের ভিত কি অত কাঁচা! অত দুর্বল কি তার মনের কাঠাম! রথীর তা বিশ্বাস করতেই ইচ্ছা হয় নি। মনে হয়েছে এতদিন কেমন একটা গাঢ় নেশায় সে আচ্ছন্ন হয়েছিল, সে নেশা তার ইচ্ছাশক্তিকে রেখেছিল ঘুম পাড়িয়ে। সেই নেশার ঝোঁকে নিজেকে সে বিলুপ্ত করে রেখেছে, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার সাহস সঞ্চয় করতে পারে নি। নিজের এই দুর্বলতার জন্যেই সে চারিধারে অনেক মিথ্যা অনেক অন্যায়কে চোখ বুজে প্রশ্রয় দিয়েছে, আত্ম-অপমানের বিরুদ্ধেও হাত তুলতে সাহস করে নি।

সমস্তটাই অবশ্য তার দোষ নয়। সিতিকণ্ঠকে প্রথমটা তার চিনতেই ভুল হয়েছিল। সিতিকণ্ঠের চারিধারে সাহিত্যের যে জ্যোতি বিকীর্ণ, তাতেই গেছল তার চোখ ধাঁধিয়ে আর কিছু সে

দেখতে পারেনি। সিতিকণ্ঠের চরিত্রের আসল স্বরূপ তাই সাহিত্যের চোখ-ঝলসানো আলোয় আড়াল হ'য়ে গেছল। মানুষ সিতিকণ্ঠে ও সাহিত্যিক সিতিকণ্ঠে যে কতখানি তফাত তা দেখবার কথা তার মনে হয়নি।

তারপর ঘটনার পর ঘটনা যখন স্পষ্ট অঙ্গুলি-নির্দেশ করে' সিতিকণ্ঠের চরিত্রের অন্ধকার দিকটি তাকে দেখাতে চেয়েছে, তখনো তার মনের মোহ কাটেনি। মনের ছোট-খাটো সন্দেহ অত বড় প্রতিভার প্রতি সবিস্ময় শ্রদ্ধার স্রোতে ভেসে গেছে।

কিন্তু তারপর? তারপর সিতিকণ্ঠের সত্যকার পরিচয় সম্বন্ধে নিজেকে প্রতারিত করবার কোন সুযোগই যখন তার রইল না, তখনো সে দুর্বলভাবে পালিয়ে থাকতে চেয়েছে কেন? মিথ্যা ও কপটতাকে উপযুক্তভাবে সম্ভাষণ করতে কেন তার এত দ্বিধা! নিজের মনের কাছে সাহিত্যিক মোহের অজুহাত আর তো তার তোলা চলে না। এ যে শুধু তার ভীরুতা, কাপুরুষতা!

এ কাপুরুষতা তাকে কত নিচে টেনে নিয়ে যাবে! সিতিকণ্ঠ তার যে ক্ষতি করেছে সে কথাও না হয় সে তুলতে পারে, কিন্তু মাধুরী! মাধুরীর পবিত্র নাম যাদের মুখে অমন ভাবে কলঙ্কিত হয়েছে, তাদেরো সে কি ক্ষমা করবে?

রথীর সমস্ত দেহ রাগে কঠিন হ'য়ে ওঠে। অমন করে' ঘর থেকে নিষ্ফল রাগে চলে' আসা তার কখনই উচিত হয়নি। সংযমের নামে নিজের এ দুর্বলতাকে সে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারে না। ভদ্রতার, সৌজন্যের দোহাই তার কাছে এখন অত্যন্ত ফিকে ঠেকে।

অবশ্য এই সৌজন্যের সংস্কারই তখন তাকে পঙ্গু করে' রেখেছিল, যে অর্থহীন ভদ্রতার দীক্ষা তার মনকে স্থবির করে' রেখেছে, তার বিরুদ্ধে এখন তাই তার সমস্ত আক্রোশ জেগে ওঠে। এ দুর্বলতা তাকে পরিত্যাগ করতে হবে। রথী গভীর ভাবে সঙ্কল্প করে

সিতিকণ্ঠকে সামনা-সামনি এবার সে কৈফিয়ত দিতে আহ্বান করবে, কোন অভিযোগ সে চেপে রাখবে না। তার সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করতেও সে প্রস্তুত।

দৃপ্ত পদক্ষেপ করেই রথী সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল, কিন্তু ঘরের ভেতর ঢোকবার পর কেমন যেন পদশব্দ আপনা হতেই হ'য়ে এল মৃদু। না, রথী সঙ্কল্প হারায়নি, তবে আস্ফালন করবারও তো কোন অর্থ হয় না। আস্ফালনটা দুর্বলতারই তো অপর পিঠ।

রথী পরদা সরিয়ে কঠিন মুখ নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকলো, কিন্তু সেখানে সিতিকণ্ঠ নেই।

রথী অসহিষ্ণু ভাবে ডাকলো ঃ অর্জুন!

অর্জুন এসে দাঁড়াতে সে গম্ভীর হ'য়ে জিগ্‌গেস করলে,—কোথায় গেছে বাবু?

—বাবু তো অনেকক্ষণ বেরিয়ে গেছে, সেই যে কে আপনার বন্ধুলোক এসেছিল—সে গেল আগে, তারপর গেল বাবু।

রথী খানিক চুপ করে' থেকে জিগ্‌গেস করলে,—আমায় কিছু বলে গেছে নাকি!

—না তো!

—আচ্ছা তুই যা—বলে' রথী নিজের ঘরে এসে বসল।

এ বিলম্ব অসহ্য। সঙ্কল্পপূরণের প্রথমেই এমন বাধা হ'বে রথী কল্পনা করে নি।

সমস্ত মন যখন উত্তপ্ত হ'য়ে আছে, সঙ্কল্প যখন নবীন, তখন প্রতিপক্ষের জন্যে ধৈর্য ধরে' অপেক্ষা করবার মত যন্ত্রণা বুঝি আর কিছুতে নেই। তা ছাড়া অপেক্ষা করা সম্বন্ধে রথীর মনে একটু ভয়ও বুঝি ছিল। তার মনের উত্তাপ জুড়িয়ে যাবার ভয়! এখন মনের এই অবস্থায় সে সব কিছুর সম্মুখীন হ'তে পারে—কিন্তু উত্তেজনার এই মুহূর্ত কেটে গেলে আবার হয়ত নেমে আসবে তার মনের দুর্বলতা ও জড়তা, আড়ষ্ট হ'য়ে যাবে তার মন।

তা কিন্তু কিছুতেই দেওয়া হবে না। নিজেকে সঙ্কল্পের শিখরে প্রতিষ্ঠিত রাখবার জন্যে রথী হঠাৎ মাধুরীকে চিঠি লিখতে বসলো। মাধুরীর সঙ্গে এতদিনের পরিচয়ের মধ্যে চিঠি রথী তাকে কখনো লেখেনি—লেখবার দরকার হয়নি। যখনই প্রয়োজন হয়েছে মাধুরীর সান্নিধ্য সে পেয়েছে—পেয়েছে অনায়াসে। প্রেমের সার্থকতার জন্যে যে বাধার প্রয়োজন, সে বাধা রথীকে তাই নিজের কল্পনা দিয়েই গড়তে হয়েছে এত দিন।

আজ কিন্তু সত্যিই ভাগ্য তুজনের মধ্যে প্রাচীর তুলে দিয়েছে। কল্পনার বাধা সৃষ্টি করে' সে খুসি ছিল—সত্যকার এই বাধার সম্মুখে এসে রথীর মন একেবারে গেছে মুষড়ে। এতদিনে সে যেন বুঝতে পারে মাধুরীকে জয় করে' নেবার কথাটা নিজের কাছে তার একটা ছলনা মাত্র। পৌরুষের অভিমানের কাছে তার নিজের মনের মিথ্যা একটা চাটুবাদ। আসলে তার মন বহুদিন আগেই মাধুরীর ওপর অধিকার সাব্যস্ত করে' নিয়েছে। মাধুরী একান্ত ভাবে যে তার, এ সম্বন্ধে অন্তরের গোপনে সে নিশ্চিন্ত। অধিকারবোধের এই গভীর প্রত্যয়ই তার মনে এতদিন উৎসাহ জুগিয়েছে, তুর্লভ মাধুরীকে জয় করবার প্রেরণা নয়।

সেই গভীর প্রত্যয় হঠাৎ ঘা খেয়ে একদিনে টলমল করে' উঠেছে।

রথী অনেকখানি চিঠি লিখে হঠাৎ থেমে সমস্ত কুটিপাটি করে' ছিঁড়ে ফেল্‌ল,—এ কি পাগলের মত সে লিখছে। এ প্রলাপ পড়ে' কি ভাববে মাধুরী। যেটুকু শ্রদ্ধা তার ওপর মাধুরীর আছে তাও যাবে উবে।

কিন্তু কেমন করে' মাধুরীর কাছে তা' হ'লে চিঠি লেখা যায়। রথী কিছুই ভেবে পায় না। অথচ মাধুরীকে এখন তার না পেলেই নয়। অন্তত চিঠির মধ্য দিয়েও তার উষ্ণ সান্নিধ্য অনুভব করতে না পারলে নিজের বিলীয়মান আত্মপ্রত্যয় সে

আর বজায় রাখতে পারবে না। চারিদিকে তার সমস্ত আদর্শে, সমস্ত স্বপ্নে আজ ফাঁকি বেরিয়ে পড়েছে, তার সমস্ত বিশ্বাসের ভিত হঠাৎ দেখা গেছে আলগা। এই মুহূর্তে মাধুরীও যদি তাকে আশ্রয় না দেয়, সেও যদি তাকে পরিত্যাগ করে—তা হ'লে কি নিয়ে সে দাঁড়াবে!

মাধুরীকে কি মিনতি করে' চিঠি লেখা যায়! কিন্তু কিসের জন্যে মিনতি? মাধুরী ও তার মধ্যে হঠাৎ যে ব্যবধান প্রকট হ'য়ে উঠেছে, তার স্বরূপই যে একান্ত অস্পষ্ট, ভালো করে' এই আকস্মিক বাধার অর্থ সে যে বুঝতে পারেনি। তবে কি নিয়ে সে মিনতি করবে!

মাধুরীর সেদিনের ব্যবহার রূঢ়তার দিক দিয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট, কিন্তু হেতু তো তার কিছুই ভেবে পাওয়া যায় না। নির্মেঘ মধ্যাহ্নের আকাশ হঠাৎ এসেছে অন্ধকার হ'য়ে। সে অন্ধকারের বেদনাটুকু সে উপলব্ধি করেছে মাত্র, কারণ কিছুই বুঝতে পারেনি।

সেদিন তার মনের অবস্থা অমন না হ'লে হয়ত মাধুরীকে সে প্রশ্ন করতে পারত এ বিষয়ে, মাধুরীর আকস্মিক পরিবর্তনের কৈফিয়ত সে তো অনায়াসে দাবি করতে পারে। কিন্তু তখন আঘাতটাই তার কাছে বড় হয়ে উঠেছিল, তার পেছনের হেতু অনুসন্ধান করবার অবসর তার ছিল না। ভাগ্যের আকস্মিক অভিশাপে সে তখন অভিভূত।

অস্পষ্ট ভাবে রথীর মনে হয় মাধুরীর সেদিন তার বিরুদ্ধে কি একটা অভিযোগ ছিল, হয়ত সিতিকণ্ঠের উপস্থিতির সঙ্গে সে অভিযোগের কোন সম্বন্ধও আছে। কিন্তু এইটুকুর বেশি আর সে অগ্রসর হ'তে পারে না। তার পরেই অন্ধকার অনিশ্চয়তা। তবে চিঠিতে রথী কি কঠোর ভাবে মাধুরীর কাছে কৈফিয়ত দাবি করবে সেদিনের আচরণের? কিন্তু তাও যেন সম্ভব নয়, তাদের

সম্বন্ধটিকে অমন ভাবে অপমান করতে সে পারবে না, আর মাধুরীর কাছে অমন কৈফিয়ত পেয়ে তার লাভই বা কি! তাদের সম্বন্ধের নিষ্কলঙ্ক মাধুর্যকে তো জোর করে' ফিরিয়ে আনা যায় না!

শেষ পর্যন্ত রথী অত্যন্ত সংযত ভাবে একটি চিঠি লেখবার চেষ্টা করলে। সে লিখলে—তোমার কাছে এই আমি চিঠি লিখছি, হয়ত এই আমার শেষ চিঠি। তোমায় পত্রে সম্ভাষণ করবার অধিকার আর আমি পাব কিনা জানি না। এ চিঠিতে আমার অনেক কথাই লেখবার ছিল, কিন্তু লিখতে পারলাম না। উদ্বেল মনের এ ব্যাকুলতাকে ভাষায় প্রকাশ করবার ক্ষমতা আমার নেই, সে দুশ্চেষ্টাও করব না। আমি শুধু সহজ ভাবে গোটাকতক কথা তোমায় জানিয়ে যাচ্ছি। একদিন তুমি আমায় তোমার অত্যন্ত নিকটে যাবার অধিকার দিয়েছিলে, অন্তত আমি নিজের মূঢ়তায় তাই বিশ্বাস করেছিলাম। তোমার সান্নিধ্যতপ্ত সে দিনগুলি আমার জীবনে উজ্জ্বল হ'য়ে রইল— চিরকাল থাকবে। আজ তুমি আমার প্রতি বিরূপ হয়েছ। কেন হয়েছ তার কারণ আমি জিজ্ঞাসা করব না; কারণ আমি জানি, ভালোবাসা তর্কের বিষয় নয়, সে যখন যায় বিচার বিশ্লেষণ করে' তাকে ফিরিয়ে আনা যায় না। আমি অপরাধ নিশ্চয় করেছি, তার শাস্তিও আমি নিলাম, কিন্তু এইটুকু শুধু জেনো, নিজের মূঢ়তায় আমার অধিকারের সীমা আমি যদি ছাড়িয়েও গিয়ে থাকি, কাল্পনিক হোক, সত্য হোক, তোমার প্রেমের বিশ্বাসের অমর্যাদা আমি করিনি কখনও—

—রথী!

রথী চম্‌কে চিঠি থেকে মুখ তুলে তাকাল। সিতিকণ্ঠ কখন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সে টেরও পায়নি। সবিস্ময়ে সে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। সিতিকণ্ঠের মুখে বেদনার অনুশোচনার গাঢ় ছায়া। গলার স্বর তার অসম্ভব রকম ভারী।

সিতিকণ্ঠের জন্যেই এতক্ষণ ধরে’ রথী মনের সমস্ত উত্তেজনা সঞ্চয় করে’ রেখেছে, কিন্তু তাকে এমন ভাবে দেখবে সে আশা করেনি।

রথী কেমন যেন স্তব্ধ হ’য়ে গেল সে চেহারার সামনে। সিতিকণ্ঠ যেন একেবারে ভেঙ্গে পড়ছে, দাঁড়াবার ভঙ্গিটিতে পর্যন্ত তার গভীর আত্মগ্লানির ইঙ্গিত।

সিতিকণ্ঠ আবার একবার গাঢ় স্বরে ডাকলে,—রথী।

নিজের অজ্ঞাতেই রথী যেন বলে’ ফেলল,—বোসো, সিতি-দা!

সিতিকণ্ঠ কিন্তু সে কথা যেন শুনতেই পেল না; ঠোঁট কাঁপিয়ে অনেক কষ্টে যেন ভেতরের বেদনা চেপে সে ভাঙা, ক্লান্ত গলায় বল্‌লে,—আমায় ক্ষমা করো, রথী।

রথীর সমস্ত মতলব তখন গুলিয়ে গেছে। সিতিকণ্ঠকে অভিযুক্ত করবার জন্য যে সমস্ত কড়া-কড়া কথা সে সাজিয়ে রেখেছিল, সমস্ত যেন সিতিকণ্ঠেরই এই অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনে গেল গোল পাকিয়ে। বিমূঢ় ভাবে সে শুধু সামনের দিকে তাকিয়ে রইল।

—আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড় রথী, কিন্তু তবু আমার ইচ্ছে করছে পায়ে ধরে’ আজ তোমার কাছে ক্ষমা চাই। আমি অত্যন্ত নির্বোধ রথী, অত্যন্ত অমানুষ, শুধু দু’টো কথা সাজিয়ে লিখতে পারলেই মানুষ হওয়া যে যায় না আজ আমি তা ভাল করে’ বুঝেছি, রথী। তোমার বন্ধুত্বের আমি যোগ্য নই।

রথীর মাথায় এ সমস্ত কথার কোনো অর্থই যেন প্রবেশ করল না। তার মনের ভেতর অদ্ভুত আলোড়ন চলছে—সিতিকণ্ঠের কপটাচারের জন্যে ঘৃণা, নিজের হতাশা, সিতিকণ্ঠের বর্তমান আত্মগ্লানির উচ্ছ্বাসে করুণা, তার সঙ্গে পূর্বেকার শ্রদ্ধার স্মৃতি, সমস্ত মিলে তাকে একেবারে বিহ্বল করে’ দিয়েছে।

সিতিকণ্ঠ আবার বলতে লাগল,—তবু একটা কথা বলি,

আমায় বিশ্বাস করো রথী, তোমার প্রেমের পাত্রীর অপমান আমি ইচ্ছে করে' করিনি। আমার মূঢ়তার জন্যে আমি তোমার সমস্ত ভর্ৎসনা মাথায় পেতে নিতে এসেছি, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে আর কিছু অভিযোগ তুমি রেখো না।

গলার স্বর আরো নামিয়ে প্রায় চুপিচুপি সিতিকণ্ঠ তারপর বললে,—আমি শ্রীনিবাসকে মাধুরীর কথা বলেছিলাম—বলেছিলাম তাদের বাড়ি আমি নিমন্ত্রণে যাচ্ছি, কিন্তু সেই কথাকে ওর পচা মনে অমন বিকৃত করে' প্রকাশ করবে তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি।

গলাটা হঠাৎ চড়িয়ে যেন নিজেকে সামলে নিয়ে রথীর দিকে সোজা তাকিয়ে সিতিকণ্ঠ বললে,—তবু আমারই সব অপরাধ, রথী। তাঁর নাম ওর কাছে উচ্চারণ করাই আমার অন্যায় হয়েছে—নিবুদ্ধিতার চরম পরিচয়। তার জন্যে আমি শাস্তি চাই, রথী।

—না রথী, অমন চুপ করে' থাকলে চলবে না, তুমি আমায় গাল দাও ; ভর্ৎসনা করো, নইলে আমি শাস্তি পাব না, আমার মনের এ অসহ্য যন্ত্রণা দূর হবে না। কিন্তু ভাই, শেষ পর্যন্ত আমায় ক্ষমা কোরো।

খানিকক্ষণ দু'জনেই নীরব।

রথীর মুখ থেকে হঠাৎ এতক্ষণ বাদে যেন আর্তনাদের মত স্বর বেরুল ঃ আমি যে তোমায় অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতাম, সিতি-দা!

তার মুখ থেকে কথাটা একরকম কেড়ে নিয়ে সিতিকণ্ঠ বললে, —ভুল করতে, রথী! শ্রদ্ধা করবার কি আছে আমার ভেতর? সামান্য একটু সাহিত্যিক প্রতিভা! কি তার দাম, রথী। মনুষ্যত্বের মাপকাঠিতে তার যে এতটুকু মূল্য নেই সে তো আমার চেয়ে কেউ ভালো জানে না ভাই। আর আমি তো ভাই তোমার শ্রদ্ধা চাইনি—চেয়েছিলাম তোমার ভালোবাসা। শ্রদ্ধা অতি সুলভ

জিনিস রথী, রাস্তায় যে কোন লোকের কাছে তা পাওয়া যেতে পারে—কিন্তু ভালোবাসা যে এই স্বার্থপরতার জগতে মেলে না ভাই! আমার জীবনে সেইটেরই যে অভাব ছিল। খ্যাতি, অর্থ সব পেয়েও যে বুকটা তাই খাঁ-খাঁ করেছে রাতদিন। যে ভালোবাসা সব অপরাধ ক্রটি বিচ্যুতি ক্ষমা করতে পারে—যে ভালোবাসা আমার গুণের জন্য নয়, আমার প্রতিভার জন্যে নয়, আমার সমস্ত দোষগুণসমেত সম্পূর্ণ, স্বতন্ত্র এই মানুষটার জন্যে উপচে ওঠে, তারই জন্যে যে ব্যাকুল হয়েছিলাম ভাই। ভেবেছিলাম তোমার ভেতর এতদিনে তা বুঝি পেলাম, কিন্তু আমার ভাগ্যই মন্দ!

শেষকালের কথাগুলো সিতিকণ্ঠের অশ্রুরুদ্ধ গলা থেকে যেন বেরুতেই চাইল না।

রথীর অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল; তার কোমল মন সিতিকণ্ঠের এ কাতরতা সহ্য করতে পারছিল না, অথচ সিতিকণ্ঠকে সহজভাবে মনের সমস্ত অভিযোগ ধুয়ে মুছে ফেলে পূর্বের আসনে বসানও তার পক্ষে অসম্ভব।

সে মাথা নিচু করে' বললে,—আজ এসব কথা থাক্ সিতি-দা, আমার মন বড্ড বিচলিত।

—না ভাই, এই তো হচ্ছে প্রশস্ত সময় সব কথা বলবার। বাইরের খোলস ফেলে আজ দু'জনে একেবারে অত্যন্ত কাছাকাছি স্বরূপে এসে দাঁড়িয়েছি—বোঝাপড়া করে' নেবার এর চেয়ে সুযোগ আর তো মিলবে না ভাই। আর আমি জানি আজ যদি তোমার ক্ষমা না পাই, তা হ'লে তোমার বন্ধুত্ব চিরদিনের জন্যে আমি হারাব। সে যে আমার পক্ষে কত বড় অভিশাপ তা তোমায় বোঝাতে পারিনে।

রথী এবার যেন একটু সামলে নিয়েছে। সত্যিই অকারণে বোঝাপড়ার দিন পিছিয়ে কোন লাভ তো নেই।

কুণ্ঠিত ভাবে সে বললে,—বন্ধুত্বের জন্যে বিশ্বাসের ভিত যে শক্ত হওয়া দরকার, সিতি-দা!

সিতিকণ্ঠ যেন চম্‌কে উঠল: সে ভিত কি আমাদের মধ্যে আলগা হয়েছে, রথী! তুমি আমায় বিশ্বাস কর না?

রথী চুপ করে' রইল।

সিতিকণ্ঠ ব্যথিত বিস্ময়ের স্বরে আবার বললে,—তা তো জানতাম না রথী, কিন্তু আমি—

না রথীকে আর মূক হ'য়ে থাকলে চলবে না, তাকে বলতেই হ'বে মুখ ফুটে সব কথা। সিতিকণ্ঠের কথার মাঝখানেই সে বললে—আমি সেদিন অনিলা প্রেসে গেছলাম।

নিস্তব্ধ ঘর, দু'টি লোক্ চিত্রার্পিতের মত মাথা নিচু করে' বসে' আছে।

ঘরে স্তব্ধতা প্রথম সিতিকণ্ঠই ভঙ্গ করলে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। তারপর সে উদাস বৈরাগ্যের স্বরে বললে,—ভালোই হ'ল রথী, ভালোই হয়েছে সব। আমার সমস্ত নীচতা এমন ভাবে তোমার কাছেই যে প্রকাশ হ'ল এর ভেতরে বিধাতার কল্যাণ ইঙ্গিত আছে। এই জন্যেই কিন্তু তখন বলেছিলাম রথী, তোমার শ্রদ্ধা আমি চাইনি—চেয়েছি তোমার ভালোবাসা,—যে ভালোবাসা সব অপরাধ ক্ষমা করতে পারে—যে ভালোবাসা নিচে থেকে ওপরে টেনে তুলতে পারে নিঃস্বার্থ ঔদার্যে।

কয়েক সেকেণ্ড থেমে সিতিকণ্ঠ বললে,—তোমার কাছে নিজেকে আমি গোপন করে' রেখেছিলাম, ভেবেছিলাম ছদ্মবেশ আমার টিকবে; আমার সত্য পরিচয়ে পাছে তুমি সরে' যাও ভাই, নিজেকে চেয়েছিলাম ঢেকে রাখতে। কিন্তু বিধাতা যেখানে গভীরতর সম্বন্ধের আয়োজন করে' রেখেছেন, সেখানে এ ঝুটো পালিশ থাকবে কেন! থাকলে আমার শোধন হ'বে কি ক'রে, কেমন করে' হ'বে আমার মুক্তি? একটুখানি জানতেই যখন

পেরেছ, তা হ'লে বলি রথী,—অতল আমার মনের ক্লেদ, কুৎসিত আমার জীবনের ইতিহাস। নিজের অন্তরের দিকে চেয়ে ভয়ে আমি এক-একসময় শিউরে উঠি। কি গ্লানির অন্ধকূপ থেকে আমায় ধীরে-ধীরে উঠে আসতে হয়েছে তা যদি জানতে! জানি না সাহিত্যের প্রতিভার এই মূল্য সবাইকে দিতে হয় কিনা, কিন্তু সত্যি যদি তাই হয়, তা হ'লে প্রার্থনা করি হে ভগবান, জন্মান্তরে এ প্রতিভার অভিশাপ যেন আমায় দিও না, আর আশীর্বাদ করি তোমাদের, প্রতিভা যেন তোমাদের না থাকে! পৃথিবীর সমস্ত ক্লেদ, সমস্ত পঙ্ককুণ্ড পার হ'য়ে এসেছি বলে'ই হয়ত আমার লেখায় মানুষ অবাক হ'য়ে যায় সত্যদৃষ্টি দেখে, হয়ত ভাবী কালে সেই জন্যেই মানুষের মনে আমি বেঁচে থাকব। কিন্তু কি লাভ এ বেঁচে থাকায়! যারা আমার লেখা পড়ে' মুগ্ধ হ'ল, তারা তো জান্‌ল না কি মূল্য আমায় দিতে হয়েছে এর জন্যে!

একটানা দীর্ঘ বক্তৃতায় সিতিকণ্ঠ বুঝি একটু শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছিল। নতুন করে' দম নিয়ে সে আবার বললে,—দোষ কিন্তু আমার সত্যি নয়, রথী। নিজের ভাগ্য আমি তো নিয়ন্ত্রিত করিনি। অমন সঙ্কীর্ণচিত্ত, হৃদয়হীন পাপে কলঙ্কিত পরিবেশে আমার তো জন্ম না হ'লেই পারত। জ্ঞান হ'য়ে চারধারে আমি কি দেখছি জান?—কোন আদর্শের মূল্য নেই, মহত্তর কোন প্রেরণার প্রতি শ্রদ্ধা নেই—এমনি এক জগৎ। সেখানে শুধু নির্লজ্জ লোভ, আর সঙ্কীর্ণতা, আর নিষ্ঠুরতা। আমি দুর্বল মানুষ, কত সংগ্রাম করব বল তো রথী। কতো দিকে ছিন্ন করব এই উত্তরাধিকারের শৃঙ্খল। তবু আমি সারা জীবন যুঝেছি, আজও যুঝছি! অসামান্য শয়তান হ'বার সমস্ত উপকরণ আমি পেয়েছিলাম, পাপের গভীরতম পঙ্কে নেমে যাবার সুযোগ, তার বদলে আমি মানুষের স্তরে এসে উঠতে চেয়েছি। আমার স্খলন পতন কি হ'তে পারে না ভাই? অর্থে আমার অসাধারণ লোভ,

প্রতারণা করবার আমার জন্মগত প্রবৃত্তি, আমি যে সব সময়ে তাদের হার মানাতে পারিনে।

সিতিকণ্ঠের স্বর হতাশ বেদনায় তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠেছে—তার জন্যেই ভালোবাসা খুঁজেছি। বৃথাই খুঁজেছি জীবন ভরে'—যে ভালোবাসার স্পর্শে আমি পবিত্র হব। না পেলাম বন্ধুর কাছে, না পেলাম নারীর ভেতর, স্ত্রীর কাছে থেকেও শুষ্ক কণ্ঠে ফিরলাম; তুমি পারো না রথী তা দিতে? তোমারও এ কঠিন পরীক্ষা—এই পাষণ্ডকে ভালোবাসা। কিন্তু ভালো লোককে সবাই তো ভালোবাসতে পারে, রথী। আমার মত এই ভগ্ন, অধঃপতিত জীবনকে যে ভালোবাসতে পারে, তারই তো দুর্লভ মনুষ্যত্ব।

সিতিকণ্ঠ এবার চুপ করল। রথী এতক্ষণ যেন অভিভূতের মত হ'য়ে ছিল, এবার ধীরে-ধীরে সে একটি হাত সিতিকণ্ঠের দিকে বাড়িয়ে দিলে।

আঠারো

রথীকে বিদায় দিয়ে—বিদায় দিয়ে কেন, একরকম বিতাড়িত করে' দিয়ে মাধুরী খানিক নিশ্চল হ'য়ে রইল দাঁড়িয়ে। নিশ্চলতা তার বাইরের, কিন্তু ভেতরে তখন তার মন ঝড়ের সাগরের মত উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে। দ্রুত নিশ্বাসের সঙ্গে বুক তার দুলছে, অশ্রু এসেছে তার চোখের কূল পর্যন্ত ছাপিয়ে, কণ্ঠ তার রুদ্ধ,—কি একটা কঠিন জিনিস যেন তার কণ্ঠনালী চেপে রয়েছে। রথী আর একটু অপেক্ষা করলে বুঝি তার সামনেই সে চোখের জল রোধ করতে পারত না।

রথীর অপস্রিয়মাণ মূর্তির দিকে চেয়ে নিজের মনোভাবকে ভালো করে' বুঝতেও তখন মাধুরী পারছিল না। এ কি আহত অভিমানের আক্রোশ, না, স্বপ্নভঙ্গের নিরাশ্রয় বেদনা! মাধুরীর মনে সমস্ত অনুভূতি যেন জড়িয়ে গেছে। রথী বাইরে গেটের পাশে অদৃশ্য হ'য়ে যাবার পরও অনেকক্ষণ সে নিঃশব্দে ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর এতক্ষণের নিস্তব্ধতার প্রতিক্রিয়া স্বরূপই যেন তার দেখা গেল অস্থির চাঞ্চল্য। হাতের বইখানাকে সজোরে একটা সোফার ওপর ফেলে অস্বাভাবিক দ্রুত পায়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

দরজার শব্দে চম্‌কে উঠে পাশের ঘর থেকে সুধারানী ডাকলেন —মাধুরী!

কোন জবাব নেই।

—দরজা অমন করে' আছড়ালে কে?

সুধারানী নিজের ঘরে থেকে বেরিয়ে এলেন এবার। মাধুরীর ঘরের দরজা অর্ধেক ভেজানো। ঠেলে ভেতরে ঢুকে সুধারানী

বললেন,—দরজার ধাক্কা খেলি নাকি? এ কি, এর মধ্যে শুলি যে বড়?

মাধুরী যেমন দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়েছিল, তেমনিই রইল। সুধারানী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ভাবে তার কাছে এসে মাধুরীর গায়ে হাত দিয়ে বললেন,—অসুখ করল নাকি? কি হল, মা!

একটি মাত্র মেয়ের সম্বন্ধে সুধারানীর দুশ্চিন্তা একটু অতিরিক্ত। মাধুরীকে সেজন্য মাঝে-মাঝে অত্যন্ত অস্বস্তি ভোগ করতে হয়। এক-এক সময় মার ওপর সে জন্যে সে বুঝি বিরক্তও হ'য়ে ওঠে।

সুধারানী মাধুরীর কপালে হাত রেখে বললেন,—না, গা তো ঠাণ্ডা!

মাধুরী হঠাৎ ফিরে মার দিকে চেয়ে বললে,—আচ্ছা মুশকিল তো বাপু তোমায় নিয়ে! গা গরম আমি তোমাকে বলেছি নাকি?

সুধারানী একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে বললেন,—না, দরজায় ধাক্কা খেলি, তার ওপর অসময়ে শুয়েছিস, তাই ভাবলাম বুঝি অসুখ করেছে।

মাধুরী এখন একটু একলা থাকতে চায়—একেবারে নিঃসঙ্গ না হ'লে সে বুঝি নিজের মনকে শান্ত করতে পারবে না। কিন্তু সুধারানীর ওঠবার নাম নেই। মেয়ের অসুখ সম্বন্ধে কাল্পনিক আশঙ্কায় তাঁর মন উঠেছে উদ্বিগ্ন হ'য়ে—মেয়ের স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত না হ'য়ে তিনি উঠতে পারবেন না কিছুতেই।

মাধুরী তা বুঝলে, বাইরের চেহারা যথাসম্ভব শান্ত সংযত করে' সুধারানীর দিকে চেয়ে সে বললে,—কিছু আমার হয়নি মা, অনেকক্ষণ এক নাগাড়ে একটা বই পড়ে' মাথাটা একটু ঘুরছিল, তাই একটু শুয়েছি। একলা থাকলেই সেরে যাবে'খন। তুমি যাও তো মা!

মার কাছ থেকে নিজেকে গোপন করবার জন্যে এই বুঝি মাধুরীর প্রথম অভিনয় করতে হচ্ছে।

কিন্তু সুধারানী তাতে আশ্বস্ত হ'লেন না। হঠাৎ পড়াশুনা সম্বন্ধে অত্যন্ত বিরূপ হ'য়ে বললেন,—অত পড়াই বা তোর কেন! পই-পই করে' বারণ করলে তো শুন্‌বি না—খালি বই মুখে করে' থাকবি বসে'! কি হ'বে অত পড়ে'। মেয়েছেলের অত বিদ্যের কি দরকার?

শেষ কথাগুলো সুধারানীর অন্তরের—কিন্তু বা'র হ'য়ে এসেছে অতর্কিতে। সুধারানী চোদ্দ বৎসর বয়সে স্বামীর সংসারে এসেছিলেন এক গলা ঘোমটা নিয়ে। বাইরের পালিশ সত্ত্বেও মন তার সেই অবগুণ্ঠনের যুগেই থেকে গেছে। তাঁর চেষ্টা সত্ত্বেও মাঝে-মাঝে সেটা প্রকাশ হ'য়ে পড়ে।

মাধুরী এবার উঠল উষ্ণ হ'য়েঃ বলছি মা, আমি একটু একলা থাকতে চাই; তবু বসে'-বসে' বক্‌-বক্‌ করছ।

সুধারানীকে অগত্যা উঠতেই হ'ল, তবু দরজার কাছ থেকে গজ্‌গজ্‌ করে' তিনি বলে' গেলেন,—মাথা ঘুরছে তো একটু অডিকলোন দিলে হ'ত না—না সকাল-সকাল খেয়েও তো নেওয়া যায়! আর ওসব বই দেব আমি কাল ফেলে।

মার ক্ষুব্ধ গুঞ্জন পাশের ঘরে মিলিয়ে যেতে মাধুরী উঠে দরজাটা ভালো করে' ভেজিয়ে দিলে। এবার সে নিঃসঙ্গ, নিজের আহত মনের মুখোমুখি সে এবার দাঁড়াতে পারে। নিজের অন্তহীন অতল বেদনা এবার সে উপভোগ করতে পারে নিশ্চিন্তে। হ্যাঁ, মাধুরী এখন তাই চায়—নিজেকে নিষ্ঠুর ভাবে পীড়িত দেখতেই যেন তার অর্থহীন এক আনন্দ আছে। রথীর ওপর অভিমানের শোধ সে চায় নিজের ওপর নিতে!

মাধুরী কেমন করে' ভুলবে রথী তাকে অপমান করেছে—রথী তার প্রেমকে করেছে প্রতারণা। সিতিকণ্ঠের ইঙ্গিতকে নিজের কল্পনায় ফাঁপিয়ে সে অদ্ভুত যন্ত্রণাদায়ক সমস্ত চিত্র সৃষ্টি করে মনে-মনে; সে চিত্রের নির্দিষ্ট কোন রূপ নেই বলে'ই অত ভয়ঙ্কর!

রথী যে অপরাধী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ মাধুরীর নেই। রথীর অদ্ভুত আচরণ, তার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, মাধুরীর ভৎর্সনায় তার স্পষ্ট কাতরতা,—এর চেয়ে আর বেশি প্রমাণ কি দরকার। তা ছাড়া রথী প্রতিবাদ কেন করল না,—মাধুরী কি মনে-মনে তাই কামনা করেনি যে রথী উঠবে উত্তপ্ত হ'য়ে, সিতিকণ্ঠের সমস্ত অভিযোগ সে অপ্রমাণ করে' দেবে নিজের দৃপ্ত তেজে? সিতিকণ্ঠের অস্পষ্ট অভিযোগে মাধুরী ব্যথা যেমন পেয়েছে, তেমনি ভেতরে-ভেতরে উঠেছে ক্রুদ্ধ হ'য়ে—সিতিকণ্ঠের সমস্ত কথা খুঁটিয়ে জানবার জন্যে যেমন ছিল তার বেদনাময় কৌতূহল, তেমনি ছিল সঙ্গে-সঙ্গে বিতৃষ্ণা—সিতিকণ্ঠের ওপর, তার সমস্ত কথার ওপর। মাধুরী তো মনে-মনে চেয়েছিল এ সমস্ত অপবাদ রথী তার সদর্প অস্বীকারের দ্বারা খণ্ডন করে' দেবে—সেই তো ছিল তার আশা। রথী একটা কথা প্রতিবাদে বললে তো সে সব ভুলে যেতে পারত, তা হ'লেই সে তো অবিশ্বাস করত সব। কিন্তু রথী তো তা বললে না, রথী তার সামনে অপরাধের সংশয়হীন প্রমাণ দিয়ে একেবারে গেল মুষড়ে। শুধু তাই নয়, রথী চাইল পালাতে। তার দৃষ্টির সম্মুখীন হ'বার সাহস পর্যন্ত রথীর নেই।

কিন্তু এমন করে' যে তার প্রেমের অপমান করেছে, যে অপদার্থ এমন ভাবে করেছে তাকে প্রতারণা, তার জন্যে ঘৃণা ছাড়া আর কিছু তো তার মনে থাকা উচিত নয়! মাধুরী আশ্চর্য হ'য়ে ভাবে, তার অযোগ্য বলে নিজেকে যে প্রমাণ করেছে, তার প্রতি ঘৃণার চেয়ে কেন অহৈতুক বেদনা ছাপিয়ে উঠছে তার মনে! রথীর এ আদর্শচ্যুতিতে কেন তার এ গভীর হতাশা! কেন সে পারছে না যথেষ্ট ভাবে তার প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে তাকে মন থেকে সরিয়ে রাখতে।

না, মাধুরী রথীর কথা আর ভাববে না! তার এ সঙ্কল্পকে ব্যঙ্গ করবার জন্যেই যেন সঙ্গে-সঙ্গে স্মৃতির সুদীর্ঘ মিছিল তার সামনে

দিয়ে পার হয়ে যায়। রথীর সঙ্গে তার পরিচয়ের ছোটখাট ঘটনা, খুঁটিনাটি সব কথা স্ফুলিঙ্গের মত জ্বলে ওঠে তার মনের পটে। কবে তারা গেছল আর্ট-একজিবিশনে। এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে ছবি দেখতে-দেখতে হঠাৎ রথী মৃতুস্বরে বলেছিল,—এত লোক তো দেখতে এসেছে, কিন্তু এর মধ্যে সমঝদার মাত্র দুটি, জানো মাধুরী ?

মাধুরী অবাক হয়ে বলেছিল—তার মানে ?

—তার মানে,—ওই স্থূলকায় ভদ্রলোকটি দেখছ, মুখে রুমাল ঘষতে-ঘষতে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে আমাদের অনুসরণ করে হয়রান হচ্ছেন—উনি আর আমি ছাড়া সবাই এখানে কানা। তারা শুধু ছবি দেখেই গেল। ও ভদ্রলোককে আমার অভিনন্দিত করা উচিত।

মাধুরী প্রথমটা এ কথায় অবাক হয়ে গেলেও খানিক বাদে বুঝতে পেরে লজ্জায় লাল হয়ে বলেছিল,—যাও! তুমি ভারি অভদ্র।

রথী হেসে বলেছিল,—সত্যি এ কথাটা লিখে দিতে পার, মাধুরী। বন্ধু-বান্ধবকে দেখিয়ে আমি জব্দ করে দিই—মেয়েলি ভদ্রতার জন্যে আমার যত বদনাম।

ফিরে আসবার সময় সমস্ত রাস্তা রথী তাকে ঠাট্টা করতে-করতে এসেছিল ঃ তোমায় নিয়ে কোথাও যাওয়া আমার হবে না, মাধুরী! তুমি পাবে নীরব স্তুতি, আর আমি অভিশাপ কুড়িয়ে বেড়াব—এ আর কতদিন সওয়া যায়।

মাধুরী ঠোঁট দুটি ঈষৎ ফুলিয়ে বলেছিল,—যাও, নিজের চেহারা ভালো বলে আর আমায় ঠাট্টা করতে হবে না।

আর সেদিন রথী এসেছিল মুষলধার বৃষ্টির মধ্যে সপসপে হয়ে ভিজে তাদের বাড়িতে। এসেই প্রথম করেছিল তাদের রাস্তাকে শাপান্ত—ইস, ল্যান্সডাউন রোড আবার একটা রাস্তা নাকি! শুধু

ভড়ংটুকুই আছে। এখানে থাকার চেয়ে মফঃস্বলে থাকাও ভালো! এ সদর রাস্তায়ও নয়, আবার দূরত্ব এমন যে ট্যাক্সি করতে মায়া হয়।

সুধারানী হেসে বলেছিলেন—তুমি ছাতি নেবে না, ওয়াটারপ্রুফ আনতে যাবে ভুলে, আর তার জন্যে দোষ হবে আমাদের রাস্তার! বেশ তো বিচার।

রথী এবার রাস্তা ছেড়ে বর্ষাঋতুকে নিয়ে পড়েছিল: কে বুঝবে বলুন আপনাদের এ আকাশের মর্জি! এই একেবারে নীল হ'য়ে আছেন আহ্লাদে, তারপর বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ মুখ ভার করে' নামিয়ে দিলেন পানসে চোখের জল অবিশ্রান্ত।

মাধুরী তখন নিজেই আবার শুকনো কাপড়-জামা এনে রথীর হাতে দিয়ে দাঁড়িয়েছে। সে হেসে বলেছিল,—আমাদের আকাশকে তুমি এবার নোটিশ দাও না উঠে যাবার।

ঝমঝম করে' তখন চারিধারে বৃষ্টি হচ্ছে। তার ভেতর কি মজাই না তাদের হয়েছিল! বাবার জামাটা রথীর গায়ে হ'ল মস্ত বড়, তাই নিয়ে দু'জনের কি হাসি ঠাট্টা।

রথী বললে,—এ জামাটা আমি ফিরিয়ে দিচ্ছিনে। কে জানে হয় তো এই জামার টানেই আমার হাড়ে মাংস গজাতে পারে।

মাধুরী বললে—তার চেয়ে তোমার টানে জামাটারই ছোট হবার সম্ভাবনা বেশি।

কি উচ্ছ্বসিত অহৈতুক হাসি তারপর দু'জনের।

সুধারানী রথীর জন্যে চা করতে রান্নাঘরে বলে' পাঠাচ্ছিলেন। মাধুরী অনুনয় করে' বলেছিল,—না মা, আজ এইখানেই স্টোভ জ্বালিয়ে আমি চা করব।

সুধারানী কি বুঝে বলা যায় না হেসে তাতে সায় দিয়েছিলেন। সে-ঘর আর তারপর তিনি মাড়াননি।

অন্ধকার করে' এসেছে ঘরের ভেতর, ঈষৎ ঠাণ্ডা, বর্ষার সেই মধুর অন্ধকার, ঘনিষ্ঠতাকে যা দেয় প্রশ্রয়। বাইরে বৃষ্টিধারা তাদের চারিধারে রচনা করেছে শব্দের এক অপূর্ব বেষ্টনী। তার ভেতর দু'জনে কাছাকাছি বসে'।

স্টোভের আওয়াজ বাইরের বৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে, মুক্তোর মালার মত শার্সিতে দেখা যাচ্ছে পতনোন্মুখ বারিবিন্দু, স্টোভের নীলাভ আলোর আঁচ এসে লেগেছে মাধুরীর কাপড়ে, রথীর চশমাতে তা চিকচিক করছে—সবসুদ্ধ মিলে হয়েছে অপরূপ এক ছবি।

সে দিন তারা বেশি কিছু কথা বলেনি, স্পর্শ করেনি কেউ কাকে, তবু সান্নিধ্যের অতল শান্ত আনন্দে ছিল দু'জনে মগ্ন হ'য়ে। এই সাধারণ ঘটনাটুকুর ভেতর সেদিন দু'জনেই গোপনে উপভোগ করেছে তাদের ভাবী মিলিত জীবনের স্বাদ। ভবিষ্যতের অপ্রকাশিত একটি আনন্দোজ্জ্বল পাণ্ডুলিপির পাতা তারা যেন চুরি করে পড়বার সুযোগ পেয়েছে।

কখন থেকে মাধুরী ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করেছে তা সে নিজেই জানে না। মাধুরীর মনে হয় এত দুঃখ কোন মেয়ে কোন কালে বুঝি পায়নি, স্বপ্নভঙ্গের এমন নিদারুণ আঘাত। রথী গেল তার জীবন থেকে মুছে—রথী আর আসবে না। আর এলেও তাকে মাধুরী কেমন করে' আবার গ্রহণ করবে। তার ভালোবাসা এত প্রচণ্ড বলে'ই ক্ষমা করা তার পক্ষে যে এত কঠিন।

কান্নার বেগে মাধুরীর সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে।

উনিশ

মাথার চুল যেখানটায় পাতলা হয়ে দিব্যি গোল একটি টাক পড়বার উপক্রম হয়েছে, সযত্নে ব্রাশ দিয়ে পাশের চুল সেখানে সরিয়ে বসাতে-বসাতে সিতিকণ্ঠ বললে,—চল না রথী। এ মিটিং-এ বিস্তর লোক আসবে—মেয়েরাও কেউ কেউ আসবেন শুনছি, কি করবে বাড়িতে বসে' থেকে!

রথী একান্ত ক্লান্ত ভঙ্গিতে ইজিচেয়ারটার ছুই হাতলের উপর ছুই বাহু প্রসারিত করে' শুয়েছিল। আস্তে আস্তে বললে,—না সিতি-দা, আমায় মাপ কর, ভালো লাগছে না।

ব্রাশ চালান শেষ করে' আয়নার সামনে একবার এ-পাশ একবার ও-পাশ ফিরে কেশবিন্যাসের ক্রটি অনুসন্ধান করতে-করতে সিতিকণ্ঠ বললে,—ভালো কি কিছু লাগে রথী, ভালো জোর করে' লাগাতে হয়, ভাগ্য আমাদের আঘাত করে' উপহাস করেছে কিন্তু আমাদের কাতরতা আমরা ভাগ্যকে বুঝতে দেব কেন? তা হ'লেই তো আমাদের সত্যকার পরাজয়।

এ কথায় রথী চুপ করে' রইল।

কপালের তেল শুক্‌নো একটা তোয়ালে দিয়ে সজোরে ঘষতে-ঘষতে সিতিকণ্ঠ আবার বললে,—এমন করে' ভেঙে পড়েই বা লাভ কি? ক'দিন ধরেই তো দেখছি তুমি একেবারে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছ সব দিক থেকে—বাড়ি থেকে বেরোওনা পর্যন্ত। এমনি করেই বরাবর কাটাবে?

সিতিকণ্ঠ সেদিনের পর থেকে আবার বেশ সহজ হ'য়ে উঠেছে, আগের চেয়ে যেন একটু বেশি। তার সে বৌদ্ধ গাম্ভীর্য পর্যন্ত যেন খসে' গেছে অনেকটা। সে আত্মভর্ৎসনার পর তার মন যেন

ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে—কোন গ্লানি আর সেখানে নেই। তার ভাব দেখে মনে হয় প্রায়শ্চিত্ত তার যথেষ্ট হয়ে গেছে বলেই সে বিশ্বাস করে। রথীরও তার মধ্যে যেটুকু অপ্রীতির ছায়া ঘনিয়ে এসেছিল—সেটুকু তার দিক থেকে সিতিকণ্ঠ বেশ সহজে অস্বীকার করে' উড়িয়ে দিতে পেরেছে। তার ব্যবহারে আর কোথাও জড়ত্ব নেই—হয়ত বিশেষ লক্ষ্য করে' দেখলে দেখা যাবে রথীকে আগের চেয়ে আর একটু সমীহ করে' সে চলে, কিন্তু এর বেশি কোন পরিবর্তন তার কোথাও হয়নি। না, অতীতকে অতীত বলে' সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করবার ক্ষমতা সিতিকণ্ঠের আছে।

কিন্তু রথী তা পারল কই? সিতিকণ্ঠের পূর্বের কথা ভুলে সে তার সঙ্গে সহজ হবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু নিজের মনকে অন্য কোনদিকে আর সুস্থ করতে পারেনি। মনের হতাশার ছায়া তার মুখেও পড়েছে—সে-মুখ ক্লান্ত, নিরুৎসাহ, উদাসীন।

রথী এ কয়দিন বাড়ি থেকে তো মোটে বা'রই হয়নি। সারাদিন নিস্তব্ধ হ'য়ে ঘরের ভেতর বসে থেকে সে কি করে কাটায় কে জানে? না পড়ে সে বই, না লেখে কিছু! মাধুরীকে সেই প্রথম চিঠি সে অবশ্য পাঠিয়েছিল, তার উত্তর আজও আসেনি, রথীর বিশ্বাস আর আসবে না। আর সত্যি উত্তরের প্রত্যাশা করে তো সে চিঠি দেয়নি। সে চিঠির পর আর কিছু সে লেখেনি। লিখতে তার উৎসাহই হয়নি।

সিতিকণ্ঠ এইবার আঙুল ডুবিয়ে রথীর কৌটো থেকে স্নো বার করে ফোঁটা-ফোঁটা করে মুখের চারদিকে লাগিয়ে নিজের কথার অনুবৃত্তি করে বললে,—না, রথী তোমার এ মনোভাবের প্রশংসা করতে পারলাম না। নিজের যৌবনকে তুমি অপমান করেছ, অপমান করেছ তোমার মনুষ্যত্বকে।

স্নো-চর্চিত মুখটা রথীর দিকে ফিরিয়ে সিতিকণ্ঠ একটু মৃদু হেসে গভীর স্বরে আবৃত্তি করলে :

তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক তীরে—
তাকাস্‌নে ফিরে।
সম্মুখের বাণী
নিক তোরে টানি
অতল আঁধারে অকূল আলোতে।

বললে,—আমাদের হল সম্মুখের বাণীর টান রথী, ফিরে তাকানো আমাদের নিষেধ, ঘা খেয়ে-খেয়েও আমাদের এগিয়ে চলতে হ'বে, মাথা রাখতে হবে সোজা করে। তোমার এ অবসাদ দূর কর রথী। এত সহজে ভেঙে পড়া তোমার সাজে না।

—আমি একটা জিনিস ঠিক করে ফেলেছি, সিতি-দা। রথী ইজিচেয়ারে হেলান দিয়েই বললে।

সিতিকণ্ঠ আয়নার দিকে চেয়ে মুখে স্নো এবার ভাল করে ঘষতে-ঘষতে জিগ্‌গেস করলে,—কি ?

—এখানে আর আমি থাকতে পারছি না, আমি বাইরে কোথাও চলে যাব।

—বেশ, বেশ তো। নাকের দু'পাশে যেখানে চামড়ায় বয়সের ভাঁজ দেখা দিয়েছে সেখানটা স্নো ঘষে' মসৃণ করবার চেষ্টা করতে-করতে সিতিকণ্ঠ বললে,—সে তো ভাল কথা, দিন কতক বাইরে ঘুরে এলে মনটা ভালো হ'য়ে যবে, আবার স্ফূর্তি পাবে। এ তো খুব ভালো মতলব।

—আমি কিছু বেশি দিন থাকব ভাবছি।

—বেশ কথা, তাই থাকবে। যতদিন তোমার ভাল লাগে—হঠাৎ সিতিকণ্ঠের স্নো ঘষা গেল থেমে, কি একটা কথা মনে পড়ায় চম্‌কে উঠে উদ্বিগ্ন মুখে সে রথীর দিকে ফিরে বললে,—কিন্তু তোমার এ বাসা ?

—না, সিতি-দা, এ বাসা তুলে দিয়েই চলে যাব। কবে ফিরি না-ফিরি, এ বাসা রেখে মিছিমিছি ভাড়া গুনে লাভ কি!

সিতিকণ্ঠের স্নো-মাখা হাত এল মুখ থেকে নেমে। হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে সে বললে,—হুঁ।

রথী সত্যকার কুণ্ঠার সঙ্গে বললে,—তোমাকে ক'দিনের জন্য টানাহেঁচড়া করে' বাড়ি বদল করিয়ে কষ্ট দিলুম—মাপ কোরো, সিতি-দা। অনেক দুঃখে এ কাজ করছি।

সিতিকণ্ঠ গভীর চিন্তাকুল স্বরে বললে,—আমার কষ্টের কথা তো আমি ভাবছি না রথী, আমি এতদিন পোড়ো বাড়ির মেসে ভাঙা তক্তপোশে কাটিয়েছি। আবার না হয় তাই কাটাব। মাঝের দিন ক'টাই আমার লাভ। কিন্তু তোমার পড়াশুনোর এ-ভাবে ক্ষতি করা উচিত হচ্ছে?

—পড়াশুনো আর আমার হবে না, সিতি-দা। আর আমার উৎসাহ নেই।

—ওরকম মনে হয় রথী, সাময়িক অবসাদ আসে। মনে হয় রাত বুঝি ফুরোবে না। কিন্তু রাত তো অনন্ত নয় রথী—সকাল শেষ পর্যন্ত হয়। পড়াশুনো খেয়ালবশে ছেড়ো না ভাই, অন্তত, তোমার দিদিমার কথাটা একবার ভেবো। তিনি তোমার পাস করার আশাতেই তো আছেন।

রথী ক্লান্তভাবে বললে,—আমায় আর বোঝাবার চেষ্টা করো না সিতি-দা, আমি চার দিন এই নিয়েই নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করেছি। আমার সঙ্কল্প স্থির।

সিতিকণ্ঠর প্রসাধনে আর তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। মুখটা রুমাল দিয়ে মুছে ফেলে সে বললে,—তা'হলে ভাই আমি আর কিছু বলতে চাই না। তুমি যাতে খুসি হও, যাতে তোমার শান্তি হয়, তাতে বাধা কি আমি দিতে পারি? কিন্তু আজই যেন যেতে চেও না ভাই, আমায় আবার একটা

মেস-টেস যোগাড় করে' তো নিতে হবে—পুরানো মেসে সিট কি আর পাব ?

রথী আর একবার সঙ্কুচিত হয়ে বললে,—তোমাকেই বড় কষ্ট দেওয়া হ'ল সিতি-দা, দোহাই তোমার, তোমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে চলে' যেতে চাইছি যদি মনে কর তা হ'লে সব চেয়ে দুঃখ পাব। সত্যি সিতি-দা, আমার মনে আর এতটুকু খোঁচ নেই—তোমার সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে পারলে আমি সুখীই হতাম—কিন্তু কিছুতেই এখানে টিকতে পারছি না সিতি-দা!

সিতিকণ্ঠ আলনা থেকে চাদরটা নিয়ে গায়ে জড়িয়ে রথীর মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে বললে,—পাগল! তোমার অত করে' বোঝাতে হবে কেন ভাই, তোমার সব আমি জানি না ? আমি তোমার পড়াশুনোর কথা ভেবে আপত্তি করেছিলাম। এখন ভুল বুঝেছি—সত্যি পড়াশুনোই তো জীবনের সব নয়।

সিতিকণ্ঠের প্রতি কৃতজ্ঞতায় রথীর মন ভরে' গেল। সে বললে,—আমি এখনো দিন সাতেক আছি সিতি-দা, এর মধ্যে তোমার মেস আমি নিজে খুঁজে দেব।

প্রশান্ত একটু স্নেহের হাসি হেসে সিতিকণ্ঠ সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল।

জিনিস-পত্র সমস্ত গোছানো। বাড়ি ভাড়া চুকিয়ে বাড়িওয়ালাকে উঠে যাওয়ার নোটিশ দেওয়া হয়েছে, অর্জুনকে দেওয়া হয়েছে মাইনে আর আশ্বাস। সিতিকণ্ঠের মেসও খুঁজে পাওয়া গেছে। রথীর চলে' যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ, তবুও রথীর যাওয়া হ'ল না।

তার অপেক্ষায় সাতদিন পূর্ণ হবার আগেই হঠাৎ দেশ থেকে দিদিমার এক পত্র এসে হাজির। সে-পত্র পড়ে' রথী গুম হয়ে রইল বসে'—তার সমস্ত সঙ্কল্প একটি চিঠির আঘাতে গেছে ভেস্তে।

দিদিমার কাছ থেকে তার টাকা আসে, কুশল-সংবাদ জানবার জন্যে চিঠিও আসে নিয়মিত, কিন্তু এরকম পত্র এই প্রথম।

সিতিকণ্ঠ কাছেই কোথায় বা'র হয়েছিল ; সিঁড়িতে মান্দ্রাজি চটিটা সোৎসাহে ফট্ ফট্ করতে করতে নিচে থেকেই উৎসাহিত কণ্ঠে—শুনেছ রথী, বলে' সে উঠে এল।

সিতিকণ্ঠ প্রথম ক'দিন এ বাড়ি ছেড়ে যাবার কথায় যেমন একটু গম্ভীর হয়ে গেছল, তারপর থেকেই তাকে অতিমাত্রায় প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। মনে হয় এ বাসা উঠিয়ে দেওয়ায় তারই যেন উৎসাহ অত্যন্ত বেশি!

যখন-তখন সে বলেছে,—একসঙ্গে থাকাটাই সব নয় রথী, প্রাণের যোগটাই আসল। তোমার সঙ্গে আমার সেইটি হবার দরকার ছিল—তা হয়েও গেছে। হাজার মাইল দূর থাকলেও এখন আমাদের মধ্যে ব্যবধান থাকবে না। যেখানেই থাক চিঠি দেবে তো রথী!

রথী মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছে।

—আর দেখ রথী, আমার কষ্ট হবে বলে' তুমি সঙ্কুচিত হয়ো না। কষ্ট আমার হবে না। জলে ছেড়ে দিলে মাছের কি কষ্ট হয়! আমার আগেকার আবেষ্টনই হচ্ছে আমার নিজস্ব জল—যেখান থেকেই আমি আহরণ করেছি আমার সমস্ত অভিজ্ঞতা, আমার লেখার খোরাক, বেশিদিন এ আরামে বাস করলে হয় তো আমার লেখার পুঁজিই যেত ফুরিয়ে।

রথীকে আরো আশ্বস্ত করে' সিতিকণ্ঠ বলেছে,—সত্যি কথা বলতে কি রথী, আমার আবার সেই পূর্বের জগতে ফিরে যেতে আনন্দই হচ্ছে। দূরে সরে' এসে যেন আমার টান বেড়েছে। সেই ভাঙা তক্তপোশের ওপর বালিশ বুকে নিয়ে উপুড় হয়ে লেখা, লিখতে লিখতে পাশের সীটের অর্থহীন প্রশ্নের জবাব দেওয়া, কানের পাশে পলিটিকস নিয়ে তুমুল ঝগড়া কখন থামবে সেই

আশায় কলম উঠিয়ে বসে' থাকা—এ সবেরও যেন একটা আকর্ষণ আছে।

রথী অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়ে' বলেছে হয় তো—আবার তোমার লেখার ক্ষতি হবে। এই সব উপদ্রব থেকেই তোমায় বাঁচাতে চেয়েছিলাম।

—না, না, তুমি লজ্জিত হয়োনা, তুমি তো ভাই যথেষ্ট করেছ। তার জন্যই আমি কৃতজ্ঞ। ইচ্ছে করে' তো আর তুমি যাচ্ছ না। তোমার যাওয়া যে প্রয়োজন। নিজের প্রতিও তোমার একটা কর্তব্য আছে। কি বলে, সব ধর্মের বড় হ'ল আত্মরক্ষা। তুমি ভেবোনা, রথী।

আজ ঘরের ভেতর ঢুকে উৎসাহভরে সিতিকণ্ঠ বললে,—জান রথী, ভারি একটা মজার খবর আছে।

রথীর প্রশ্নের অপেক্ষা না করে'ই সিতিকণ্ঠ আবার বললে,—জানি, তুমি যেখানে হাত দিয়েছ সেখানে ভালো না হয়ে যায় না। মেসের সেই তেতলার ঘরটা আজ শুনলাম পাওয়া যাবে। সে ভদ্রলোক হঠাৎ আজকেই নাকি সকালে পেয়েছেন বদলি হবার চিঠি, ঘর তাঁকে ছাড়তে হবে। একেই বলে কপাল ভাই—একেবারে সিঙ্গল সিটেড্ রুম, চারিদিক খোলা। একেবারে শহরের শিখরে ব'সে রাজ্যের গল্প ফাঁদা যাবে!

রথীর মুখের ও টেবিলের লেখা চিঠির ওপর একবার দৃষ্টি দ্রুত বুলিয়ে নিয়েও সিতিকণ্ঠ বোধ হয় কিছু বুঝতে পারল না। অন্তত দেখা গেল তারপরও উৎসাহভরে সে বলে' চলেছে,—তারপর তোমার আর দেরি কিসের! বিছানা বাঁধলেই তো হয়! আমিও তল্পিতল্পা গুটোবার ব্যবস্থা করি।

—আমার যাওয়া হবে না সিতি-দা! রথী উদাস ভাবে বললে।

—হবে না? সিতিকণ্ঠ একেবারে আকাশ থেকে পড়ল।

যাওয়া হবে না কি হে! তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে! সব আয়োজন করে' এখন বলছ যাওয়া হবে না। না, না, ওসব ছেলেমানুষী চলবে না। তুমি ওঠ, আমি সব ব্যবস্থা করছি।

উত্তরে রথী টেবিলের খোলা চিঠিটা সিতিকণ্ঠের দিকে এগিয়ে দিলে। কিছুই যেন বুঝতে না পেরে সেটা হাতে নিয়ে সিতিকণ্ঠ বললে,—চিঠিতে আবার কি হলো! পড়ব?

—পড়!

সিতিকণ্ঠ তার আগেই পড়া অবশ্য আরম্ভ করেছে, চিঠিটা রথীর দিদিমা লিখেছেন সত্যই একটু অদ্ভুত ভাবে। ভৎর্সনা ও কাতরতার সে এক অপূর্ব সংমিশ্রণ! দিদিমা লিখেছেন: তুমি আর ছেলেমানুষ নও, বড় হয়েছ। নিজের ভাল-মন্দ, তোমার বংশের সম্মান-অসম্মান এখন তোমার নিজের বোঝবার কথা। তোমার মাথার ওপর বলতে গেলে কেউ নেই। আমি মূর্খ মেয়েমানুষ, তোমায় কিছু শিক্ষা দিতে যাওয়া আমার শোভা পায় না। আমি কিছু বলতেও চাই না। কিন্তু তোমার সম্বন্ধে আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে। পড়াশুনার জন্য তুমি বিদেশে আছ। স্ত্রীলোক হয়ে এখানকার সমস্ত বিষয়-কর্মের তদারক করা অত্যন্ত কষ্টকর হ'লেও শুধু তোমার ভালোর কথা ভেবেই আমি সব সহ্য করছি। কিন্তু ক্রমশই এ ভার আমার দুর্বহ হয়ে উঠছে। শোকে-তাপে আমি দগ্ধ; ধর্ম-কর্মের বদলে কতকাল এ ভূতের বোঝা আর আমি বয়ে বেড়াব! পড়াশুনায় যদি তোমার ইচ্ছে না থাকে, তা হ'লে তুমি দেশে ফিরে এসে এ সমস্ত ভার নাও। বিদেশে উচ্ছৃঙ্খল ভাবে স্বেচ্ছাচারিতা করবার জন্যে তাঁরা বিষয় রেখে যান নি। তোমার পড়াশুনা সম্বন্ধে আমার অনেক আশা ছিল। তুমি দু'বার পাস করতে পারোনি বলেও আমি দুঃখিত হইনি। তুমি চেষ্টার ত্রুটি করছ না জেনে আমি খুসি ছিলাম। সেই আশাতেই আমি সমস্ত এখানকার কষ্ট সহ্য করছি। কিন্তু

আমার ভাগ্য মন্দ ; এবার আমার মনে গভীর সংশয় জেগেছে। তুমি টাকা চেয়ে পাঠিয়েছ। এখন আমি টাকা পাঠালাম না। সরকার-মশাই হপ্তা দু' একের ভেতর কলকাতা যাবেন, তোমার সমস্ত প্রয়োজন বুঝে তিনিই তোমায় টাকা দিয়ে আসবেন। আর কি লিখব, এই বৃদ্ধবয়সে আমায় আর আঘাত তুমি দিও না, এই আমার অনুরোধ।

আদ্যোপান্ত চিঠিটা পড়ে' মুখখানাকে গম্ভীর ও করুণ করে সিতিকণ্ঠ রথীর মত চুপ করে' খানিক বসে' রইল। তারপর হঠাৎ যেন উৎসাহিত হয়ে বললে,—আরে এতে তুমি এত ভাবছ কেন? মেয়েমানুষ অমন অস্থির হয়, অবুঝের মত হাঁস-ফাঁস করে! তারপর দুটো কথাতেই ঠাণ্ডা! তুমি এখন চলে' তো যাও, তারপর মিষ্টি করে' একটা চিঠি লিখলেই হবে।

কথাগুলো বলে' সিতিকণ্ঠ আড়চোখে একবার রথীর মুখের দিকে চাইলে।

রথী হতাশ ভাবে বললে,—না সিতি-দা, তুমি আমার দিদিমাকে জান না। তিনি অত্যন্ত তেজী, অত্যন্ত কঠিন। ভালবাসতেও যেমন জানেন, দরকার হ'লে তেমনি শক্ত হ'তেও পারেন। ক্রটি-বিচ্যুতি তিনি ক্ষমা করেন না। তা ছাড়া তাঁর মনে আমি আঘাত দিতে পারব না।

—তাই তো। এ তো ভারি মুশকিলই দেখছি। এরকম অশান্ত মন নিয়ে এখানে ছট্‌ফট্‌ করলেও তো তোমার পড়াশুনা হবে না!

—কি করব বল? থাকতেই হবে।

—কিন্তু দিদিমা হঠাৎ এরকম চিঠি লিখলেনই বা কেন? সিতিকণ্ঠ বিস্মিত ভাবে বললে,—আমি ঠিক বলছি রথী, তোমার নামে কেউ তাঁকে ভয়ঙ্কর ভাবে লাগিয়েছে। হঠাৎ এ সন্দেহ তাঁর হবে কেন নইলে?

রথী চুপ করে' ছিল। সিতিকণ্ঠ আবার বললে,—তোমার সেরকম কোন জানা লোক শত্রু আছে নাকি ?

রথী মাথা নেড়ে বললে,—জানি না তো। আমাদের দেশের একটি ছেলে আমার সঙ্গে কলেজে পড়ে। কিন্তু সে তো সে-রকম নয়। তা ছাড়া কিই বা সে লিখতে পারে!

—পারে, পারে, রথী তুমি জান না! মানুষের নীচতার রথী অন্ত নেই। জীবনকে এখনো তো তুমি ভালো করে' চিনলে না ভাই! তুমি বাড়ি থেকে প্রচুর টাকা পাচ্ছ, সুখে-স্বচ্ছন্দে কলকাতায় ফ্ল্যাট নিয়ে আছ, ভালো জামাকাপড় পর, ভালো ভালো সিগ্রেট খাও, এতে মানুষের চোখ টাটাবে না! তা হ'লে আর মানুষ কিসের!

সিতিকণ্ঠ তিক্ত একটু হাসি হেসে আবার বললে,—বুঝেছি আমি রথী, তোমার কোন বন্ধুই এ কাজ করেছেন।

রথী হাঁ না কিছুই না বলে' ক্লান্ত ভাবে বসে' রইল। সিতিকণ্ঠ খানিক নীরবে থেকে বললে,—তা হ'লে এখন বাসা তোলা আর হ'ল না রথী!

—না।

—তবে একটা কথা বলি শোন রথী। তোমায় এমন করে' আধমরা হয়ে পড়ে থাকতে আর আমি দেব না। তোমার এ ভাব দেখলে আমার কি হয় তা যদি জানতে! এই ক'দিনে তোমার চেহারা কি হয়ে গেছে বল দেখি। আয়নায় মুখখানা একবার দেখেছ ? এরকম করে' থাকা চলবে না। তোমায় আমি জোর করে' তাজা করে' তুলব।

—কিন্তু কি করব সিতি-দা।

—কি করবে! আমার সঙ্গে এক্ষুনি তুমি বেরুবে! নাও, তৈরি হয়ে নাও। এইখানে বন্ধ করে' রেখে নিজেকে কি মারবে মনে করেছ ?

—কিন্তু কোথায় যাব, সিতি-দা? বায়স্কোপ থিয়েটার মিটিং আমার ভালো লাগে না, হাঁফিয়ে উঠি।

—বায়স্কোপ থিয়েটারে যাচ্ছি না হে, যাচ্ছি না! তোমার মনের অন্ধকার কেটে যাবে এমন জায়গায়ই তোমায় নিয়ে যাব। এখন তুমি সুবোধ বালকের মত আমায় অনুসরণ কর দেখি! সেই যে কি বলে—open your mouth and shut your eyes—একেবারে ঠিক তাই!

রথী তবু বিমনা হয়ে ছিল বসে', তার কাঁধ ধরে' ঝাঁকুনি দিয়ে সিতিকণ্ঠ বললে,—নাও, ওঠ শিগ্‌গির! আজ থেকে আমিই তোমার ভার নিলাম জেনে রাখ। তোমায় দু'দিনে তাজা না করে' তুলতে পারি তো কি বলেছি!

রথীর ইচ্ছাশক্তি যেন আর নেই। সিতিকণ্ঠের কথায় প্রতিবাদ সে করতেই পারল না, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে উঠতে হ'ল। আলনা থেকে শুধু একটা চাদর নিয়েই সে বুঝি তার বেশ সাঙ্গ করছিল। সিতিকণ্ঠ বললে,—উঁহু, ও হবে না রথী। যেন অশৌচ হয়েছে এমন ভাবে বেরুন তোমার চলবে না। পাঞ্জাবিটা বদলে সিল্কেরটা পর। স্নো পাউডার হেয়ার ক্রীমগুলোকেও তবজ্ঞা কোরো না—আর ও চাদর চলবে না!

রথী একটু অবাক হ'লেও সেই আদেশই পালন করতে উদ্যোগী হ'ল। না হয়ে তার উপায় নেই।

রথীর পরিত্যক্ত চেয়ারটায় বসে' পড়ে' তার প্রসাধনের তদারক করতে-করতে সিতিকণ্ঠ বললে,—এতদিন আমি চুপ করে ছিলাম রথী, ভেবেছিলাম তুমি নিজেই নিজেকে সামলাতে পারবে, কিন্তু আমায় যখন এখানে থাকতেই হ'ল, তখন আর আমি হাত গুটিয়ে থাকতে পারব না। এত সামান্য আঘাতে তুমি ভয় কর রথী, এত কোমল তোমার প্রকৃতি—এ নিয়ে তুমি তো সংসারে টিকতে পারবে না। জীবনে তোমার অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, গভীর

বিস্তৃত অভিজ্ঞতা, মনের কাঠাম তা না হ'লে তোমার শক্ত হবে না তো। ধরো নারী! নারীর কি-ই বা তুমি জান, কি বা জানবার সুযোগ পেয়েছ! নারী-মনের বিচিত্র রহস্য জানবার জন্যেও যে সাধনা করতে হয়, দুঃখের সাধনা, এমন কি কাপালিকের মত ঘৃণ্য সাধনা।

রথী এ-সব কথা অবশ্য মন দিয়ে শুনছিল না। শোনবার মত তার মনের অবস্থা নয়। যন্ত্রচালিতের মত সে সিতিকণ্ঠের আদেশ পালন করে'ই চলেছে।

সিতিকণ্ঠ নিজের মনেই বলে' চললো ঃ অনেক দেখেছি, অনেক ঘা খেয়েছি রথী! মানবচরিত্রের ভয়ঙ্কর রহস্য জানবার জন্যে না করেছি এমন কাজ নেই—তাই না আজ মন শিলার মত কঠিন—কোন আঘাতে দাগ পড়ে না। তোমাকেও আমি তাই করে' তুলব—চোখ তোমার খুলে যাবে, ফাঁকি তুমি আর কোথাও পড়বে না। এই যে ঠিক হয়েছে! দেখ দিকি কেমন দেখাচ্ছে এখন! নাও, চল। দাঁড়াও, দাঁড়াও, ব্যাগটা যে ফেলেই যাচ্ছ। আচ্ছা ভুলো মন তোমার যা হোক।

রথী ব্যাগটা পকেটে তুলে নিলে।

রাস্তায় বেরিয়ে রথী জিজ্ঞাসু ভাবে সিতিকণ্ঠের দিকে চাইতেই সে বললে,—বলেছি তো, open your mouth and shut your eyes—এখন একটা ট্যাক্সি ডাকা যাক।

—ট্যাক্সি! ট্যাক্সি কি হবে?

—হ'বে হে হ'বে! সবুর কর না। এতদিন আমার এক মূর্তিই দেখে এসেছ, এবার দেখবে অন্য মূর্তি!

রথী আর কোন কথা বলল না। নিজেকে সে হতাশ ভাবে ছেড়ে দিয়েছে সিতিকণ্ঠের হাতে। শহরের ওপর ধূমায়িত সন্ধ্যা এসেছে নেমে। পথের বাতিগুলি জ্বলে' উঠেছে কিন্তু বিলীয়মান দিনের আলোর উপস্থিতিতে এখনও উজ্জ্বলতা পায়নি।

সিতিকণ্ঠ একটা ট্যাক্সিকে ডেকে থামালে। রথীকে একরকম জোর করে' তার ভেতর ঠেলে তুলে দিয়ে নিজে তার পাশে এসে বসে' পড়ে' বললে—চালাও সিধা।

তারপর রথীর দিকে ফিরে বললে,—বড্ড আগে বেরিয়ে পড়া হয়েছে। ট্যাক্সি করে' খানিকটা ঘুরে নেওয়া যাক আগে!—স্ট্র্যাণ্ড-এই যাওয়া যাক, কি বল!

রথীর কিছুতেই অসম্মতি নেই। ড্রাইভারকে নতুন করে' আদেশ দিয়ে সিতিকণ্ঠ রথীর দিকে ফিরে আবার বললে,—কি হে, একটু হাস! মুখটা একটু প্রসন্ন হোক। কেন, ভালো লাগছে না এই গতি, নেশা লাগছে না মনে? আমার তো লাগে ভাই। জীবনে বুঝলাম শুধু এই গতি, এই প্রচণ্ড বেগের নেশা! আর কিছু নেই। সব ভুয়ো, সব ফাঁকি! শুধু চলার নেশায় বুঁদ হয়ে থাক, নতুন থেকে নতুনতর থ্রিলের ভেতর চলা।

ট্যাক্সির ঝাঁকুনিতে কেঁপে-কেঁপেও সিতিকণ্ঠর স্বর চাকার ঘর্ঘর ছাপিয়ে উঠতে লাগল: রোমাঞ্চের পর রোমাঞ্চ—উল্কার মত ছুটে চলার রোমাঞ্চ!

> শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও,
> উদ্দাম উধাও ;
> ফিরে নাহি চাও,
> যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।
> কুড়ায়ে লও না কিছু কর না সঞ্চয়,
> নাই শোক, নাই তব ভয়,
> পথের আনন্দ বেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়!

—রবীন্দ্রনাথ বুঝেছেন জান রথী, ঋষির দৃষ্টি নিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছেন সত্য।

রথী ম্লান একটু হাসবার চেষ্টা করলে। কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের ভিড় ছাড়িয়ে সেণ্ট্রাল য্যাভেনিউ দিয়ে তাদের মোটর সবেগে

ছুটে চলেছে। আলোকিত নগরের যেন উৎসব-সাজ। পাশে সিতিকণ্ঠ উৎসাহভরে বকে' চলেছে, তবু যেন তার সে উত্তেজনা রথীর ভেতর সংক্রামিত হ'তে চায় না।

সিতিকণ্ঠও তা বোধহয় বুঝতে পারছিল। উচ্ছ্বাস থামিয়ে সে রথীর গায়ে আস্তে হাত রেখে বললে,—আমার জন্যেও একটু উৎসাহ আন রথী! জীবন বড় একঘেয়ে, স্তিমিত দিনগুলো বিস্বাদ—তার ভেতর একদিন আমিই ধরো নিজেকে ভুলতে চাই, ভুলতে চাই জীবনের ব্যর্থতা। আমার খাতিরেই না হয় তুমি একটু ভান কর। তুমি অমন করে' বসে' থাকলে আমিও যে মুষড়ে পড়ি।

রথী লজ্জিত হয়ে সোজা হয়ে উঠে বসল। বললে,—আমি তো আপত্তি কিছুতেই করছি না সিতি-দা।

—শুধু আপত্তি না করলে চলবে না, উৎসাহ কই?

রথী হেসে বললে,—আচ্ছা, এই উৎসাহও এনেছি।

—বহুৎ আচ্ছা। বলে' সিতিকণ্ঠ তার পিঠ চাপড়ে দিলে।

স্ট্র্যাণ্ড রোড চক্কর দিয়ে ট্যাক্সি যখন আবার চৌরঙ্গিতে ফিরল তখন সন্ধ্যা বেশ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সিতিকণ্ঠ ড্রাইভারের কানের কাছে এগিয়ে গিয়ে কি একটা রাস্তার নাম বললে—রথী তা শুনতে পেল না।

জনতাবহুল রাস্তার ভেতর দিয়ে থামতে-থামতে এ-পথ ও-পথ ঘুরে ট্যাক্সি এসে থামল একটা রাস্তার ধারে। রথী অন্যমনস্কের মত গাড়ি থেকে সিতিকণ্ঠের ডাকে নেমে পড়েছিল। ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে চারিদিকে চেয়ে সে হঠাৎ কম্পিত কণ্ঠে বললে,—এখানে—এখানে কেন সিতি-দা?

সিতিকণ্ঠ গম্ভীর, শুধু তার চোখের কোণে দুষ্টামির একটু হাসি, বললে, shut your eyes! মনে নেই?

—কিন্তু—

—কোন কিন্তু নেই! সিতিকণ্ঠ যেন ধমক দিয়ে বললে—বড়ই হয়েছ, মানুষ হওনি। মেরুদণ্ড তোমার ননীতে তৈরি! এই সামান্যতে তোমার ভয়—তুমি তো কুলবধূ নও!

রথীর আড়ষ্ট হাত ধরে' টানতে-টানতে পাশের একটা বাড়ির ভেতর সিতিকণ্ঠ ঢুকে পড়ল। রথী প্রথম ভাগের সুশীল সুবোধ বালক নয়, নীতি দুর্নীতির আদর্শ সম্বন্ধে নিজেকে সে আধুনিক মনে করে'ই গর্ব করে—কিন্তু তবু তার পা দু'টো অকারণে তখন কাঁপছে! বই পড়ে' বোহিমিয়ান হওয়ার সঙ্গে সত্যকার জীবনের কত তফাত, আজ যেন রথী প্রথম বুঝতে পারল। এ বাড়ির হাওয়াতে পর্যন্ত কি আছে কে জানে? একটা অস্বস্তিকর অস্পষ্ট অস্বাভাবিক গন্ধ, একটা গা-ছম-ছম-করা ছায়ার অনুভূতি তাকে আড়ষ্ট করে' তুলল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে সে যেন হাঁপিয়ে ওঠে, চোখের দৃষ্টি কেমন যেন ঝাপসা, সবই সে দেখছে অথচ কিছুই সে দেখতে পাচ্ছে না। এমনি ভাব। তার কানের ডগা পর্যন্ত অকারণে নববধূর মত লাল হয়ে গেছে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে লম্বা বারান্দা পার হয়ে একটা ঘরের দরজায় গিয়ে সিতিকণ্ঠ ধাক্কা দিলে। দরজা খোলার সঙ্গে ঘরের প্রখর বৈদ্যুতিক আলো দিলে রথীর চোখ ধাঁধিয়ে। সিতিকণ্ঠের মুঠির ভেতর তার হাত তখন ঘেমে উঠেছে।

সিতিকণ্ঠ ঘরের ভেতর একবার উঁকি মেরে বললে,—যাক বাঁচা গেল, দরজা বন্ধ দেখে আমার বুকটা তো দশহাত দমে' গেছল। এতদূর এসে বুঝি হতাশ হয়ে ফিরতে হয়! আমাদের ভাগ্য ভালো!

যে মেয়েটি দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিল মৃদু হেসে অভ্যর্থনা করে' সে বল্‌লে,—ভাগ্য আমার। আসুন!

সোফা, চেয়ার, শোকেশ, ড্রেসিং টেবল, আয়নায় ঘর পরিপাটি করে' সাজানো। মেঝেয় দুধের মত সাদা, বুঝি পালকের মত

নরম লম্বা ঢালা বিছানা পাতা, সিতিকণ্ঠ রথীকে নিয়ে একটা সোফায় গিয়ে বসে বললে,—তারপর বীণা, মেজাজ সরিফ ?

বীণা তখন তাদের সামনে বিছানায় পা দুটি পিছনে গুটিয়ে লীলায়িত ভঙ্গিতে বসেছে। হেসে বললে,—এই যেমন দেখছেন!

দেখতে আর পাচ্ছি কই, চোখ যে ঝলসে যাচ্ছে! বিদ্যুৎ তোমার বাতিতে, বিদ্যুৎ তোমার কটাক্ষে। পোড়া দু' চোখ কত সয়!

—আপনার চিরকালই ঠাট্টা!

—তা কি করব বল!—গভীর সুরে গভীর কথা।

শুনিয়ে দিতে তোরে,
সাহস নাহি পাই!
ঠাট্টা করে' ওড়াই সখি
নিজের কথাটাই!

ওই যাঃ, ক্ষণিকার বুঝি দফারফা করলাম।

বীণা গ্রীবা বাঁকিয়ে মুখখানির অপরূপ ভঙ্গি করে' বললে,—আপনি এতও জানেন!

—কিছুই জানিনা বীণা, একেবারে শিশুই আছি এখনো। কিন্তু সেকথা যাক্। আজ তোমার কাছে সত্যিকারের একটি শিশু নিয়ে এসেছি, একেবারে অফোটা কুঁড়ি, পাপড়ি-টাপড়ি কুঁকড়ে কেমন আড়ষ্ট হয়ে আছে দেখতে পাচ্ছ না ?

রথী একটু হেসে মেয়েটির দিকে চেয়ে বললে—অনেকক্ষণ আগেই পেয়েছি!

রথীর মাথা আরো নেমে এলো বুকের কাছে। কিন্তু কেন, কেন ? এবার তার লজ্জা হচ্ছিল অন্য কারণে। সত্যি নীতিবাগীশ গ্রন্থকারের বই-এর দুগ্ধপোষ্য নায়কের মত কি সে ব্যবহার করছে! এই জিনিসটিকেই সে তো মনে মনে বরাবর ঘৃণা করেছে—এই

prudery! আসতে যখন বাধ্যই হয়েছে, সোজা হয়ে একটু বসতে সে কি পারে না,—তাতে ক্ষতি কি!

কিন্তু হতাশ হয়ে রথী বুঝতে পারে—অসম্ভব, সে অসম্ভব!

তার দেহের সমস্ত রক্ত এখানে বিদ্রোহ করে' উঠছে। সত্যিই সে দুগ্ধপোষ্য ভালোছেলে ছাড়া আর কিছু নয়। তার মনে হচ্ছে এখানকার হাওয়ায় যেন আছে মেরুর তুষার স্পর্শ। সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম সূচীমুখে সে হিমস্পর্শ যেন সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে তার শিরায়-শিরায়, স্নায়ুতে-স্নায়ুতে। অসহ্য তার এখানে থাকা।

অথচ এমন কিছু অদ্ভুত তো এ জায়গা নয়। ঘরদোর পরিষ্কার, একরকম সুরুচিসঙ্গত ভাবেই সাজানো। মেয়েটির দিকে দু-একবার তাকিয়ে সে দেখেছে, রূপসী না হোক মেয়েটি কুৎসিতও নয়, বয়সও তার অল্প বলে' মনে হয়। তার আচরণে এমন কিছু অসংযম নেই, বেশভূষাতেও না। শুধু, শুধু—কিন্তু সে বোধহয় রথীরই কল্পনা—তার চোখের কোণে বুঝি কেমন একটু কাঠিন্য, সুদীর্ঘ লুব্ধ প্রতীক্ষার উগ্র একটি আভাস, আর অধরে তার প্রায় অস্ফুট একটি বক্রতা, হতাশায়, বিতৃষ্ণায়, না লোলুপতায় কে জানে!

তবু রথী আড়ষ্ট হয়ে বসে' থাকে, রক্তস্রোত কানের পর্দায় যেন আছড়ে ছুটে চলেছে—ঝিম-ঝিম করছে তার মাথা।

সিতিকণ্ঠ বললে—পারবে, এ মুকুল ফোটাতে? পারবে, পারবে বীণা? সিতিকণ্ঠ চোখের কি একটা ইঙ্গিত করলে রথীর অগোচরে।

—আপনি একটু মুখ তুলে বসুন না,—আপনার জন্যে আমাকেই যে পুরুষ মানুষ হতে হচ্ছে!

প্রাণপণে শক্তি সংগ্রহ করে' রথী সোজা হয়ে বসে' বললে,—আমি বেশ বসেছি!

—তাই জন্যে কুশানটা পিঠে না দিয়ে দুমড়েই বসেছেন!

হঠাৎ স্মৃতির পটে এমনি একটি কথা ঝিলিক দিয়ে ওঠে,

কোথায়, কবে? হ্যাঁ, মাধুরী একদিন এমনি করে' তাকে অপদস্থ করেছিল সেই গোড়ার দিকে।

মাধুরী! সঙ্গে সঙ্গে রথীর সমস্ত শরীর কঠিন হয়ে উঠল,—সমস্ত শিরায় স্নায়ুতে খেলে গেল যেন বিদ্যুতের চমক! সে এ করছে কি? কি করছে সে! মাধুরীকে অপমান, তার প্রেমকে অপমান! তার চিঠির ভাষা যেন চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে' উঠে তাকে ব্যঙ্গ করতে থাকে।

দুগ্ধপোষ্য বলে' তার মনকে যতই বিদ্রূপ করুক, যাই ভাবুক সিতিকণ্ঠ, পারবে না সে কিছুতেই এখানে বসে' থাকতে। হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সে উঠে দাঁড়াল।

—আমি পারছি না সিতি-দা,—আমি—আমি চললাম।

দরজাটা রথীর পেছনে ঝনাৎ করে' গেল বন্ধ হয়ে, সিতিকণ্ঠ ও বীণা চমকে উঠে বিমূঢ় হয়ে রইল খানিকক্ষণ। সিঁড়িতে তখন রথীর দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

উন্মাদের মত ছুটে রথী বাইরে পথে এসে দাঁড়াল। উত্তেজনায় তার বুক তখনও ধক্-ধক্ করছে। কিন্তু কেমন করে' সে বেরুবে এখান থেকে? রাস্তা সে তো সত্যি চেনেনা। হঠাৎ তার খেয়াল হ'ল। ট্যাক্সি, ট্যাক্সি। সে না চিনুক, ট্যাক্সিওয়ালা নিশ্চয় রাস্তা চেনে!

চলন্ত একটা ট্যাক্সি থামিয়ে তাতে উঠে পড়ে' রথী যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সে যেন নিরাপদ!

বাড়ি ফিরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সমস্ত দেহে সে অত্যন্ত অশুচি বোধ করছিল নিজেকে। বাথরুমে গিয়ে ভালো করে' স্নান একবার তাকে করতেই হবে।

না, নিজের নীতিবাগীশ মনের কাছে আত্মসমর্পণ এখন সে নির্লজ্জ ভাবেই করেছে। দুগ্ধপোষ্য শিশু হ'তে তার আর বিন্দুমাত্র গ্লানি নেই।

কিন্তু বাড়িতেও সেদিন তার জন্যে অপেক্ষা করে' আছে বিস্ময়!

স্নানের ঘরে যেতে-যেতে টেবিলের ওপর একটা খাম সে দেখে গেছল। ভালো করে' নজর দেয়নি। সন্ধ্যার ডাকে অমন কত চিঠিই আসে বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে ঘরে ঢুকে তোয়ালেতে মাথা মুছতে-মুছতে চিঠিটার দিকে ভালো করে' চেয়ে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর কোথায় গেল তার মাথা মোছা, কোথায় গেল তার জামা পরা। ভিজে হাতেই শশব্যস্তে সে চিঠির খামটা ফেলল ছিঁড়ে। এও কি সম্ভব? মাধুরী তাকে চিঠি দিয়েছে! মাধুরী এতদিনে দিয়েছে তার চিঠির উত্তর!

মাধুরী বেশি কিছু লেখেনি, অত্যন্ত সহজ সরল চিঠি—তোমার চিঠি পেয়েও ভেবেছিলাম তুমি আবার আসবে একদিন। এতদিন বৃথা তার অপেক্ষা করে' আজ তাই চিঠি দিচ্ছি। তুমি কি একবার দেখাও করতে পার না—না তুমি কলকাতা থেকে চলে' গেছ? কাল আসবে কি সকালে?

রথীর রক্তধারা হয়ে ওঠে সঙ্গীতের স্রোত! কঠিন মাটি নয়, হাওয়ার উপর সে বিচরণ করছে! লজ্জা না করলে সে বুঝি চিঠিখানা নিয়ে একবার উল্লাসে চীৎকার করে' উঠত! মাধুরী তার অকথিত অভিযোগ প্রত্যাহার করেছে, মাধুরী তাকে ক্ষমা করেছে! মাধুরী তাকে যেতে লিখেছে—যেতে অনুনয় করেছে!

এত আনন্দের ভিতর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে' রথীর উল্লাস স্তিমিত হয়ে এল। এতদিন পরে আজই কিনা এল মাধুরীর চিঠি, আজ ঠিক এই সময়টিতে! এই কি ভাগ্যের পরিহাস—নিষ্ঠুর বিদ্রূপ!

রথী মনমরা হয়ে বসে' রইল অনেকক্ষণ, তারপর তার উৎসাহ

এল ফিরে। না, লজ্জা তার কিসের, সে তো জয়ী হয়ে এসেছে পরীক্ষায়—সে তো হার মানেনি।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে মেঘলা আকাশের মত অন্ধকার মুখ নিয়ে সিতিকণ্ঠ এল ফিরে। রথী তখন লম্বা হয়ে আরাম-কেদারায় শুয়ে গায়ের ওপর অনাবশ্যক একটা চাদর ঢাকা দিয়ে ছাদের দিকে সিগরেটের ধূম উদ্গীরণ করছে পরম আয়াসে। তার সমস্ত ভঙ্গিতে মুখে চোখে নিশ্চিন্ত আনন্দের আভা। সে-আভা সে সিতিকণ্ঠের দিকেও খানিকটা বিকীরণ করে' বললে,—এস সিতি-দা!

সিতিকণ্ঠের মুখের কি অন্ধকার, কিন্তু তাতে দূর হল না। গম্ভীর গলায় সে বললে,—বেশ ছেলে তো তুমি! ছি, ছি, ছি, ছি!

কিন্তু রথী এখন সমস্ত ভৎর্সনা, অভিযোগের ঊর্ধ্বে। কিছু তাকে স্পর্শ করে না।

—কেন কি হল, সিতি-দা?

সিতিকণ্ঠ নিজের স্বাভাবিক সংযম ভুলে প্রায় খিঁচিয়েই বলে উঠ্‌ল,—কেন কি হ'ল সিতি-দা? আমায় কি অপ্রস্তুত করলে বল তো! এরকম মানুষে করে!

রথীর দিক থেকে উত্তরস্বরূপ এক রাশ নীল ধোঁয়া উঠল কুণ্ডলী পাকিয়ে।

সিতিকণ্ঠ সেদিকে চেয়ে তিক্ত স্বরে বললে,—নিজে এসে তো বেশ আয়াস করে' শুয়ে ধোঁয়া ছাড়ছ! সে সব ব্যথা বেদনা অবসাদও তো দেখছি বেশ উঠেছ কাটিয়ে! তোমার লজ্জা করছে না রথী?

রথী আজ সকলকে তার আনন্দের ভাগ দেবে! সোজা হয়ে উঠে বসে সে বললে,—লজ্জা নয়, আমার কি করছে জান সিতি-দা? সমস্ত দেহ শিউরে-শিউরে উঠছে, সমস্ত স্নায়ু চিন্‌-চিন্‌ করছে!

এবার একটু সন্দিগ্ধ ভাবে তার দিকে চেয়ে সিতিকণ্ঠ জিজ্ঞাসা করলে,—কেন, কি হয়েছে কি ?

—বলছি, সিতি-দা, বোস।

সিতিকণ্ঠ কিন্তু তার অভিযোগ অত সহজে কেমন করে' ভোলে। বসে' পড়ে' সে ক্ষুব্ধ স্বরে বললে,—তুমি এমন আকাট্ তা কেমন করে' জানব! একেবারে কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন। নিজে তো ঝড়ের মত বেরিয়ে এলে, তারপর আমি বেটা কি করে' এতখানি পথ আসব তা একবার ভেবেও দেখলে না। পকেটে একটা আধলা নেই। এই সমস্ত পথটা আমায় হেঁটে আসতে হ'ল।

এ-কথাটা ভাবা হয়নি বটে। রথী একটু লজ্জিত হ'ল।

সিতিকণ্ঠ আবার বললে,—তারপর যেখানে গেছ—সেখানে কিছু দিতে তো হবে! তোমার কাছে ব্যাগ, সেটা কোথা থেকে আসে ? ছি, ছি, এমন অপদস্থ আমি জীবনে হইনি। কোনরকমে আশ্বাস-টাশ্বাস দিয়ে মান বাঁচিয়ে আমি পালিয়ে এলাম। টাকা ক'টা আমাকেই গুণগার দিতে হবে আর কি!

—না, না, তা কেন! রথী তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে টেবিলের উপর থেকে জামাটা নিয়ে খুলে একটা দশটাকার নোট সিতিকণ্ঠের হাতে দিলে : এতে হবে তো ?

নোটটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে গলাটা একটু নামিয়ে তাচ্ছিল্যের স্বরে সিতিকণ্ঠ বললে—তা নয় হবে! কিন্তু অপমানটা ত আর শোধরান যাবে না! সে তো একেবারে মরমে মরে' গেছে—কি কান্নাটা কাঁদলে।

কিন্তু রথীর কানে এখন এসব কথা প্রবেশ করে কি করে'। টাকাটা দিয়ে ফেলেই সে ওসব কথা মন থেকে বিদায় করে' দিয়েছে। এবার সিতি-দার দিকে তার আনন্দোজ্জ্বল মুখ তুলে সে বললে,—কি হয়েছে বল তো সিতি-দা!

সিতিকণ্ঠ অনেকটা শান্ত হয়েছে, তবু ঈষৎ ঝাঁজের সঙ্গে সে বললে,—আমি ত গনৎকার নই!

কিন্তু রথী কতক্ষণ আর নিজেকে চেপে রাখতে পারে! সবুর তার আর সইছে না। মাধুরীর চিঠির খামটা ডান হাতে নাড়তে-নাড়তে সে বললে—বলো দেখি?

সিতিকণ্ঠর এবার বুঝতে দেরি হ'ল না। সে নিজে জানুক বা না-জানুক রথী মাধুরীর সঙ্গে তার বিচ্ছেদের কথাটা আভাসে অনেকদিন আগেই সিতিকণ্ঠকে বুঝতে দিয়েছে। এ যে মাধুরীরই চিঠি, একথা বুঝে কিন্তু সিতিকণ্ঠর মুখ যথোচিত প্রসন্ন হয়ে উঠল না।

উৎসাহহীন স্বরে সে জিজ্ঞাসা করলে,—কি, আবার মিটমাট হয়ে গেল বুঝি?

রথী উত্তর না দিয়ে হাসতে লাগল।

—বুঝিনা বাপু, তোমাদের রকম-সকম! এই একেবারে সাগরের মত অতল দুঃখ, কোনদিন বুঝি তা আর সেঁচে তোলা যাবে না, তারপরই আর কোথাও কিছু নেই। আবার যাচ্ছ তাহ'লে সেখানে?

—বাঃ, যাব না?

—না, তাই বলছি—বলে' সিতিকণ্ঠ সমস্ত ঘরটা খানিকটা পায়চারি করে' বেড়িয়ে এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে' বললে,—ইস্, এ মেয়েটার কান্না যদি দেখতে!

কুড়ি

রাতটা কাটলেই সকাল। একটি মাত্র রাতের ব্যবধান—তাই কিন্তু রথী যেন সহ্য করতে পারছে না। অসীম তার অধৈর্য! মাধুরীদের বাড়ি যাওয়া তার তো নতুন নয়—ইচ্ছে মত দিনে তুবেলা সেখানে সে তো কাটিয়ে এসেছে। তবু কালকের যাওয়া যেন একেবারে আলাদা—অচেনা দেশ আবিষ্কারের যাত্রার মত এ যেন রোমাঞ্চকর।

রথী সে-রাতটা ঘুমোতেই পেরেছিল কি না কে জানে! সকালে কেউ ওঠবার আগেই দেখা গেল তার প্রসাধন পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে! সিতিকণ্ঠ তখনও ঘুমোচ্ছে। পর্দা ঠেলে একটু উঁকি মেরেই সন্তর্পণে রথী গেল সিঁড়ি দিয়ে নেমে। অর্জুন দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে, ব্যস্ত হয়ে জিগ্‌গেস করলে—চা করব বাবু?

—না রে পাগলা, দেখছিস না বেরুচ্ছি।

রথীর শেষ কথা শোনা গেল রাস্তা থেকে। একটু আগেই সে বেরিয়ে পড়েছে। জানে এত সকালে কারুর বাড়ি কেউ যায় না। কিন্তু শ্যামবাজার থেকে ভবানীপুর তো কম পথ নয়—তারপর ট্রাম-লাইন থেকে ল্যান্সডাউন পর্যন্ত অতটা রাস্তা তাকে হাঁটতে হবে—ততক্ষণে রোদ তো উঠবে চড়বড়িয়ে। না, সে ঠিক সময়েই বেরিয়েছে। আর যদি কিছু আগেই গিয়ে পড়ে, তাতেই বা ক্ষতি কি! কেউ তাকে তার জন্যে তাড়িয়ে তো দেবে না!

রথীর অনুমানই অবশ্য ঠিক। গেঁতো বাস্‌-এ শ্যামবাজার থেকে ভবানীপুর যেতে এবং সেখান থেকে ল্যান্সডাউন রোড পৌঁছুতে তার ভদ্রমত বেলাই হয়ে গেল।

মনের আনন্দ অশোভন ভাবে মুখে প্রতিফলিত হতে না দেবার প্রাণপণ চেষ্টা করে' সে ঢুকলো মাধুরীদের বাড়িতে। কিন্তু ঢোকবার সঙ্গে-সঙ্গে এতক্ষণের উৎসাহ তার অনেকখানি এল নিবে। মাধুরীকে সে আজ নিভৃতে একা পাবার আশা নিয়েই এসেছে। আজ যে ছুটির বার তা তো তার মনে ছিল না। ছুটির বারে যে মাধুরীদের পরিবারের সকলের সকালটা একত্র আড্ডা দেওয়ারই রীতি—আজ তো মাধুরীকে একা পাওয়া যাবে না। বিশেষত সুধারানীর সামনে যতটা স্বাধীনতা সে নিতে পারে অত্যন্ত ভালমানুষ বলে' মাধুরীর বাবার কাছে তা নিতে তাদের দুজনেরই লজ্জা করে। আজ সে চেষ্টাই অসম্ভব।

অবশ্য সত্যকার দুঃখ করার তার কিছু নেই। সকলে উপস্থিত থাকলে অভ্যর্থনাটা তার বেশি বই কম উচ্ছ্বসিত হয় না। তবু—যদি মাধুরীকে একা পাওয়া যেত!

মনের ক্ষোভ মনেই চেপে রথী এগিয়ে গিয়ে বসল ঘরের ভেতর। সে আবির্ভূত হবার সঙ্গে-সঙ্গে সুধারানী ও মাধুরীর বাবার জিহ্বা সঞ্চালিত হতে শুরু করেছে সাদর অভ্যর্থনায়। মাধুরীর মুখ হয়ে উঠেছে উজ্জ্বল—আর কিছু আনন্দের প্রকাশ তার পক্ষে দেখান কঠিন।

নৃপতিবাবু মোটা-সোটা নধরকান্তি মানুষটি। সোফার ওপর পা তুলে অর্ধশায়িত অবস্থায় গড়গড়া থেকে তামাক টানাই তাঁর ছুটির দিনের সব চেয়ে বড় বিলাস। আলবোলার নল মুখ থেকে সরিয়ে তিনি চিরাভ্যস্ত ভাবে বললেন,—এস এস রথী, দি ব্রাইট্ ইয়ং ম্যান!

নগরের সব আনকোরা খবর একমাত্র রথীর কাছে পাওয়া যায়, বিশেষ করে' সাহিত্যজগতের খবর—একেবারে তপ্ত খোলা থেকে নামান। কোথায় কোন্ সাহিত্যসূর্য উদয় হল, কোথায় কোন্ পত্রিকা গেল অস্ত। বিলাতে কে পাচ্ছে নোবেল প্রাইজ এবার—

এবং কার পাওয়া উচিত—রথীর একেবারে up to the minute information।

—আমি তো রথীর কাছে শুনে গিয়েই লাইব্রেরীতে দু' একটা চাল মেরে সবাইকে অবাক করে' দিই।

সকলের হাসি থামলে নৃপতিবাবু আবার বললেন—কিন্তু সেদিন তোমার সংবাদে একটু ভুল ছিল রথী, আমি চাল মারতে গিয়ে শেষে অপদস্থের একশেষ! রাশিয়ার কেউ তো কখন নোবেল প্রাইজ পায় নি!

মাধুরী তাড়াতাড়ি বল্‌লে—বাঃ, বাবা তো বেশ; ওকথা তো সেদিন নলিন মামা বলে' গেল—আমার সঙ্গে তাই নিয়ে তর্ক!

—নলিন বলেছিল?—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই হবে—আমার কেমন ভুল হয়েছে!

সুধারানী বললেন,—ওই স্মরণশক্তি নিয়ে কি করে তুমি মামলা কর বল তো? রামকে হরি আর হরিকে রাম বানাও তো! আমার তো বিশ্বাস তোমার মক্কেলরা কখনো জেতে না।

সবাই হাসতে লাগল।

সুধারানী বললেন,—আর রথী কি আজকাল আসে নাকি ভেবেছ এ বাড়ি। ও একেবারে ডুমুরের ফুলটি হয়েছে! ওর এখন নতুন সাহিত্যিক সব বন্ধু!

সুধারানী মাধুরী ও রথীর মনোমালিন্যের ইতিহাস জানেন না।

নৃপতিবাবু হঠাৎ রথীর পক্ষ নিয়ে বললেন,—ও না এলে তোমরাই বা কেন যাও না? বরাবর ওকেই যে আসতে হবে তার কি মানে আছে? ছেলে মানুষ একলা থাকে, তোমরা একদিন ওর ঘর-দোর তো গুছিয়ে দিয়ে আসতে পার। না রথী, তোমার কোন দোষ নেই, বরং তুমিই অনায়াসে রাগ করতে পার।

সুধারানী হেসে বললেন—ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে,

ছুটির দিনেও ওকালতির অভ্যেস গেল না। রথীর কাছে তা বলে' ফি পাচ্ছ না!

পারিবারিক এ আলাপেরও একটা আনন্দ আছে, কিন্তু রথীর মন উন্মুখ হয়ে থাকে মাধুরীকে একলা পাবার জন্যে। সে অবশ্য বুঝতে পারে, আজকের দিনে তা অসম্ভব। গল্পে-গুজবে হাসি-আমোদে আজ দিন কাটলেও নিভৃত সাক্ষাৎ সে পাবে না।

রথী সেদিন বিকালের আগে আর ছুটি পেল না। সমস্ত দিন তার আনন্দেই কেটেছে—মাধুরীর উপস্থিতির উত্তাপই তাকে রেখেছে খুসি, কিন্তু তবু তার মন তৃপ্ত হয়নি। এতদিনের বিচ্ছেদের যথোপযুক্ত সমাপ্তি যেন হ'ল না। অবশ্য একটু-আধটু পৃথক আলাপ করার সুযোগ তারা দুজনেই করে' নিয়েছে। এইটুকু তার সান্ত্বনা যে মাধুরী তার ভেতর এক সময় বলেছে—পরশু কিন্তু এস বিকেলে! আমায় ইন্‌স্টিটিউটে গান শোনাতে নিয়ে যেতে হবে!

একুশ

সন্ধ্যায় রথী ঘরে ফিরে আসবার পর দেখা গেল সিতিকণ্ঠের মুখ বিশেষ প্রসন্ন নয়। ক্ষুন্নস্বরে সে জিগ্‌গেস করলে,—কি হে সমস্ত দিন ছিলে কোথায়! তোমার জন্যে দুপুর বেলা বসে'-বসে' হয়রান! নাই আসবে যদি, বলে' যেতে তো তা হলে হয়।

রথীর মন তখনও সমস্ত দিনের আনন্দের সুরে বাঁধা রয়েছে। হেসে বললে,—বলে' গেলে তোমার এইটুকু ভাবাতে তো পারতাম না সিতি-দা! এইটুকুই আমার লাভ!

—বাঃ, মুখ যে বেশ খুলেছে দেখছি! সোনার কাঠিটি কার?

রথী উত্তর না দিয়ে চেয়ার হেলান দিয়ে একটা সিগরেট ধরালে।

সিতিকণ্ঠ সামনের চেয়ারে বসে' বললে,—শহরটাকে বিস্বাদ, জীবনটাকে জোলো আর বোধ হয় লাগছে না রথী! কেমন আমি বলেছিলাম, না, যে রাত যখন হয়েছে তখন সকাল হবেই! সেদিন তো আমার কথা ভালো লাগে নি।

রথী মৃদু একটু হাসল।

সিতিকণ্ঠ একটু উসখুস করে' বললে,—সময়টা এখন রথী তোমার খুব ভালো—একেবারে ডাইনে-বাঁয়ে চিনির নৈবিদ্যি জুটছে।

রথী কথাটা ঠিক বুঝতে পারেনি। সিতিকণ্ঠ সেটা পরিষ্কার করবার জন্যেই বললে,—এদিকে আবার যে এক মজা হয়েছে।

রথী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—কি?

রথীর টেবিলের ওপরকার একটা বইয়ের ভেতর থেকে একটা চিঠি বার করে' সিতিকণ্ঠ তার হাতে দিলে। বললে,—চিঠি

আমি খুলিনি, কিন্তু হাতের লেখা দেখেই বুঝেছি কোথা থেকে এসেছে। তুমিই ভাগ্যবান রথী!

চিঠি দেখে তো রথী অবাক। বাংলা অক্ষরে রঙিন খামের উপর তার নাম-ঠিকানা লেখা। চিঠি পড়ে' সে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। যে মেয়েটির কাছে সিতিকণ্ঠ তাকে নিয়ে গেছল, এক দিনের কয়েক মুহূর্তের আলাপেই সে তাকে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভাবে সম্ভাষণ করে' লিখেছে এই চিঠি।

রথী বিস্মিত যেমন হল, হাসিও তার তেমনি পেল চিঠির ভাষা পড়ে'। চিঠিতে অনেক কিছুই আছে। আছে, পতিতা বলে' তাকে যেন রথী ঘৃণা না করে—তাদের ভেতরও প্রাণ থাকে! তারাও মানুষ! একদিনের এক পলকের দেখায় রথীকে সে কতখানি ভাল বেসেছে তার বর্ণনার সবই আছে, রথী আবার কবে আসবে তাই জানবার বাসনা ও আসবার জন্যে কাতর অনুরোধ। রথীর ঘৃণাই যে তার সুপ্ত নারীত্বকে জাগিয়েছে সে কথাও বাদ নেই।

রথীর সবটা পড়বার ধৈর্য নেই, হেসে চিঠিটা সিতিকণ্ঠের হাতে দিয়ে সে বললে,—পড় সিতি-দা! এ একেবারে রীতিমত নবেল!

সিতিকণ্ঠ চিঠিটা হাতে নিয়ে অত্যন্ত মন দিয়েই পড়ল মনে হ'ল। তারপর চিঠিটা ফিরিয়ে দিয়ে অত্যন্ত ব্যথিত মুখে সে বললে,—তুমি ঠাট্টা করতে পার রথী! কিন্তু আমি পারিনে। এর সেদিনকার কান্না আমি দেখেছি, ভাই, সে কান্নার ভান করা যায় না।

—তুমি হাসিও না, সিতি-দা! শেষকালে তুমিও বোকা বনবে! তোমার এই এত অভিজ্ঞতা নিয়ে! এ তো পতিতোদ্ধারিণী নবেলকে ও ছাড়িয়ে গেছে! পলকে প্রণয় এবং তারপর পতিতা নায়িকার অপূর্ব আত্মত্যাগ। দোহাই সিতি-দা, তেমন যদি কিছু করে তো **dying declaration**-এ আমার নামটা করতে বারণ কোরো। চিঠিটা রথী ওয়েস্ট-পেপার-বাস্কেটে ফেলে দিলে।

সিতিকণ্ঠ যেন আহত হয়ে চম্‌কে উঠল—ফেলে দিলে।

—তা কি করব ?

—তা তোমরা দিতে পার রথী, তোমরা এ যুগের ছেলে, তোমাদের সব তাতেই অবিশ্বাস—কি বলে cynicism! কিন্তু আমার যে অভিজ্ঞতার কথা তুললে তারই জোরে আমি বলছি রথী খাঁটি-মেকি চিনি। অসম্ভব অনেক জিনিসই মনে হয়, কিন্তু সেই কি একটা কথা আছে না—Truth is stranger that fiction। নবেলী বলে সব হেসে উড়িয়ে দিও না।

সিতিকণ্ঠ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললে,—বিশেষত প্রেম, —এ যে ধরণীর দুর্লভতম জিনিস রথী, এর কি স্থান কাল পাত্রের বিচার চলে ?

রথী এবার হো হো করে' হেসে উঠল : তোমার কি হল সিতি-দা তোমায় এত sentimental তো কখন হতে দেখিনি! মনে হচ্ছে এইবার তুমি কাঁদবে।

—ঠাট্টা তো তুমি এখন করবেই ভাই। আমারই দোষ, তোমায় সেখানে নিয়ে যাওয়াই আমার ভুল হয়েছে।

একটু থেমে সিতিকণ্ঠ আবার বললে,—তুমি সেখানে তা হলে কিছুতেই আর যাবে না ? একবার দেখা দিতেও না ?

রথী হাসতে-হাসতে বললে—সিতি-দা, দেখার চেয়ে যা তাঁর বেশি দরকার, বল যদি তো সেই দর্শনী আমি বেশ কিছু তাকে পাঠিয়ে দি—আমার দর্শন যেন তিনি আর না চান।

তুমি ভুল করছ রথী! সিতিকণ্ঠ সেই বৌদ্ধ করুণার মূর্তি যেন ফিরে পেয়েছে : তুমি ভুল করছ ; অর্থের অভাব তার নেই। অর্থ সে চায়ও না তোমার কাছে। যাক্, সে কথা বলে আর কি হবে ? এখন তুমি মাধুরী দেবীর দ্বারা আচ্ছন্ন, আর কিছু তুমি দেখতেও পাবে না। তারপর আজ বুঝি বিরহ সমাপ্তি হ'ল ?

—তা একরকম হ'ল!

—খুব বুঝি দুজনে হুটোপাটি করলে ? বাড়িতেও কেউ কিছু বলে না, কেমন ?

কথার সুরটায় কেমন একটু সন্দিগ্ধ হ'য়ে রথী চুপ করে' রইল।

সিতিকণ্ঠ আবার বললে,—যাই বল বাপু তোমাদের এ হাল-ফ্যাসানের মেয়েদের আমি বুঝি না। যাদের তুমি ঘৃণা কর বেহায়াপনায় এঁরা তো তাদের ছাড়িয়েই যান। এই ধর তোমারই কথা! কেনই বা হঠাৎ মান করলেন আর কেনই বা তা ভাঙলেন, নিজে তা বোঝবার জো নেই। ওদের বেলায় হ'লে এরই একটা কুৎসিত নাম দিতে!

রথী হঠাৎ তিক্ত স্বরে বললে,—কি তুমি বলছ, সিতি-দা! যা বোঝ না সে সম্বন্ধে কথা বলো কেন ? রথীর মুখ দিয়ে রূঢ় ভাবে তারপর বেরিয়ে গেল : ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় তোমার কখনো হয়নি।

কশাহতের মত সিতিকণ্ঠ এ অপ্রত্যাশিত আঘাতে উঠল চম্‌কে। কিন্তু এ আঘাতও সে বুঝি সামলে নিলে। বললে,—তা সত্যি রথী, ভাগ্যই আমার মন্দ! কি ভালো কি মন্দ, সব জায়গায় নারীর কাছ থেকে শুধু প্রবঞ্চনাই পেয়েছি—আমার ভাগ্যে ভদ্র কেউ থাকেনি। তাই তো বলি রথী—তুমি সেই ভাগ্যবান। ধরণীর দুর্লভতম জিনিস তুমি পেলে—তোমার কাছে সবাই তাই ভদ্র!

সিতিকণ্ঠের চোখ আজ অতিমাত্রায় স্তিমিত। বাঁকা তরবারির মত দুই মুদিতপ্রায় পাতার ভেতর ঘন কৃষ্ণ তারার তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল রেখা দেখা যাচ্ছে!

বাইশ

দুপুর থেকেই আকাশ আছে আচ্ছন্ন হ'য়ে। টিপ্ টিপ্ করে' বৃষ্টি পড়ছে একঘেয়ে। তা পড়ুক! আজ মুষলধারে বৃষ্টি হ'য়ে সমস্ত নগর ভেসে গেলেও রথী যথাসময়ে ল্যান্সডাউন রোডের একটি বাড়ির দরজায় গিয়ে হাজির হ'ত।

সাতটায় ইনস্টিটিউটে গানের আসর। রথী সকাল থেকে হিসেব করছে।—শ্যামবাজার থেকে ভবানীপুর এক ঘণ্টা—হ্যাঁ, এক ঘণ্টাই ধরা যাক, আর ভবানীপুরেই কোন না আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে! মেয়েদের সাজগোজ তো! তারপর ট্যাক্সিতে ইনস্টিটিউট পর্যন্ত বিশ মিনিট—একটু বাড়িয়ে না হয় আধ ঘণ্টাই ধরা যাক। সুতরাং দু'ঘণ্টা আগে এখান থেকে তাকে বেরুতে হবে।

বেরুল অবশ্য রথী দু'ঘণ্টার জায়গায় আড়াই ঘণ্টা আগে। নিউ মার্কেটটা মাঝপথে ছুঁয়ে গেলে দোষ কি! কিছু ফুল নিলে মাধুরী নিশ্চয় অসন্তুষ্ট হবে না। অনেক দিনই সে তো মাধুরীকে কিছু দেয় নি। তা ছাড়া সুধারানীও ফুল বড় পছন্দ করেন।

ফুলের তোড়াটা এত বড় হয়ে যাবে রথী তা ভাবেনি। এ নিয়ে বাসে-ট্রামে ওঠা হ্যাঙ্গাম। তা তাড়া যে বৃষ্টি পড়ছে!

রথীকে একটা ট্যাক্সিই নিতে হ'ল। মাধুরী আবার অপব্যয় দেখলে রাগ করে। যাই হোক মাধুরীকে বুঝিয়ে দেওয়া যাবে যে আজ এমন একটি বিশেষ দিন যাকে সাধারণ হিসাবে ফেলা যায় না। আজ খরচও তাই একটু বেহিসেবি হলে দোষ নেই।

মরা আলোর বিকেলটি ভারি ভাল লাগছে আজ রথীর। আকাশ পৃথীবী আজ তাদের মিলনের সংবাদটি জানতে পেরেছে।

আকাশ স্নিগ্ধ হয়েছে মেঘে, পৃথিবী মধুর হয়েছে আর্দ্রতায়। রথীর মনে হয় এমন দিন অনেক তপস্যায় আসে।

বাড়ির ধারে এসে ট্যাক্সিকে অপেক্ষা করতে বলে' রথী ফুলের তোড়া নিয়ে ভেতরে ঢুকল। এ কি, মাধুরী বাইরের ঘরেই বসে' আছে আগে থাকতে তার প্রতীক্ষায়! রথীর বুকটা আনন্দে কেঁপে উঠল।

ওয়াটারপ্রুফ ও ফুলের তোড়াটা একধারে গুছিয়ে রাখতে রাখতে সে কৃত্রিম অধৈর্যের সঙ্গে বললে—যা ভেবেছি তাই, এখনো সাজগোজ কিছু হয়নি তো! কখন তা হ'লে হবে?

মাধুরী কোন উত্তর দিলে না। তার দিকে ফিরে রথী বললে, —অমন করে' বসে' থাকলে চলবে না, বাইরে ট্যাক্সির ওয়েটিং চার্জ বাড়ছে। আর যদি এখন ঘন ঘোর না হোক মৃদুমন্দ বরিষার গান শোনার বদলে শোনানোর ইচ্ছে থাকে, তা হ'লে বল, ট্যাক্সিকে বিদায় করে' দি! চুলোয় যাক ইন্‌স্টিটিউট!

মাধুরী তবুও নীরব।

হঠাৎ রথী চারিধারের আবহাওয়ার অস্বাভাবিক গুমোট সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে উঠল। মাধুরীর সুদীর্ঘ নীরবতা কেমন একটু বিস্ময়কর নয় কি! অস্বস্তিকর নয় কি প্রায়ান্ধকার এই ঘরের স্তব্ধতা!

চারিধারে একটা শ্বাসরোধকারী আড়ষ্টতা! এর ভেতর তার নিজের কথাগুলো কি অশোভনই না শুনিয়েছে!

রথী আগেই মাধুরীর কাছে একটা সোফায় বসে' পড়েছে। দূর থেকে ঘরের আবছা আলোয় সে এতক্ষণ যা দেখতে পায় নি এবার তাই দেখে সে বিস্মিত বিমূঢ় হ'য়ে গেল। মাধুরীর দুই গালের ওপর চোখের জলের ধারার স্পষ্ট চিহ্ন, অথচ তার অদ্ভুত দৃষ্টি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত জ্বালাময়!

এই কয়দিনে রথী ভাগ্যের হাতে অনেক রকমে লাঞ্ছিত

হয়েছে। তার বুকের ভেতরটা অহৈতুক ভয়ে কেমন যেন শুকিয়ে যেতে লাগল। মাধুরীকে আর সম্ভাষণ করবার সাহস পর্যন্ত খানিকক্ষণ তার হ'ল না।

মাধুরীও তেমনি কঠিন হ'য়ে বসে' আছে। রথীর মনে হ'ল জানলা-দরজাগুলো যেন সম্পূর্ণ ভাবে খুলে না দিতে পারলে সে থাকতে পারবে না এ ঘরে। হাওয়া নেই, এ ঘরে একেবারে হাওয়া নেই!

কথা কইলে প্রথম মাধুরী—কথা নয়, সে যেন বরফ জমানো মেরুর হাওয়ার একটা ঝাপটা। রথীর সমস্ত হিম হ'য়ে গেল।

মাধুরী শান্ত কণ্ঠে বললে,—মা এখনো ওঠেন নি, বাড়িতে কেউ নেই, তোমার ট্যাক্সিও দাঁড়িয়ে আছে। এই বেলা তুমি চলে' যাও। কেউ জানতে পারবে না।

মাথায় চুলের ভেতর আঙুল বুলোতে-বুলোতে রথী যেন আর্তনাদ করে' উঠল: কেন? কেন?

সেই হিম শীতল কণ্ঠস্বর: কেন? এখনো জিজ্ঞাসা করছ, কেন? মাধুরী হঠাৎ সোফার একটা গদি তুলে একটা চিঠি বার করে' রথীর দিকে ছুঁড়ে দিলে। নিষ্ঠুর ভাবে বললে,—এ প্রমাণ দেখাবার দরকার হবে আমি ভাবিনি, ইচ্ছেও ছিল না আমার দেখাবার। কিন্তু তুমি নির্লজ্জতার চরম সীমায় গিয়েছ, একেবারে শেষ না দেখে তুমি তো শিকার পরিত্যাগ করবে না!

এ চিঠি খোলবার দরকার নেই—রথী এ পত্র চেনে। খামে ভরা এই চিঠিই সেদিন সে কাগজ ফেলার ঝুড়িতে ফেলে দিয়েছিল—সেই খামে ভরা চিঠিই এসেছে মাধুরীর হাতে।

মাধুরী তীব্র চাপা গলায় বললে,—এখনো তুমি বসে' আছ?

রথী অভিভূতের মত উঠে দাঁড়াল: একটা কথা! শুধু একটা মাধুরী। এ চিঠি তুমি কোথায় পেলে? কে দিলে তোমায় এ চিঠি?

—যেই দিক সে আমার কল্যাণকামী, সে আমার সত্যকার বন্ধু! কে দিলে তাতে তো তোমার দরকার নেই! এ চিঠি তোমার, তা তুমি অস্বীকার করতে পার, বল পার?

মাধুরীর ভর্ৎসনার তীব্রতা শেষ কথাগুলিতে কি মিনতিতে নেমে আসে, কাতর করুণ মিনতিতে? কে জানে!

না, রথী তো পারে না অস্বীকার করতে!

রথী কাঁপতে কাঁপতে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

মাধুরী ধৈর্য হারিয়ে প্রায় চীৎকার করে' ফেলে বললে,—তবে যাও, এখুনি যাও!

রথী তাই গেল। উন্মাদের মত দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে সে ট্যাক্সিতে চেপে বসে' বললে,—চালাও ট্যাক্সি।

ড্রাইভার জিজ্ঞাসু ভাবে তার দিকে তাকাতে সে বললে,—চালাও।

ট্যাক্সি-ড্রাইভার কি বুঝে সেই আদেশই পালন করলে।

আর মাধুরী একেবারে যেন এলিয়ে এসে পড়ল সোফার ওপর। কান্নার অতীত বেদনায় বুঝি কিছুক্ষণ তার সংজ্ঞাই ছিল না।

হঠাৎ তার মনে হ'ল তার হাতের পাশে কে যেন সভয়ে সস্নেহে হাত রেখেছে—ভালো করে' স্পর্শ করতেও তার ভয়। বুকটা মাধুরীর ধড়াস করে' ওঠে,—রথী, রথী কি তা হ'লে ফিরে এল?

ধীরে ধীরে মাথা তুলে সে চোখ মেলে চাইলে।

তার হাতের পাশে রথীর ফুলের তোড়া। ওয়াটারপ্রুফের সঙ্গে রথীই ফেলে গেছে।

অনেক দিন বাদে রথীর মনে পড়েছে তার ফটোগ্রাফার বন্ধুকে। বড় রাস্তার ওপর আজকাল সে পেশাদারী ভাবে ব্যবসা করে।

বিনোদ হেসে বললে,—তোর আবার এ hobby কবে হ'ল ? আগে তো ছিল না! কেমন তুলেছিস, দেখাস আমায় একদিন!

রথী বললে,—তা দেখাব। কিন্তু এ এক আচ্ছা নেশা ভাই! ছাড়ব ছাড়ব করে'ও ছাড়তে পারি না।

রথী সংযত, শান্ত, অচঞ্চল।

বিনোদ বললে,—তোকে বলে'ই ও জিনিসটা দিলাম; আর কেউ হ'লে দিতাম না। আমাদের নিষেধ আছে কিনা! কে কোথায় ফ্যাসাদ বাধাবে ঠিক আছে ?

—তখন বুঝি তোমাদের নিয়ে টানাটানি!

বিনোদ বললে,—তা নয়। বিশেষত আজকালকার ছেলেদের কিছু বিশ্বাস আছে—উঠতে বসতে তারা আত্মঘাতী হয়। তোকে নেহাত আমি ভালো করে' চিনি তাই।

রথী মুখ টিপে হেসে বললে,—কিন্তু ধর আমি যদি—

তার কথার মাঝখানেই বিনোদ বললে,—দূর, তুই করবি কোন দুঃখে। তাদের চেহারাই আলাদা।

—তাদের চেহারাই আলাদা—রথী জোরে হেসে উঠল!

রথী ঘরে যখন ফিরে এল, তখন রাত খুব বেশি নয়। সিতিকণ্ঠ ফেরেনি; অর্জুন নিচে রান্নায় ব্যস্ত। হ্যাঁ, এই উপযুক্ত স্থান, এই উপযুক্ত সময়। নিজের এই নরম বিছানার উপরই অনায়াসে সে শেষ চোখ বুজবে।

রথী আয়নার সামনে একবার দাঁড়াল। শান্ত অচঞ্চল মূর্তি, তার অধরের কোণে একটু হাসির আভাস খেলে গেল—বিনোদ বলেছে তাদের চেহারাই আলাদা। হবে হয়তো। রথী পকেট থেকে পুরিয়াটুকু বা'র করলে। না, আর দেরী করার সময় নেই, এক্ষুনি হয় তো অর্জুন আসবে ডাকতে, হয় তো এসে পড়বে সিতিকণ্ঠ।

কেমন করে খাওয়া উচিত রথী ঠিক জানে না—যাক, তাতে

ক্ষতি নেই। জলের সঙ্গে খেলেই চলবে।. রথী কুঁজো থেকে পরিষ্কার কাঁচের গ্লাশে এক গ্লাশ জল গড়ালে—পুরিয়াটা দিলে তার ভেতর ঢেলে।

ঘড়িতে দশটা পঁচিশ—দশটা ছাব্বিশের পৃথিবীকে আর সে জানবে না। তাই, তাই ভালো। গেলাসটা রথী মুখের কাছে তুললে—হাত তার কাঁপছে না তো!

হঠাৎ সিঁড়িতে দ্রুত পায়ের শব্দ—সিতিকণ্ঠই আসছে উঠে।

রথী গেলাসটা নামিয়ে টেবিলের এক পাশে সরিয়ে রাখলে। যেন কিছুই নয়, খাবার জন্যে এক গ্লাশ জল গড়িয়েছে মাত্র।

সিতিকণ্ঠ স্মিতমুখে ঘরে ঢুকল। পরিপাটি তার বেশভূষা, চক চক করছে তার মুখ, স্নো-পাউডারে। সমস্ত দেহ থেকে উপচে পড়ছে খুসি।

—এই যে রথী, কোথায় ছিলে বল তো? ইনস্টিটিউটের অমন আসরে গেলে না! আমার আবার বড্ড তাড়াতাড়ি, এক্ষুনি যেতে হবে আবার এক আড্ডায়।

রথী তার দিকে চেয়ে ছিল অপলক দৃষ্টিতে।

সিতিকণ্ঠ আবার বললে,—ওহে, ভালো কথা মনে পড়েছে। তোমার মাধুরী দেবীও যে গেছলেন দেখলাম একটি ছেলের সঙ্গে, লম্বা ফর্সাগোছের একটি ছেলে। দু'জনে খুব দেখি ভাব, সারাক্ষণই ফিস ফিস করে' কথা হ'ল।

সিতিকণ্ঠর কথায় স্পষ্ট বিদ্রূপের আঘাত।

রথী তেমনি নিস্পন্দ হ'য়ে তবু রইল বসে'। সিতিকণ্ঠ বললে,—মাধুরী দেবীকে দেখে আমি তো ভেবেছিলাম, তুমিও আছ সঙ্গে। তোমায় না দেখে অবাক হ'য়ে গেলাম। ওই যা ভুলে যাচ্ছি, আমার যে এক্ষুনি যেতে হ'বে। বাড়িতে এলাম দু'টো টাকার জন্যে। খুচরো দু'টো টাকা তোমার কাছে আছে রথী?

রথী ব্যাগটা সিতিকণ্ঠের হাতে তুলে দিলে।

—না, না, তুমিই বা'র করে' দাও না। সিতিকণ্ঠ বললে।

—ওতে বেশি কিছু নেই—তুমি ওটা নিয়েই যাও। রথীর এই প্রথম কথা।

সিতিকণ্ঠ একটু ইতস্তত করে' অম্লানবদনে ব্যাগটা পকেটে ফেলে বললে,—হ্যাঁ, এইবার এক গ্লাশ জল, গেলাসটা কোথায়? এই যে জল গড়ানই রয়েছে। খেতে পারি।

রথী গেলাসটা প্রথম সরিয়ে নিতে হাত বাড়িয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ হাত সে গুটিয়ে নিলে। সিতিকণ্ঠের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে,—খাও না?

সিতিকণ্ঠের মন তখন অন্য বিষয়ে নিবদ্ধ, দৃষ্টিবিচার করবার তার সময় নেই। গেলাসটা থেকে এক ঢোঁক জল সে তাড়াতাড়ি, খেয়ে বললে,—স্বাদটা কেমন যেন!

সিতিকণ্ঠ আর কিছু বললে না।